প্রকাশক—

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

৫৭-২ সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মহালয়া—১৩৪৩ সাল

ছবি ও কভার অপরাজিতা প্রেস, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। ভূমিকা এবং রাণী বিভাবতীর জেরা ক্লাসিক প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। পরিশিষ্টের সত্য ব্যানার্জ্জি ও আশু ডাক্তারের জেরা প্রভৃতি মানসী প্রেস হইতে শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। রায়ের অংশ ১—৫৩৬ পৃষ্ঠা কলিকাতা ১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

বিগত ১৯০৯ সালে দার্জ্জিলিংএ জয়দেবপুরের মধ্যম রাজকুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের তথাকথিত মৃত্যুর অভিনয় হইতে দেশবাসী প্রায় ২৮ বৎসর কাল সন্দেহ দোলায় দুলিয়া আজ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। নানারূপ শোনাকথায় তর্কজালের অবতারণাই হইত, কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত কেহই করিতে পারিতেন না। কারণ যে ধৈর্য্য থাকিলে এরূপ জটিল বিষয়ের মীমাংসা হয় সেরূপ ধৈর্য্য জনসাধারণের নাই। বিচারে বাদী রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তিনিই জয়লাভ করিয়াছেন। বহুদিক্ দিয়াই এই মামলা জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম।

এই মামলার বিচারক শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু, তাঁহার সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই সুবিচারের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত হইলেন। চিরদিন তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শোভা পাইবে। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান। সকলেই তাঁহার নামে ভক্তিভরে শির অবনত করিবে। তিনি ন্যায়-ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতীক। নিরপেক্ষতা, সূক্ষ্মবিচার-শক্তি, অসীম ধৈর্য্য, সহাস্য বদন ও অমায়িকতার জন্য এই দীর্ঘ মামলার বিচার কালে তিনি ঢাকাবাসী হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের আন্তরিক শ্রদ্ধা পাইয়াছেন।

পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, তাহার সকল বিষয়ের সকল সংবাদ কাহারও রাখা সম্ভবপর নহে। এই বাঙ্গালা দেশেরই "বর্দ্ধমানে" প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে "জাল প্রতাপ" বলিয়া এক মামলা হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রেও বর্দ্ধমানের রাজকুমার প্রতাপ চাঁদের 'মৃত্যু' ঘোষণা করা হয়; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া নিজেকে 'প্রতাপচাঁদ' বলিয়া পরিচয় দেন। তখনকার বিচারে ফৌজদারী আদালতে তিনি দণ্ডিত হন, এবং প্রতারক বলিয়া

সাব্যস্ত হন। বর্ত্তমান মামলার ফল দেখিয়া অনেকে মনে করিতেছেন 'প্রতাপ-চাঁদের' মামলায় হয়ত ভুল হইয়াছিল সংসারে কিছুই অসম্ভব নহে। ভগবানের বিধানে মৃতব্যক্তি পুনর্জ্জীবন লাভ করে—পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, আর বামন চাঁদ ধরিতে সমর্থ হয়। তাঁহার ইচ্ছায়ই সব হইয়া থাকে। আর কুমারের মৃত্যু ত স্বার্থান্ধের ষড়যন্ত্র মাত্র।

ভগবানের বিচার ও মানুষের ন্যায়বিচার চিরদিন একই, এই কথা সাধারণের অবগতির জন্য "ভাওয়াল মামলার রায়ের" অবিকল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম। আশা করি সুধী পাঠকপাঠিকাগণের আনন্দ ও কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য এই পুস্তকখানি সকলের নিকট আদৃত হইবে। এই মোকদ্দমার বিচারকালে স্বার্থশূন্য বিভিন্ন ব্যক্তি যে সকল কবিতা গান প্রভৃতি লিখিয়াছেন ইতিহাসের দিক হইতে তাহারও যথেষ্ট মূল্য আছে মনে করিয়া পরিশিষ্টে তাহা মুদ্রিত হইল। বিবাদিনী মেজরাণীকে প্রায় একমাস কাল জেরা করায় যে সব কথা বাহির হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। আশা করি এই রহস্যময় সুবৃহৎ ইতিহাসখানি হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক গৃহে আদরের সহিত গৃহীত ও রক্ষিত হইবে।

আমাদের এই নিবেদন পত্রে সম্পূর্ণ প্রসঙ্গানুমোদিত না হইলেও কতগুলি বিষয় না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না। এস্থলে আমরা মেজরাণী বিভাবতী সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব। বিচারক পান্নাবাবু রাণীর বিশেষ কোন অপরাধ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন "রাণী ভ্রাতার হাতের পুতুল।" কিন্তু সাধারণে বলে রাণী তাঁহার ভ্রাতা সত্যবাবুর ষড়যন্ত্র না বুঝিয়া আশু ডাক্তার ও সত্যবাবুর কার্য্যের সহায়তা করিয়া শেষ অবধি সে পাপ হইতে অব্যাহতির উপায় নাই দেখিয়া বাধ্য হইয়া শেষ পর্য্যন্ত সত্য বাবুর সাহায্য করিয়াছেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে ভগবানের বিচারই শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু যখন ইন্সিওরেন্স কোম্পানি ও গবর্ণমেণ্ট—রাণী, সত্যবাবু ও আশু ডাক্তারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা আনিবেন, তখন এই মামলার গতি কি হইবে?

ভাওয়াল সন্ন্যাসী

প্রথম অধ্যায়

ভাওয়াল কাহিনী ও জয়দেবপুর রাজপরিবার

ভাওয়ালের ইতিহাস লিখিবার প্রথমেই মনে পড়ে, ভাওয়ালের—জয়দেবপুরের কৃতি-সন্তান স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসকে। তিনি ভাওয়ালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন,—তাঁহার জন্মভূমি জয়দেবপুরের যে সৌন্দর্য্যের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাহার জন্মভূমির প্রতি আকৃষ্ট করিতে শিক্ষা দেয়। কবি মনের আবেগে জন্মভূমি জয়দেবপুরকে 'স্বর্গপুর' বলিয়া উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"বাংলাদেশে আছে এক 'স্বর্গপুর' গ্রাম,
গাছ গাছরায় ভরা তাহা নবীন-ঘনশ্যাম,
উত্তরে তার রূপার রেখা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
মন্দাকিনীর মত তাহার মন্দ মন্দ গতি
দেবপুর নিবাসী কত দেবের দেহ ছাই,
ধরি বুকে মনের সুখে বহিছে চিলাই,
তার উত্তরে শোভা করে বিশাল গজার বন,
বাঘ ভালুক বেড়ায় কত খেলায় হরিণগণ।"

ইত্যাদি সুদীর্ঘ কবিতায় জয়দেবপুরের শোভা, রাজবাড়ীর সৌন্দর্য্য, রাজা-রাণীদিগের বিবরণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভাওয়ালের প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

"ভাওয়ালে বেলাই বিলে, কিবা সন্ধ্যা কি সকালে,
বাজায় মরাল-কণ্ঠে শঙ্খ অনিবার।"

*　　*　　*

"রাঙ্গামাটী, পলাকাটি, খাঁটি সোণার মত
স্থানে স্থানে ভ্রম হ'য়ে যায় মৈনাক শত শত।"

"রাঙ্গামাটী, পলাকাটি, ঢালগড়ান ভূঁই
দুধ খেতে মায়ের বুকে কাপড় ঠেলে থুই।"

* * *

এহেন অনন্যসাধারণ নৈসর্গিক শোভাসম্পন্ন প্রকৃতির লীলাভূমি ভাওয়ালের জয়দেবপুর! দিকে দিকে বনবিহঙ্গের কাকলী-ধ্বনি। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলাগুলি নানাবিধ বন্য বৃক্ষ সমাচ্ছাদিত অপরূপ সৌন্দর্য্যের আধার জয়দেবপুর—সেই পুণ্যভূমিতে জন্মিয়াছিলেন স্বভাবকবি গোবিন্দদাস—আর সেখানে রাজ কুমারদের শিক্ষা দীক্ষার আকাশে ধূমকেতু হইয়া উদয় হইয়াছিলেন বঙ্গের চিন্তাশীল লেখক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর। তিনি হয়ত কোন স্বার্থ প্রণোদিত হইয়াই ভাওয়াল কুমারদের শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করেন, যাহার ফলে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজকুমার প্রকাশ্য আদালতে প্রায় নিরক্ষর সাব্যস্ত হইতে চলিয়াছিলেন;—হয় ত বিধাতার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যেই এমন বিপর্য্যয় হইয়াছে।

জয়দেবপুর একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল, ঘোষ মহাশয় গিয়াই তাহা উঠাইয়া দেন। তাহার ফলেই কুমারদিগের তেমন শিক্ষা লাভ হয় নাই—

'অঙ্কুরে মজিল যেই,—
কেমনে সে হবে মহীরুহ?'

যাক্ সে সকল বিষয়ের অবতারণা পরে করা যাইবে। এখন ভাওয়ালের—জয়দেবপুরের ইতিহাস আলোচনা করা যাইতেছে।

মহাভারতের বর্ণিত শিশুপালের রাজধানী চেদীরাজ্য, এই ভাওয়াল পরগণায় ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এই ভাওয়াল পরগণা বুড়ীগঙ্গার উত্তর তীর হইতে আরম্ভ। আর বর্ত্তমান ই, বি, রেলের কাওরাইদ ষ্টেশন ভাওয়াল পরগণার সর্ব্বোত্তর সীমা। কোন্ সময় কি ভাবে ভাওয়াল পরগণা দিল্লীশ্বরের অধিকার ভুক্ত হইয়া ছিল, তাহার সঠিক বিবরণ জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে ভাওয়ালের অন্তর্গত 'চৈরী' নামক স্থানে মুসলমান গাজীবংশ অতি সম্ভ্রান্ত ছিলেন, রাজধানী ঢাকার নবাব সাহেবের অধীনে ঢাকা জেলার কয়েকটী পরগণার শাসন ভার গাজীবংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ঐ বংশের 'ভাওয়ালগাজী' নামক জনৈক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে কতক জায়গীর প্রাপ্ত হন। সেই ভাওয়াল গাজীর নামানুসারেই 'ভাওয়াল' পরগণার নামকরণ হইয়াছে। বিক্রমপুর পরগণার বজ্রযোগিনী গ্রামের কুশধ্বজ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ,

একটী সুপ্রশস্ত রাজপথ, একটী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস্ ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত কতক গুলি স্থানে কয়েকটি বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় তদীয় অর্থানুকূল্যেই স্থাপিত হইয়াছে।

তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন, জমিদারীর আয়ের প্রতি টাকাতে দুই পয়সা হিসাবে প্রজারহিতে ব্যয় করা হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পর এই 'আয়' জমিদারীর আয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তিনি ভাওয়াল পরগণার সাতআনার মালিক। গাছার জমিদার, 'পূবাইল'ও 'বলধা'র জমিদার, এই সকল জমিদারের সহযোগিতায় জয়দেবপুরে ইনি 'প্রজাহিতৈষিণী সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। তিনি শিকার করিতে বিশেষ উৎসাহী ও পারদর্শী ছিলেন। গানবাজনার প্রতি তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। নিজেও একজন উচ্চদরের সমজদার ছিলেন। ঢাকা নগরীর পার্শ্বে প্রবাহিত বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড় বান্ধাইবার জন্য তিনি **বিশহাজার টাকা দান করেন, এবং বাক্‌লাণ্ড সাহেবের নামানুসারে ঐ বাঁধের নাম বাক্‌লাণ্ড বাঁধ হয়।*** ভাওয়াল পরগণার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়া রাজবাড়ীতে (বিক্রমপুর) প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের তাম্র শাসন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনিই নিজ ব্যয়ে ভাওয়ালের ইতিহাস মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার **অসাধারণ গুণে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন।** কালীনারায়ণ পরিণত বয়সে ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য একমাত্র প্রিয়তম নাবালক পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্য বুঝাইয়া দিলেন, এবং ভূতপূর্ব্ব বান্ধব সম্পাদক সাহিত্যিক রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ শিক্ষিত ও সুশাসক ছিলেন; কিন্তু

* পিতামহের এই কীর্ত্তিমূলে বসিয়া কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ লোকচক্ষে পরিচিত হইয়াছিলেন। পিতা পিতামহ, প্রপিতামহদের কীর্ত্তিসমূহ দেখিয়া, হয়ত তিনি মনে মনে রামচন্দ্রের মত বলিয়াছিলেন :—

> "সগরাৎ সাগরঃকীর্ত্তি, গঙ্গাকীর্ত্তির্ভগীরথাৎ
> অস্মাকং সাদৃশীকীর্ত্তি—মেকাভাগ্যা পরহিতা।"

বিধি বিড়ম্বনায় এই সময়ে ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস রাজার ম্যানেজার সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় আলোচনা যুক্ত পুস্তকাদি রচনা করার ফলে কবি জন্মভূমি ভাওয়াল হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সুদূর মধুপুরে আত্ম-গোপন করিয়াও ভাওয়ালেরই কথা লিখিলেন"—

'ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান।
তার সে মধুর প্রীতি, মনে জাগে নিতি নিতি,
তাহার মমতা মায়া বুকে ডাকে বান।
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ।"

লোকে কথায় বলে, এক বিলে নাকি দুই 'কোঁড়া' চরে না। সেইজন্যই হয়ত এক জয়দেবপুরে সাহিত্যিক রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ও স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের একত্র মিলন বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। তাই 'পরগাছা' মূল বিদ্ধ করিয়া স্থায়ী পাট্টা লইয়া বসিল। আর কবি? 'নিজ বাস ভূমে পরবাসী'। **রাজা রাহাদুর জয়দেবপুরে 'রাজবিলাস' নামক প্রাসাদ ও জলের কল নির্ম্মাণে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন**। তিনি নানাগুণের আধার ছিলেন। চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও বাদ্যাদিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি শিকারে বিশেষ ওস্তাদ ছিলেন। জয়দেবপুর ও তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত কালীগঞ্জ নামক স্থানে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, এবং তাঁহার এই উৎসাহের ফলেই জয়দেবপুরে "সাহিত্য সমালোচনী" সভা স্থাপিত হয়। দেশের অনেক সাহিত্য সেবী তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন। কবি রাজকৃষ্ণরায়কে রাজাবাহাদুর মহাভারত অনুবাদের জন্য ১২০০০ হাজার টাকা দান করেন। **পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের জন্য তিনি বহু অর্থ দান করেন**। ঢাকা কলেজেও তিনি কয়েকটী বৃত্তি দান করিয়াছেন। ঢাকা হাসপাতালে তিনি বহু লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বাংলা ১২০০ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। ইং ১৯০১ সালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। ইঁহার জেষ্ঠপুত্র কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় মধ্যমপুত্র, এবং কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায় কনিষ্ঠপুত্র, এবং জ্যোতির্ম্ময়ী, ইন্দুময়ী ও তাড়ন্ময়ী এই তিন কন্যা রাখিয়া রাজা বাহাদুর পরলোক গমন করেন।

ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করেন। কিন্তু তাঁহার দ্বারা রাজেন্দ্রনারায়ণের কোন সুশিক্ষা হয় নাই এবং তিনি বিষয়কার্য্যে কোনরূপ লিপ্ত না হইয়া অসার আমোদ প্রমোদে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট থাকিতেন। তাহার ফলে এই হইয়াছিল যে, রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্রত্রয়েরও শিক্ষার কোন বিশেষ বন্দোবস্ত হয় নাই। কুমারগণ বাংলা কিম্বা ইংরাজী কোন ভাষাতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন না, তবে রাজপুত্র বলিয়া পার্টি ইত্যাদিতে যাতায়াত করার দরুণ ইংরাজীর বোলচাল কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলেন মাত্র। তাহারা কুসঙ্গী পারিষদবর্গে দিবারাত্র পরিবেষ্টিত থাকিয়া অন্যায় আমোদ প্রমোদে নিবিষ্ট থাকিতেন। এমন কি নিজ নাম দস্তখত করিতেও উহাদিগের হইতে অত্যন্ত কষ্ট হইত এবং দায় সময় অতিবাহিত হইত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেকেই ভাওয়ালের পক্ষে কুমারগণের বিষয় অবগত আছেন।

এই সময়ে মধ্যম কুমারের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পর পারিষদবর্গের পরামর্শে বড় কুমার ভ্রাতার শোক ভুলিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত মদ্যপান আরম্ভ করেন এবং বাহিরবাটীতে অবস্থান করিতে থাকেন। শালাবাবুর সহিত মধ্যম কুমারের পত্নী ও সঙ্গের লোক সকল জয়দেবপুরে ফিরিয়া আসিলে **কুমারের মৃত্যু সম্পর্কে সঙ্গীয় লোকগণ দ্বারা নানা কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং কুমারের দেহ দাহ করা হয় নাই বলিয়া সঙ্গীয় লোক কেহ কেহ প্রকাশ করে।** তখন কুমারের দশাহ ও শ্রাদ্ধ সম্পর্কে গোলযোগ ঘটে, এই বিষয় পূর্ব্ববঙ্গের অনেকেই জানেন।

দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধ্যম কুমারের পত্নী শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবী কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ভ্রাতা সত্যবাবুর মুখ দর্শন করেন নাই। এবং **"তিনিই তাঁহাকে পথের ভিখারিণী করিবার মূল"** এইরূপ উক্তি করিতেন। এদিকে সত্যবাবু কুমারের দশাহের পূর্ব্বেই ভগ্নী বিভাবতী দেবীর স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে অর্থাগমের চিন্তায় মুকুন্দ গুপ্ত সহ উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতা চলিয়া যান। ২০ বৎসর বয়স্কা নিঃসন্তান কনিষ্ঠা ভগিনী অকস্মাৎ বিধবা, এই সংবাদ অন্যের হৃদয়ে শেলাঘাত করিলেও সত্যঃ বিধবা ভগ্নীর স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে নিজ অর্থোপার্জ্জনের কল্পনায় উকীলের পরামর্শের জন্য কলিকাতা গমন **সত্যবাবুর পক্ষে স্বাভাবিকই বটে।** এ বিষয়ে পরে এই পুস্তকে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

স্বনামখ্যাত উকীলবাবু আনন্দচন্দ্র রায় এবং ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডের উকীল বাবু গগনচন্দ্র ঘোষ ও জ্ঞানদাকিশোর রায় এবং কবি বাবু কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহুলোক সমক্ষে প্রকাশ করেন যে, তিনি অনবরত সমবেত লোকমণ্ডলীকে সন্ন্যাসী সম্পর্কে তাহাদিগের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু **প্রত্যেকেই উক্ত সন্ন্যাসীকে কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ বলিয়া বলিয়াছে, এক ব্যক্তিও সাধু কুমার নহে, এমন কথা বলে নাই।**

১৫ই মে তারিখের সভাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত সন্ন্যাসী ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিয়া গৃহীত হন।

ইহার পর ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কুমারের বাস, মৃত্যু এবং দেহ-সংকার প্রভৃতি বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান জন্য দার্জ্জিলিং যান। তিনি কুমারের বাল্যকাল হইতেই বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে কুমারকে চিনিতেন। সুরেন্দ্রবাবু ঢাকাতে বিশেষ পরিচিত এবং দশের নিকট বিশেষ গণ্যমান্য বটেন। তাঁহার সততা এবং সাহসিকতার বিষয় ঢাকার অনেকেই অবগত আছেন, সুতরাং নূতন করিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। উক্ত সুরেন্দ্রবাবুই ডাঃ ক্যালভার্টের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য বিলাত গিয়া কুমারের তথাকথিত মৃত্যুর অনেক গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু দার্জ্জিলিং যাইয়া কতক সময় পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কুমারের পীড়া, মৃত্যু এবং তাঁহার দেহ শ্মশানে লওয়া এবং সংকার করা সম্পর্কে বহু সংবাদ এবং প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তিনি দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীর সম্মুখস্থ বৃহৎ মাঠে ভাওয়ালের তালুকদার এবং প্রধান প্রজাবৃন্দের সভাতে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন।

১। এই সন্ন্যাসী ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ ভিন্ন অপর কেহ নহেন।

২। কুমারের দেহ যে সংকার হয় নাই, সেই সম্বন্ধে সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

৩। নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের সাক্ষ্যে প্রমাণ হইবে যে, এই সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়।

৪। তাঁহার নিকট যে সমস্ত প্রমাণ রহিয়াছে, তাহা দ্বারা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-প্রেরকগণের যাবতায় তর্ক মীমাংসিত হইতে পারে।

ইহার কিছুকাল পরে কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামধেয় কোন এক ব্যক্তি কোথা হইতে 'ভাওয়ালী কাণ্ড' নাম দিয়া একখানা পুস্তিকা প্রনয়ণ করিয়া প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য স্থানে ডাকযোগেও তাহা বিতরিত হয়। পুস্তকখানা দেখিলাম, ইহাতে মূল্য লেখা নাই।

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত না হইলেও অনেকেই তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনেন। তাঁহাকে নাকি কেহ কেহ পত্র লিখিতেছেন, আজ ভাওয়ালের কথায় চুপ রহিয়াছেন কেন? "তিনি নাকি নীরব থাকায় কাহারও কাহারও অনুযোগভাজনও হইয়াছেন ইত্যাদি অজুহাত দেখাইয়া এবং তিনি নাকি সঠিক তথ্য পূর্ব্বে সুনিশ্চিতরূপে অবগত না হইয়া এবং পাকা ভিত্তির উপরে ভিন্ন কথা বলেন না। এবং তিনি ভাওয়ালের ব্যাপারের সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার নাকি তাঁহার বিশেষ পরিচিত এবং প্রীতিভাজন ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মনো-বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার পর বড় রাজকুমারের সহিত নাকি তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে তখন কোন দিন কুত্রাপি এমন কথা শুনেন নাই, যে "দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যুতে সন্দেহ করিবার মত ব্যাপার আছে।' অনুসন্ধানে তিনি "যে সকল জানিতে পারিয়াছেন, তাহা নাকি বাস্তবিকই কৌতুহলপ্রদ এবং উপন্যাসের গল্পের মত চমৎকার" ইত্যাদি রূপ লম্বা লম্বা কথায় মুখ বন্ধ করিয়া কেদার নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সত্যের অনুরোধে যে প্রস্তাবের অবতরণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিরপেক্ষতা দূর হইয়া অতি অল্প সময়েই তাঁহার কপটতা প্রকাশ পাইয়াছে। কেদার বাবুর ভূমিকায় এবং নিজের নিরপেক্ষতার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া তাঁহার লিখিত ভাওয়ালী কাণ্ডের কয়েক পৃষ্ঠা আলোচনা করিলেই তাঁহার জন্য দুঃখও হয় এবং হাসিও পায়। অর্থাৎ অর্থস্য পুরুষো দাসঃ। কেদার বাবুর দোষ কি? তবে নিজের নিঃস্বার্থতা এবং

সংখ্যা ছড়াইয়া গিয়াছে। বাদীপক্ষে মোট ১০৬৯ (আদালতে ১০৪২ জন এবং কমিশনে ২৭ জন) এবং বিবাদীপক্ষে মোট ৪৭৯ জন (আদালতে ৪৩৫ এবং কমিশনে ৪৪ জন) সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। এই মামলায় প্রায় ২০০০ একজিবিট দাখিল হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ১০০ ফটো আছে।

সুবিজ্ঞ বিচারকের পদোন্নতি

এই মামলার একটী প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, বিচারক শ্রীযুত পান্নালাল বসুর এজলাসে যখন শুনানী আরম্ভ হয়, তখন তিনি ঢাকার ৫ম সাবজজ ছিলেন ; কিন্তু ১৩৩৫ সালে তিনি অতিরিক্ত জজের পদে উন্নীত হন ; এই মামলার বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা বিবেচনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এই মামলা অন্য কোর্টে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঢাকার জনসাধারণের মধ্যে ঔৎসুক্য

এই মামলার সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—ইহার ঘটনাবলী সম্পর্কে ঢাকার জনসাধারণের মধ্যে ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্য সমগ্র বঙ্গদেশ, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল ঔৎসুক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকা সহরে ত কথাই নাই—পথে, ঘাটে, খেলার মাঠে, নদীর পারে, চা'য়ের দোকানে, বার লাইব্রেরীতে, অফিসে, মুদীর দোকানে, নিমন্ত্রণ বাড়ীতে, যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে গাড়োয়ানদের আড্ডা, মুদী দোকানে বা মুসলমানদের চায়ের দোকানে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইত, একজন পরম উৎসাহভরে দৈনিক পত্রিকা পড়িতেছে এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী পরম উৎসাহভরে মামলার বিষয়ে টীকা টিপ্পনী করিতেছে এবং "রাজা" জিতিবে, না "রাণী" জিতিবে, তাহা নিয়া গম্ভীরভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। সময় সময় এই বিষয় নিয়া মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। আরমানীটোলার একজন প্রবীণ উকিলের বৈঠকখানায় প্রত্যহ সান্ধ্য সম্মিলনীর আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল এই মামলা। ঐ রাস্তা দিয়া যে কোন ব্যক্তি গেলেই টের পাইত যে, উঁহাদের উৎসাহ কি প্রকার। সময় সময় ঐ সব প্রবীণ ব্যক্তির মধ্যে মৌখিক আলোচনা একেবারে চরমে উঠিয়া গরম হইয়া যাইত।

সাক্ষীদিগের লাঞ্ছনার অভিযোগ

বিবাদী পক্ষ মাঝে মাঝে অভিযোগ করিয়াছেন যে তাঁহাদের পক্ষীয় সাক্ষীদিগকে আদালত গৃহের বাহিরে জনসাধারণের হাতে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। তাঁহারা ধরমদাস নামক যে ব্যক্তি দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিকে আদালতের বাহিরে জনতা ঢিল ছোঁড়ে এবং গালাগালি করে। সেই ব্যক্তিকে যে মোটরে আদালত হইতে লইয়া যাওয়া হয়, সেই মোটরও না কি জনসাধারণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল পক্ষান্তরে বিবাদী পক্ষীয় সাক্ষী—সত্যবাবু, আশু ডাক্তার, রায় সাহেব উমেশধর, অখিল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কলঙ্কিত হইয়াছেন। অনেক সাক্ষী অভিযোগ করিয়াছিল, বিবাদী পক্ষের লোক তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে বারণ করিয়াছে এবং ভীতি প্রদর্শনও করিয়াছে।

আদালতে সাক্ষীর মূর্চ্ছা

একদিন বাদীপক্ষের একজন ১১০ বৎসর বয়স্কা সাক্ষী শ্রীযুক্তা শিবসুন্দরী মিত্র বিধবা আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া ভাল করা হয়; সেইজন্য কয়েক ঘণ্টা আদালতের কাজ বন্ধ থাকে।

উভয়পক্ষের কৌঁসুলীগণ

বাদীপক্ষে ব্যারিষ্টার মিঃ বি সি চাটার্জ্জি, এডভোকেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, শ্রীযুত নীলকমল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত মন্মথকুমার বসু, শ্রীযুত অরবিন্দ গুহ, শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুত চুণীলাল চৌধুরী, শ্রীযুত ফণীভূষণ বসু, শ্রীযুত সুবোধ কুমার মুখোটি, শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি উকিলগণ এবং বিবাদী পক্ষে মিঃ এ, এন, চৌধুরী, সরকারী উকিল রায় বাহাদুর শশাঙ্কুমার ঘোষ, শ্রীযুত পঙ্কজকুমার ঘোষ, শ্রীযুত সুধীরকুমার ঘোষ, শ্রীযুত উপেন্দ্র বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি উকিলগণ মামলা পরিচালনা করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষের প্রধান প্রধান সাক্ষিগণ

সাক্ষীদের মধ্যে বাঙ্গালা ও বাঙ্গলার বাহিরে কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও এই মামলার বিচার্য্য বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বাদীপক্ষের সাক্ষীদিগের মধ্যে

চক্রবর্ত্তী (বাদী যখন জয়দেবপুর আসেন, তখন ইনি ভাওয়াল এষ্টেটের এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিলেন), মিঃ ময়ার (ভাওয়াল এষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার), মিসেস মায়াস, কর্ণেল পুলি (ভূতপূর্ব্ব পূর্ব্ববাঙ্গলার ও আসামের লেফটেনান্ট গবর্ণর সাহেবের এডিকং) লেফটেনান্ট হোসেন (ময়মনসিংহ জিলাবোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান), ভাওয়ালের মেজকুমারের শ্যালক রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী (আলিপুরের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট) ভাওয়ালের মেজরাণী বিভাবতী দেবী, ভাওয়ালের ছোটরাণী আনন্দকুমারী দেবী আলতা দেবী (মেজরাণীর মামাতো ভগ্নী), রায়বাহাদুর রমেশচন্দ্র দত্ত (অবসর প্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ বিজলী ভূষণ সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার, ব্যারিষ্টার মিঃ রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, ব্যারিষ্টার মিঃ রমেশচন্দ্র সেন, গীতা দেবী, কলিকাতা পুলিশের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে পত্নী, বাবা ধরমদাস নাগা, বাবা হরনাম দাস, মিঃ রাজেন্দ্রনাথ শেঠ (বালা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান) রায়বাহাদুর সারদাপ্রসন্ন ঘোষ (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), রায় সাহেব মহাতাপ ঘোষ ম্যাজিষ্ট্রেট (ইনি কিছু দিন পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিয়াছেন), মিঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ) মিঃ হিরণ্যলাল মুখার্জ্জি (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের এসিষ্টান্ট সেক্রেটারী) প্রভৃতি।*

---

* সত্যেনবাবু, আশু ডাক্তার, ধর্ম্মদাস প্রভৃতির সাক্ষ্য দানের দিনগুলিতে আদালতে লোকের আধিক্য পুলিশের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা হইত। মেজরাণী ও ছোটরাণীর সাক্ষ্য নলগোলা রাজবাটিতে লওয়া হইত, সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না কিন্তু সমস্ত দিন রৌদ্র বৃষ্টিতে লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া লোক মুখে সাক্ষ্য শুনিত। ইহাতেই ঐ কয়েকজন সাক্ষীর মূল্য বুঝিতে পারা যায়।

রায় হইবার পরের অবস্থা

রায় বাহির হইবার পরই সমবেত জনতা বাদীর বাসস্থান অভিমুখে ধাবিত হয়! শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও এই বাড়ীতেই আছেন। আগ্রহাকুল জনতা উৎসাহের আতিশয্যে কুমারের বাড়ীর সম্মুখস্থ সমগ্র পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় তাঁহারা ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিতে থাকে।

কুমারের অবস্থা

জনসাধারণের অনুরোধে বাদী কুমার বাহাদুর বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সকলকে দর্শন দান করেন সর্ব্বসাধারণের সাহায্য সহানুভূতি লাভের জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ দেন, "তাঁহারই অনুগ্রহে আমাদের জয় হইয়াছে।"

কথাগুলি বলিবার সময় তিনি নিজেই ভাবাবেগে বিচলিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ঢাকা সহরের সর্ব্বত্র আজ আনন্দ উল্লাস পরিলক্ষিত হইতেছে। হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলিয়া এই মামলার রায় শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

রায় শুনিবার জন্য সহস্রাধিক লোক আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল। জজের সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইয়া তাহারা সমস্বরে "ভাওয়াল কুমারকী জয়" "মেজ কুমারকী জয়"—ইত্যাদি ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করে। দেখিতে দেখিতে এই সংবাদ ঢাকা নগরীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তখন আর্ম্মাণিটোলার কুমার বাহাদুরের বাসস্থানে লোক সমবেত হয়। তাহারা নানাভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে।

আদালতের মধ্যে কেবল উকীল ও সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণকে প্রবেশ করিতে, দেওয়া হইয়া ছিল তাঁহারা সকলেই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জজের সিদ্ধান্ত শুনিবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। জজ সাহেব বলেন যে, তাঁহার রায় সুদীর্ঘ; ৫৩২ পৃষ্ঠা ফুলসকেপ কাগজে তাহা টাইপ করা হইয়াছে। অতএব তিনি সমগ্র রায় না পড়িয়া কেবল তাঁহার সিদ্ধান্তের কথাই আদালতে পাঠ করিবেন।

বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানের বার-লাইব্রেরীর সদস্যগণ, ঢাকা বার লাইব্রেরীর সদস্যের নিকট টাকা পাঠাইয়া অনুরোধ করিয়াছিল। "ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার রায়ের সারমর্ম্ম যেন তারযোগে তাহাদিগকে জ্ঞাপন করেন।"

(২) বিবাদী রাণী বিভাবতী দেবীর উপর এই মর্ম্মে একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হউক যে, ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের তৃতীয়াংশ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সম্পত্তি ভোগ দখলের ব্যাপারে তিনি যেন বাদীকে কোন প্রকারে বাধা প্রদান না করেন।

(৩) সমস্ত বিবাদীর উপর এই মর্ম্মে একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হউক যে, এই মামলার শুনানীর সময় তাঁহারা যেন বাদীর ভোগ দখলে কোন প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন না করেন।

(৪) যে অবস্থায় এবং যে কারণে মামলা আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া আইন অনুসারে বাদীর আর যদি কোন প্রকারে কোন কোন কিছু সাহায্য প্রাপ্য হয়, তাহা প্রদান করা হউক।

(৫) মামলায় বাদী পক্ষের যে ব্যয় হইবে তাহা বিবাদী পক্ষ হইতে আদায় করিবার জন্য বাদীর অনুকূলে ডিক্রি দেওয়া হউক।

মামলার প্রতিবাদিগণ

মূল প্রতিবাদিনী—রাণী বিভাবতী দেবী, ভাওয়ালের মেজকুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সহধর্ম্মিণী।

এতদ্ব্যতীত রাণী সরযূবালা দেবী (ভাওয়ালের বড়কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহধর্ম্মিণী), রাণী আনন্দকুমারী দেবী (ভাওয়ালের ছোটকুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহধর্ম্মিণী) এবং কুমার রামনারায়ণ রায় (রাণী আনন্দ-কুমারী দেবীর দত্তক পুত্র)—এই তিনজন মামলার অন্যান্য প্রতিবাদী

মামলার বিচারক

ঢাকার অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু এই মামলার বিচার করিয়াছেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। এম, এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি কিছুদিন অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯১০ সালের ২১শে মার্চ্চ তারিখে তিনি মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের প্রথম হইতে ১৯২৬ সালের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঢাকায় মুন্সেফের পদে

তিন রাজকুমার এক অঙ্গে

জননীর মৃত্যুর পর তিন কুমার পূর্ব্ববৎ যৌথ পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেন। পূর্ব্বেই তাঁহাদের বিবাহ হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়া বিবাদিনী শ্রীমতী সরযূবালা দেবীর সহিত বড় কুমারের বিবাহ হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রথমা বিবাদিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর সহিত মধ্যম কুমারের বিবাহ হয় এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চতুর্থা বিবাদিনী শ্রীমতী আনন্দকুমারী দেবীর সহিত ছোট কুমারের বিবাহ হয়। জয়দেবপুর-ভবনে রাজ পরিবার রহিতেন এবং বিবাহিতা তিন পিসীই উক্ত পরিবারভুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেন। রাজা রাজেন্দ্রের মৃত্যুর পরও তাঁহার জননী রাণী সত্যভামা দেবী পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতেন। রাজার ভগিনী শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী আপন স্বামীসহ রাজবাড়ীর পৃথক অংশে বাস করিলেও, তিনিও একপ্রকার রাজপরিবারভুক্তই ছিলেন।

স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জ্জিলিংএ মেজকুমার

১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অবস্থাই চলিতেছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল মধ্যমকুমার দার্জ্জিলিং গমন করেন। ২০শে এপ্রিল তিনি প্রথমা বিবাদিনী আপন স্ত্রী, শ্যালক বাবু [বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর] সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কতিপয় আমলা, একজন ডাক্তার ও ভৃত্যাদি সহ দার্জ্জিলিং পৌঁছেন। ৮ই মে অল্পকাল রোগ-ভোগের পর তাঁহার নাকি মৃত্যু হয়। তৎপর ১১ই মে তারিখ রাত্রিতে সকলে জয়দেবপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

রাজকুমারদের মৃত্যুর পর

প্রথমা বিবাদিনী বিভাবতী দেবী নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার স্বামীর অংশের সম্পত্তির মালিক হন। ইহার পর বড় কুমার ২৮ বৎসর বয়সে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মারা গেলে তাঁহাদের বিধবা পত্নীগণ আপন আপন স্বামীর অংশের সম্পত্তির মালিক হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ মধ্যম রাণী ও ছোট কুমারের অংশের এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বড় রাণীর অংশের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করেন। এই ভার গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই বড় ও মধ্যম রাণী কলিকাতায় গিয়া বাস করিতেছিলেন। এষ্টেটের আয় হইতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ তাঁহাদিগকে প্রচুর টাকা দিতেন। ছোট কুমারের মৃত্যুর পরই ছোট রাণী ঢাকা ত্যাগ করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া ঢাকাতেই অবস্থান করিতেছেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তৃতীয় বিবাদী রামনারায়ণ রায়কে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। একটি চুক্তির ফলে দত্তক গ্রহণের পরও তিনি আপন স্বামীর

অংশের এক ভাগের উত্তরাধিকারী আছেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্তৃত্বের বহির্ভূত হইলেও এই অংশটুকুও কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। আইনতঃ বাদীর দাবী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যান্ত ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সম্পত্তির অবস্থা এইরূপ—এষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের কর্ত্তৃত্বে আছে, তিন রাণী ও দত্তক পুত্র আপন অংশ ভোগ করিতেছেন, ছোট রাণীর ব্যাপারে একটু গোল থাকিলেও, সকল রাণী হিন্দু বিধবারূপে সম্পত্তির আপন অংশ ভোগ দখল করিতেছেন।

অবস্থা যখন এইরূপ তখন ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে বা ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ঢাকায় এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। ঢাকায় বুড়ীগঙ্গার তীরে বাকল্যাণ্ড বাঁধে বহুলোক প্রাতে ও সন্ধ্যায় আরাম ও স্বাস্থ্যের জন্য ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই বাঁধের নিকট এক স্থানে ধুনী জ্বালিয়া একটী সন্ন্যাসী দিন রাত বসিয়া থাকিতেন। সন্ন্যাসীর পরণে একটি লেংটি, অঙ্গ ভস্মাবৃত, মুখে সুদীর্ঘ শ্মশ্রু, মস্তকে সুদীর্ঘ জটা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল। এই সন্ন্যাসীই বর্ত্তমান মামলার বাদী।

আরজীতে বাদী দাবী করিয়াছেন যে, তিনিই প্রথমা বিবাদিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর স্বামী ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্ত্রী এবং কতিপয় আমলা ও আত্মীয়সহ হাওয়া বদলের জন্য তিনি দার্জ্জিলিং গমন করেন। তথায় অসুস্থ হইয়া পড়িলে, চিকিৎসাকালে তাঁহার উপর বিষ প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। মৃত মনে করিয়া রাত্রিকালে তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। শব শ্মশানে নীত হইলে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইতে থাকে, তাহাতে শববাহীদল শব ফেলিয়া অন্যত্র গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া আর শব দেহটি খুঁজিয়া পায় নাই। ইহার কয়েক দিন পর বাদী চৈতন্যলাভ করিয়া তাহার চারিদিকে কতকগুলি নাগা সন্ন্যাসীকে দেখিতে পান। সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে শুশ্রূষা করে। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। বিষ প্রয়োগের ফলে তাঁহার পুরাতন স্মৃতি প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। নানা সঙ্গীদের সঙ্গে বাদী নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বা ১৯২১ খৃ অব্দের প্রথম ভাগে ঢাকায় আসিয়া সন্ন্যাসীবেশে ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধের নিকট অবস্থান করিতে থাকেন।

বাদীর দাবী

বাদী আরও বলেন—বাকল্যাণ্ড বাঁধে অবস্থানকালে অনেকে তাঁহাকে মধ্যম কুমার বলিয়া চিনিতে পারে। অবশেষে তাঁহার আত্মীয়বর্গ ও স্থানীয়

জমিদারগণ তাঁহার আত্ম-পরিচয় প্রদানের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে তিনি আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে সকলে তাঁহাকে সংসারী হইতে বলে, প্রজারা তাঁহাকে মানিয়া লইয়া খাজানা ও নজর দিতে থাকে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে জয়দেবপুরের এক বিরাট জন সভায় তাঁহাকে মধ্যম কুমার বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। ইহার পর তিনি এষ্টেটে আপন অংশের খাজানা আদায় করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও শ্যালক ষড়যন্ত্র করিয়া তদানীন্তন ঢাকার কালেক্টার মিঃ লিণ্ডসেকে দিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন ঘোষণা করাইলেন যে, বাদী 'প্রতারক'। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর রেভিনিউ বোর্ডের নিকট বাদী এক আবেদন করিলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অংশে মাত্র তাহা অগ্রাহ্য হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাদীকে সুন্দর দাস ওরফে ভাওয়াল সন্ন্যাসী নামে অভিহিত করিয়া ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১৪৪ ধারা তাঁহার উপর জারি করিয়া আদেশ প্রদান করা হয় যে, তিনি যেন, জয়দেবপুর থানার এলাকা মধ্যে প্রবেশ না করেন। বাদী বলিতে চাহেন, খাজানা আদায় করিতেছেন ইহাতেই সম্পত্তির উপর তাঁহার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কাজেই ১নং বিবাদিনী ও তৎপক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার প্রজাদের বিরুদ্ধে যে সার্টিফিকেট জারি করিতেছেন তাহা বে-আইনী।

কুলোকের পরামর্শে মেজরাণী বিভাবতী

বাদী বলিতেছেন যে, কুলোকের পরামর্শে এবং লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে একেবারে না দেখিয়াই অস্বীকার করিতেছেন ও তাঁহার স্বত্ব নষ্ট করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। দ্বিতীয়া বিবাদিনী বড় রাণী বাদীকে মেজকুমার বলিয়া মানিয়া লইলেও এ ষ্টেটে তাঁহার অংশের পরিচালক কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার তাহা মানিতে চাহেন না। ৩নং বিবাদী এবং ৪নং বিবাদিনী স্পষ্টতঃ কিছু না বলিলেও তাঁহাদের আচরণ হইতে মনে হয় যে তাঁহারা বাদীর বিরুদ্ধ। ছোটরাণীর দত্তক সিদ্ধ কি না বাদী তাহা জানেন না, তবে ইহা ঠিক যে, এই দত্তকপুত্র এষ্টেটের অংশ ভোগ করিতেছেন, এইজন্য দত্তক পুত্রকেও বিবাদী করা হইয়াছে।

বিবাদীগণের বক্তব্য বিষয়

৩নং বাদী এবং ৪নং বিবাদিনী এই মামলার বিরুদ্ধে দাড়াইয়া আদালতে লিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। ২নং বিবাদিনী বড়রাণী বাদীর দাবীর

প্রতিবন্ধক হন নাই, বাস্তবিক পক্ষে তিনি হলফ করিয়া বাদী ও মেজ কুমারকে অভিন্ন ইহা আদালতে বলিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিবাদীপক্ষ বলিতেছেন যে, দার্জ্জিলিংএ কুমার রমেন্দ্র পিত্তশূলে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে প্রায় মধ্য রাত্রিতে মারা যান এবং পরদিবস প্রাতে তাহার শব সংকার করা হয়। বাদীকে কেহ মধ্যম কুমার বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। তিনি মোটেই বাঙ্গালী নহেন। বাঙ্গালা ভাষা তিনি কখনও জানিতেন না। কতিপয় মতলবী লোক আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছে। ছোট রাণী বলিতে চাহেন যে, কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ কুমারদের তিন ভগিনীকে রাজপরিবার হইতে বিতাড়িত করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দত্তক গ্রহণে তাহাদের সকল আশা বিলুপ্ত দেখিতে পাইয়া এই ভগিনীগণ এক পঞ্জাবী সন্ন্যাসীকে মধ্যম কুমার বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। বিবাদীদিগের বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, কতকগুলি কাজের জন্য রাজপরিবারের আত্মীয়বৃন্দও প্রজাদের নিকট কোর্ট অব ওয়ার্ডস অপ্রিয় হইয়া পড়ে। বিবাদী পক্ষের আরও বক্তব্য এই যে, বাদীকে মেজকুমার বলিয়া মানিয়া লইলেও এই মামলা তামাদি দোষে দুষ্ট। কারণ, প্রথমা বিবাদিনী ১২ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া তাঁহার অংশে বিরুদ্ধ স্বত্ব ভোগ করিতেছেন। আরও বাদী নিজেই যখন বলিয়াছেন যে, তিনি সংসার ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার দাবী নষ্ট হইয়াছে।

মামলার বিচার্য্য বিষয়গুলি এই—

১। বাদী মামলা দায়ের করিতে পারেন কি না?

২। মামলা তামাদি দুষ্ট কিনা?

৩। স্পেসিফিক রিলিফ আইনের ৪২ ধারা অনুসারে মামলা বাতিল হইতে পারে কিনা?

৪। মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারাণ রায় জীবিত আছেন কি না?

৫। বর্ত্তমান বাদী ভাওয়ালের মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় কি না?

৬। মামলার তায়দাদ ও ষ্টাম্প ঠিক আছে কি না?

৭। ভাওয়াল এষ্টেটের কোন অংশে বাদীর কখনও দখল ছিল কি না? যদি না থাকে তাহা হইলে মামলা টিকে কি না?

৮। বাদীর আরজীর দ্বিতীয় প্যারার শেষ অংশে যে অভিযোগ করা হইয়াছে—তদনুসারে কোনও প্রতিকার বাদী পাইতে পারেন কি না?

জনসাধারণের আগ্রহ কত বেশী। কিন্তু জনপ্রিয়তায় বাদীর আর কি লাভ হইবে? আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদির উপরই বিচার্য্য বিষয়ের মীমাংসা হইবে। বাদীর কাহিনী যেন উপন্যাস। কিন্তু সর্ব্বশ্রেণীর শত শত ব্যক্তি এবং ছয়জন বাদে আর সকল আত্মীয় শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদীই মেজকুমার। আত্মীয়দের মধ্যে আছেন কুমারের ভগিনী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, ভ্রাতৃবধূ বড় রাণী, এমন কি মেজরাণীর নিজের মাতুলানী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মহিলা শ্রীমতী সরোজিনী দেবী। কাজেই এইরূপ মামলার প্রযুক্ত প্রমাণাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে।

সনাক্ত সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয় সমূহ।

বাদীকে সনাক্ত করা সম্বন্ধে কি কি বিষয় কি ভাবে আলোচনা করিব, আমি তাহা উল্লেখ করিব—

১। রাজপরিবার, পৈত্রিক বাসভূমি, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে দ্বিতীয়কুমারের তথাকথিত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পারিবারিক ইতিহাস, এই তারিখের পূর্ব্বে মধ্যমকুমার, তাঁহার শিক্ষা, আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, চরিত্র, স্ত্রীর ও ভগিনীগণের সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি (রায়ের ১৯ পৃঃ হইতে ৬২ পৃঃ পর্য্যন্ত)।

২। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মে হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর বাদীর ঢাকায় আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা। রায়ের ৬৩ পৃঃ হইতে ৮৫ পৃঃ)।

৩। এই মামলা দায়ের হওয়া পর্য্যন্ত বাদী ও বিবাদীদের কার্য্যাবলী (রায়ের ৮৬ পৃঃ হইতে ১৬০ পৃঃ)।

৪। সনাক্ত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ (রায়ের ১৬৩ পৃঃ হইতে ২৪১ পৃ পর্য্যন্ত)।

৫। কুমার ও বাদীর অঙ্গ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য (রায়ের ২৪২ পৃঃ হইতে ২৬৫ পৃঃ পর্য্যন্ত)।

৬। ফটো হইতে অঙ্গবৈশিষ্ট্য (পৃঃ ২৬৬ হইতে ২৮৫ পৃঃ)।

৭। বাদীর অঙ্গচিহ্ন (পৃঃ ২৮৬ হইতে ৩০৯ পৃঃ)।

৮। চলিবার ভঙ্গি, হাবভাব ও কণ্ঠস্বর (পৃঃ ৩০৯ হইতে ৩১১ পৃঃ)।

৯। সনাক্তি অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (পৃঃ ৩১১ হইতে পৃঃ ৩১৩)।

১০। বাদীর মন (পৃঃ ৩১৩ হইতে পৃঃ ৩৪৬)।

১১। কুমার কি নিরক্ষর ছিলেন (পৃঃ ৩৪৬ হইতে পৃঃ ৩৭৭)।

১২। স্বীকারোক্তি ও আচরণ (পৃঃ ৩৭৭ হইতে পৃঃ ৩৮৩)।

১৩। দার্জ্জিলিং (পৃঃ ৩৮৩ হইতে পৃঃ ৪৮৯)।

তৎকালে পূর্ব্ব বাঙ্গলার গর্ব্বের বস্তু ঢাকার প্রসিদ্ধ থিয়েটার হলে লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং রাজা কালীনারায়ণকে 'রাজা' সনদ প্রদান করেন। রাজা কালীনারায়ণ ১২৮৫ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করেন।

কুমারদের পিতামহী রাণী সত্যভামা দেবী

রাজা কালীনারায়ণ দুই পত্নী—জয়মণি ও সত্যভামা, এক পুত্র রাজা রাজেন্দ্র ও এক কন্যা কৃপাময়ীকে রাখিয়া লোকান্তরিত হন। উপরোক্ত দুই বিধবা পত্নী ব্যতীত, ব্রহ্মময়ী নামে রাজার অপর এক পত্নী ছিল, ব্রহ্মময়ীর কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। জয়মণি রাজা কালীনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী, সত্যভামা কনিষ্ঠা। এই কারণে রাণী সত্যভামার ছোট ঠাকুরমা নাম, চিঠিপত্রে এবং এই মামলার সাক্ষ্যে বহুবার উল্লেখ রহিয়াছে। রাণী সত্যভামা রাজা রাজেন্দ্রের জননী এবং কুমারদের পিতামহী। বাদী যখন ফিরিয়া আসেন তখন সত্যভামা জীবিতা ছিলেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণে প্রকাশ, তিনি বাদীকে চিনিতে পারিয়া ছিলেন এবং ঢাকায় আসিয়া বাদীর সহিত বাস করিতে থাকেন। রাণী সত্যভামা ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর বাদীর বাড়ীতেই দেহত্যাগ করেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের দেহত্যাগ

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৪৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি যখন উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন তৎকালে তাঁহার বয়স আনুমানিক ২১ বৎসর ছিল। ইহার পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ বিলাসমণি দেবীকে বিবাহ করেন। রাণী বিলাসমণির বয়স তৎকালে ১৪ বৎসর ছিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তারিখে রাণী বিলাসমণি পরলোক গমন করেন। বরিশাল জিলার বানরীপাড়া গ্রামে রাণী বিলাসমণি এক দুঃস্থ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই ভগ্নী ও দুই ভ্রাতা জীবিত আছেন। দুই ভগ্নী ও এক ভ্রাতা বাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। অপর ভ্রাতা বসন্ত ভট্টাচার্য্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের লাইসেন্সপ্রাপ্ত। তিনি রাজবাড়ীতে বাস করেন। কোন পক্ষই তাঁহাকে সাক্ষী আহ্বান করেন নাই।

ম্যানেজার রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ

রাজা কালীনারায়ণ রায় মৃত্যুর পূর্ব্বে ভাওয়াল এষ্টেটের একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া যান। এই ভদ্রলোক রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজারী করেন। এই মামলায় অনেকবার

পশ্চিমে লম্বিত। এই রাস্তা ধরিয়া পূর্ব্বদিকে সিকি মাইলের একটু অধিক অগ্রসর হইলে বাম পার্শ্বে রাজবাড়ী পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর পূর্ব্বদিক দিয়া এক রাস্তা উত্তরমুখে যাইয়া পূর্ব্বদিকে মোড় ঘুরিয়াছে। খানিক উত্তরপূর্ব্বে যাইয়া এই রাস্তা অপর এক রাস্তার সহিত মিলিয়াছে। এই সম্মিলিত রাস্তা শ্মশানবাড়ী বা চিলাই নদীর তীরস্থ ভাওয়াল রাজ পরিবারের শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। যেস্থানে উপরোক্ত দুইটা রাস্তা মিশিয়াছে, তথায় স্বর্ণময়ীর বাসস্থান 'নয়াবাড়ী' অবস্থিত। এই বাড়ীতে স্বর্ণময়ীর দৌহিত্র ফণিভূষণ ব্যানার্জ্জি ও তাঁহার ভাগিনেয়দের বাস।

'নয়াবাড়ী' রাজবাড়ী হইতে অৰ্দ্ধ মাইলের কিছু বেশী ও শ্মশানবাড়ী হইতে প্রায় এক শত বিশ গজ দূরে, উত্তরে রাজবাড়ী হইতে পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত চিলাই নদীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম অংশ পোয়া মাইল দূর এবং এইখানে কালাই সরদারের ঘাট রহিয়াছে। চিলাই নদীর সর্ব্বোচ্চ বিস্তার অনধিক ৫০ গজ মাত্র, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় নৌকা চলে না। অন্যান্য ঋতুতে হাতে ঠেলিয়া বা দড়ি টানিয়া নৌকা চালাইতে হয়।

জয়দেবপুর রাজবাড়ীর দৃশ্য

প্রাঙ্গণসহ ভাওয়াল রাজবাড়ীর বিস্তার—দৈর্ঘ্যে ২২ গজ চেনের মাপে সাড়ে তের চেন ও প্রস্থে পাঁচ চেন, রাজ বাড়ীর মাঝখানের বিস্তার একটু বেশী। রাজার সময়ে ভাওয়াল রাজবাড়ীতে দশটী 'মহল' ছিল প্রত্যেক মহল আড়ম্বর বর্জ্জিত বহু কক্ষ সমন্বিত দ্বিতল অট্টালিকা ছিল। গেটের সম্মুখে সদর মহল বা বড় দালান। গেট ও বড় দালানের মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত ডিম্বাকৃতি প্রাঙ্গণ ঘিরিয়া গাড়ীর রাস্তা দেউড়ীতে যাইয়া মিশিয়াছে রাজ পরিজন বড় দালানে থাকিতেন না, বাদীর জেরা সম্পর্কে পুনরায় এই বড় দালানের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন হইবে। সাধারণতঃ রাজার জঙ্গলে শিকারের সখ লইয়া যে সকল শ্বেতাঙ্গ অতিথি রাজবাড়ীতে আসিতেন তাঁহারা বড় দালানে থাকিতেন। রাজার মৃত্যুর পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মায়ার সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হইবার পর ইহা ম্যানেজারের কোয়ার্টার্স্ রূপে পরিগণিত হইতে থাকে।

বড় দালানের পিছনের আঙ্গিনায় কাঠের পাটাতনে টিনে ছাওয়া মস্ত নাট-মন্দির। নাট মন্দিরে বাইনাচ, থিয়েটার, যাত্রা বা কবি গান হইত। নাট মন্দিরের উভয় পার্শ্বে চৌতালা বাড়ী। উভয় তলায় অনেকগুলি ঘর এই সকল ঘর সংলগ্ন অলিন্দে বসিয়া মহিলারা নাটমন্দিরের গান শুনিতেন ও আমোদ উৎসব দেখিতেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাসভবন ঐখানে ছিল। রেল ষ্টেশনের নিকটে দাতব্য-চিকিৎসালয়। হাটের দক্ষিণে রেল লাইনের অন্য পার্শ্বে অতিথিশালা, হাটটিও রাজার সম্পত্তি। সোমবার ও শুক্রবার হাট বসে। সাধারণতঃ যেরূপ থাকে ঐখানেও সেইরূপ দোকান, হোটেল, আবগারী দোকান ও থানা ছিল। পরিবারস্থ শব দাহ করিবার স্থান 'শ্মশান বাড়ী'তে রাজরাজেশ্বরী দেবী মূর্ত্তি 'বুড়া বুড়ী' নামে পরিচিত। এক জোড়া গাছের নিকট রাজবাড়ীর উপরেই জল সরবরাহের কারখানা। সেখানে দীঘি হইতে জল পাম্প করিয়া পুরাণ বাড়ীর ছাদের উপর অবস্থিত সাতটি ট্যাঙ্ক ভর্ত্তি করা হইত। রাজার মৃত্যুর পূর্ব্বে পিলখানা, রাজবাড়ী হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী বোরদহতে অবস্থিত ছিল। পরে চটানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটা স্থানে পিলখানা করা হয়। পিলখানার নিকটে মাহুতদের জন্য চালা ঘর ছিল। পিলখানাটি ছিল একটি খোলা ইটবাঁধা জায়গা। ১৯০৪ সালে সেখানে ২০টি হাতী ছিল। ১৯০৯ সালে যখন দ্বিতীয় কুমার দার্জ্জিলিংয়ে ছিলেন, তখন সেখানে ছিল প্রায় ১৬টি হাতী। প্রত্যেকটি হাতীরই নাম ছিল এবং প্রত্যেকটিরই একজন করিয়া মাহুত, একজন মেট এবং দুইজন ঘেসেল ছিল। রেল ষ্টেশনের দক্ষিণ-পূর্ব্বে মিঃ ট্র্যান্সবেরী নামক এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটী চা-বাগান (রাজার সম্পত্তি) ছিল এবং প্রায় ১ মাইল দূরে একটি বাগান ছিল। পরিবারের বাসস্থানের সঙ্গে যে বিভাগ ও গৃহাদি ছিল তন্মধ্যে এইগুলিই প্রধান। এপর্য্যন্ত যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা সেই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে, যাহা খণ্ডন করিবার কিছুই নাই। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীকে দিয়া সমস্ত সম্বন্ধেই প্রমাণ উপস্থিত করাইয়াছেন। যখন বিবরণ সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় কেবলমাত্র তাহার পরেই রাজবাড়ীর দালানগুলির একটি নক্সা তাঁহারা দাখিল করেন এবং ৯৭৭নং সাক্ষীকে দিয়া কতকগুলি ঘরের পারম্পরিক অবস্থান বলান। সাক্ষী যাহা স্বীকার করিয়াছে, তাহা ছাড়া উপর তলা ও নীচের তলার নক্সা প্রমাণিত হয় নাই। এই নক্সাগুলি স্বাক্ষরশূন্য, উহাতে কোন তারিখ নাই। কে উহা করিয়াছে তাহাও কেহ জানে না। পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনগুলি উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া স্পষ্টতঃ অল্পদিন পূর্ব্বে করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

জয়দেবপুরের রাজকর্ম্মচারীবর্গ

যে সমস্ত বিভাগের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে মফঃস্বলের কর্ম্মচারীর সংখ্যা গণনার মধ্যে না আনিয়াও কেবল জয়দেবপুরের কর্ম্মচারীর সংখ্যার একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। জয়দেবপুরে বহুসংখ্যক কেরাণী, ভৃত্য, রক্ষী, আরদালী,

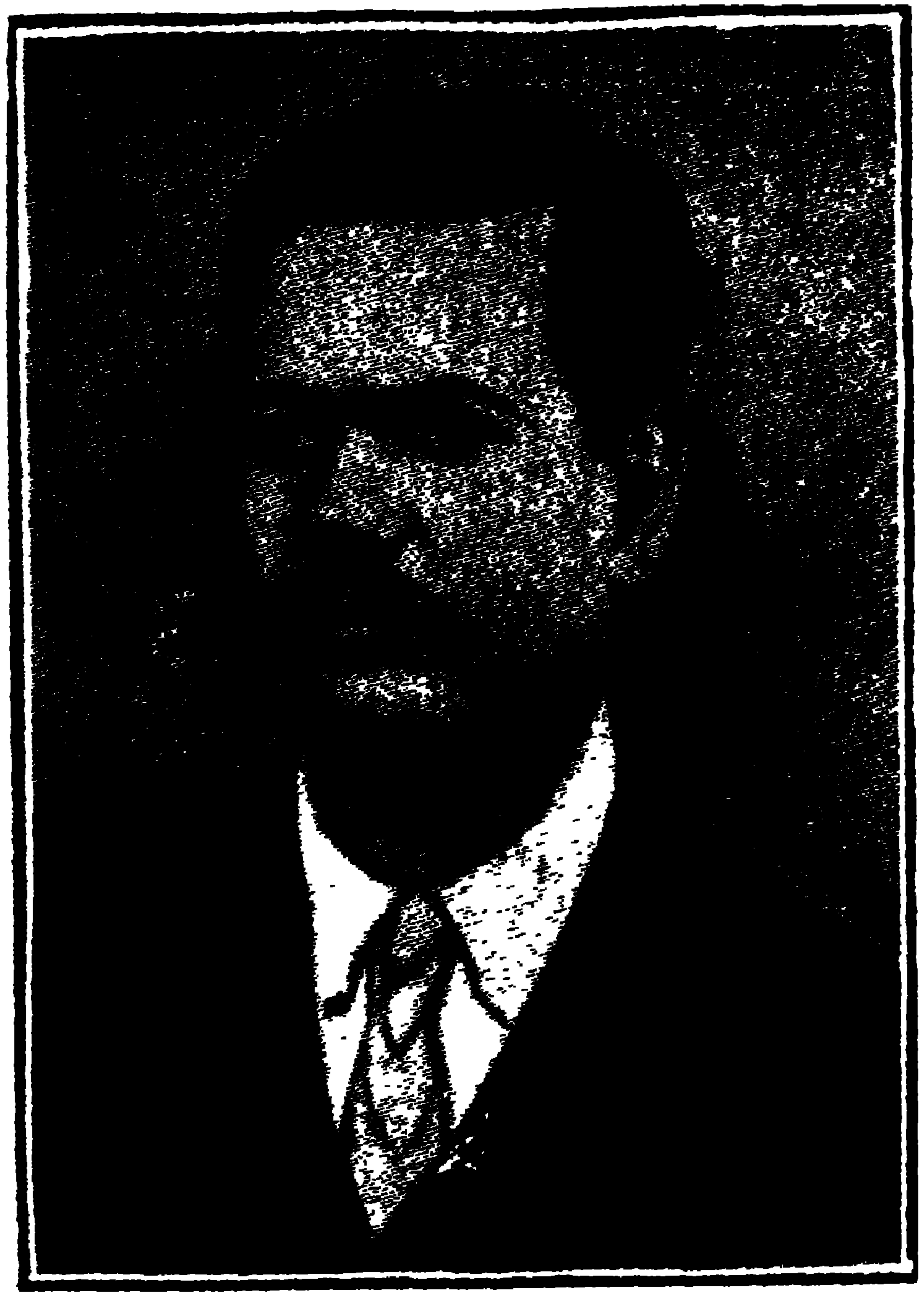

ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা—আশু ডাক্তার

সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার—মিঃ বি. সি. চাটার্জ্জি

Aparajita Press

তাঁহার দাড়ি ছিল এবং গম্ভীর রাশভারী চেহারা ছিল। তাঁহার ছেলে দ্বিতীয়কুমার তাঁহার মত 'কান' পাইয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে। যখন কুমারের দেহের বিষয়ে আসিব তখন আমি এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিব। কিন্তু ইহা বলা যথেষ্ট নহে যে, এই বৈশিষ্ট্যটুকু ও আর একটি চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন সাদৃশ্যের কথার কেহ ইঙ্গিত করে নাই। যাহাকে শিক্ষিত ব্যক্তি বলা যায়, রাজা তাহা ছিলেন না। যদিও একজন সাক্ষী তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে এরূপ বলিয়াছে; কিন্তু তিনি ইউরোপীয়দের সহিত দেখাশুনা করিতে ও মিশিতে পারিতেন। তাঁহার কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু খুব শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার শিক্ষা সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশা করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।" তাঁহার কতকগুলি চিঠি দেখিয়া বুঝা যায় যে, তিনি নিশ্চয়ই ইংরাজী লিখিতে পারিতেন কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল হইবে যে, তিনি সাহেবী ধরণের লোক ছিলেন অথবা সাহেবদের বাড়ীর মত তাঁহার বাড়ী ছিল অথবা তাঁহার জীবন যাপন প্রণালী সাহেবদের মত ছিল একটি ফটোতে তাঁহার খালি গা, তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। মধ্যে মাঝে যদিও তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিয়াও থাকেন, তথাপি তিনি বাঙ্গালী ছিলেন এবং বাঙ্গালীর মত জীবন যাপন করিয়াছেন। আমি তাঁহার বাড়ীর বর্ণনা দিয়াছি। বড় দালান নিশ্চয়ই ইউরোপীয় ধরণে সজ্জিত করা হইয়াছে; কিন্তু বাড়ীর অন্যান্য অংশে কোন প্রকারের ইউরোপীয় ধরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজবাড়ীর আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত 'কাপ বোর্ড", 'সাইড বোর্ড' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ সম্বন্ধে বাদীর অজ্ঞতাতে এই প্রশ্নের সৃষ্টি হইয়াছে যে, উক্ত বাড়ীর লোকদের অথবা কুমারদের আসবাবপত্রের ইংরেজী নাম জানা ছিল কি না ঐ প্রশ্ন সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইবে কিন্তু ইহা বলাই যথেষ্ট যে, রাজবাড়ীতে কি কি আসবাবপত্র ছিল সে সম্বন্ধে পক্ষদ্বয়ের কথায় কোন গুরুতর পার্থক্য নাই। একজন মোটামুটি সঙ্গতিপন্ন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, যিনি ২০টি হাতী তো দূরের কথা একটি গাড়ীও রাখিতে পারেন না, তাঁহার বাড়ীতে যে সব আসবাবপত্র দেখা যায়, তদপেক্ষা বেশী কিছু সেখানে ছিল না।

মহিলাদের কথা

মহিলারা অন্দরেই থাকিতেন, তাঁহারা পর্দ্দানশীন বা অসূর্য্যম্পশ্যা ছিলেন। রেল ষ্টেশনে গেলে তাঁহাদের পর্দ্দার আড়ালে রাখা হইত, ষ্টীমারে যাইতে হইলে তাঁহাদিগকে পাল্কীতে ঘাটে পৌছাইয়া দিতে হইত; এমন কি

রাজবাটীতে এই বিবাহ হয়, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজকে রাজা বাহাদুরের সমমর্য্যাদাসম্পন্ন মনে করিতেন না। সমান মর্য্যদাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে বর ক'নের বাড়ীতে বিবাহ করিতে যায়, ক'নে বরের বাড়ীতে যায় না (বিবাদী পক্ষের ১২০নং সাক্ষী শরদিন্দুবাবুর সাক্ষ্যে)।

এই বিবাহের পূর্ব্বে ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পর 'রাজবিলাসে'র নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল উহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, এমন সময় রাজা পীড়িত হইয়া ঢাকা যান এবং তথায় নলগোলা রাজবাড়ীতে ১৯০১ সালের ২৬শে এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয় তাঁহার শব স্পেশ্যাল ট্রেণে জয়দেবপুরে লইয়া গিয়া চিলাই নদীর তীরে শ্মশানবাড়ীতে দাহ করা হয়।

রাজার মৃত্যুর পর রাণী বিলাসমণি পুত্রগণের অছিস্বরূপ জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তখন বড়কুমারের বয়স ১৮ বৎসর ৭ মাস ৭ দিন, মেজকুমারের বয়স ১৬ বৎসর ৮ মাস ২১ দিন এবং ছোট কুমারের বয়স ১৪ বৎসর ৮ মাস ১৪ দিন ছিল। অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই তখন প্রায় বালক ছিলেন। ১৯১০ সালে ২৮ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বড়কুমার মারা যান। এই মামলা সম্পর্কে যে সকল বিষয়ের বিচার করিতে হইবে তাহাতে কুমারদের বয়সের কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র "বড়কুমার", সুতরাং কর্ত্তা ছিলেন ; কিন্তু তাই বলিয়াই তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর ছিল না!

রাজার মৃত্যুর পূর্ব্বে কুমারদের দুইজন গৃহ শিক্ষক ছিল, কুমারদিগকে শিক্ষা দানই তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। কুমারেরা যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা বাড়ীতেই লাভ করিয়াছিলেন ; তবে মধ্যে এক বৎসরের কম সময় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে গিয়াছিলেন ; কিন্তু এই বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত নহে, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, গৃহ শিক্ষকের নিকট কুমারেরা যে শিক্ষা পাইতেছিলেন তাহা রাজার মৃত্যুর পরে অথবা বড়কুমারের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছিল, যদিও বাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় অনুরূপ প্রমাণের যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল বিবাদী পক্ষের ৯২নং সাক্ষী ফণীবাবুও এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং বাদী পক্ষের সাক্ষী কুমারদের ভাগিনেয় বিল্লুর সাক্ষ্য বিচার করিলে দেখা দেখা যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুমারের সম্বন্ধে উভয় পক্ষই এই কথা মানিয়া লইয়াছে। অবশ্য বিল্লু বলিয়াছেন, বড়কুমার ১৩০৭ সালের কিছু পূর্ব্ব হইতে আর গৃহশিক্ষকদের নিকট পড়িতেন না।

গৃহশিক্ষকদের নাম দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায় ও অনুকূলবাবু কুমারদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টার ফলাফল বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বাদী বলেন, তিনি এবং তৃতীয় কুমার ইংরাজী ও বাঙ্গালা

বর্ণমালা এবং সামান্য বানান ছাড়া আর কিছুই শিখেন নাই এবং সেই বিদ্যার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত একমাত্র নিজ নাম স্বাক্ষর করা ছাড়া আর সবই তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বাদী সম্পর্কে বলা যায় যে, শুনানীর সময়ও দেখা গিয়াছে, তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিতে যেসব ইংরেজী অক্ষর লাগে, অবশ্য তিনি কুমার হইলে,—একমাত্র 'N' ছাড়া আর কোন অক্ষর তাঁহার মনে নাই ; কিন্তু এবিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। Sunday

কমিশনে যখন মিঃ এস ঘোষাল ব্যারিষ্টারের সাক্ষ্য লওয়া হয় তখন তিনি বাদীর সহিত কুমারের সাদৃশ্য সম্পর্কে শপথ করেন। সেই সময় সুবিজ্ঞ কৌঁসুলী বিবাদী পক্ষের বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছিলেন। মিঃ ঘোষাল তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, গত ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে কলিকাতায় কুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় তিনি কুমারের কথাবার্ত্তায় ও আচারব্যবহারে কুমারকে তাঁহার নিজের মতই একজন বলিয়া দেখিতে পান। মিঃ চৌধুরী কথাটা ঠিক এইরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন :— "আপনি তাঁহাকে একজন সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত বাঙ্গালী যুবক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন কি ?" মামলার শুনানী চলিবার সময় ক্রমে ক্রমে এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি খাটো করা হইয়াছিল। কুমারের বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে আমি যখন আলোচনা করিব, তখন ইহা দেখা যাইবে। বর্ণজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয় তাই বর্ত্তমান কাহিনীর মধ্যস্থলে তাহার আলোচনা না করিয়া পৃথকভাবে এক স্থলে এই বিষয়টির আলোচনা করাই আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তবে বিবাদী পক্ষ আগাগোড়াই ইহা বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় কুমার ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন এবং তিনি ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তাও চালাইতেন যদি কুমার তাহা করিতে পারিতেন এবং যদি তাঁহার বর্ণজ্ঞান এতটা অগ্রসর হইয়া থাকিত যে, সেই অবস্থা হইতে আর তাঁহার নিরক্ষর হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা হইলে এই মামলার বাদী কুমার হইতে পারেন না, পক্ষান্তরে যদি তিনি ইংরাজী না জানিতেন এবং ইংরাজী না জানা সত্ত্বেও জেরার সময়ে কোন কোন ইংরাজী শব্দ শিখিয়া লইতে পারেন বলিয়া অনুমান করা না যাইত, তাহা হইলে তিনিই স্বয়ংই কুমার বলিয়া ধরিলে তিনি নিশ্চয়ই জেরায় সমস্ত প্রশ্ন এড়াইয়া যাইতেন।

এস্থলে এটুকুই বলা যথেষ্ট যে, যেটুকু শিক্ষা কুমারেরা পাইতেছিলেন তাহাও ১৩০৭ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে তাঁহাদের পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত অপর শিক্ষক মিঃ হোয়ারটন যদি কুমারদের জন্য কিছুই করিয়া থাকিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের

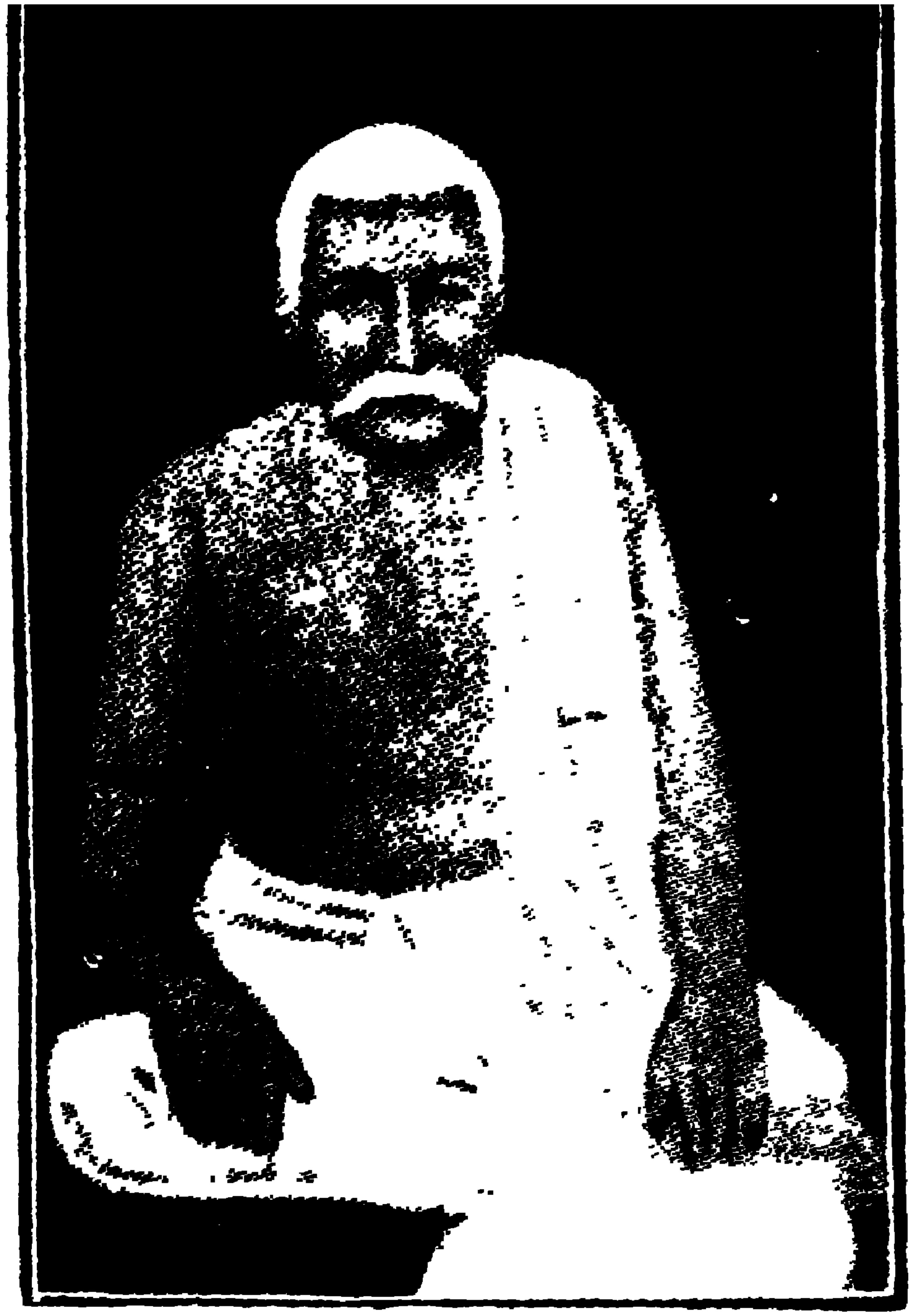

রাজা কালীনারায়ণ—বাদীর পিতামহ

রাণী সত্যভামা—কুমারের পিতামহী

দেখিতে হইবে। তাহার পত্রগুলির মধ্যে ১-১২-০৮ তারিখে লিখিত এক একখানি পত্রে তিনি অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, তাহার ছেলে অনর্থক জয়দেবপুরে সময় নষ্ট করিয়াছিলেন,"সত্যেন্দ্র যদি এইভাবেই পড়াশুনায় অবহেলা করে তবে কিভাবে তাহার জীবিকার্জ্জনের উপায় হইবে।" (একজিবিট নং ২৯৩ (৬)।) অন্যান্য দিক হইতেও মনে হয় যে, প্রকৃত অবস্থাটা এইরূপই ছিল বিষ্ণুপদ বাঁড়ুয্যের চারিটি সন্তানই মাতুলালয়ে প্রতিপালিত তাহাদের মধ্যে ১নং বিবাদী অন্যতম। সত্যেন্দ্রবাবুই একমাত্র ছেলে, অপর তিনটিই মেয়ে, এই মেয়েদের মধ্যে মলিনার বিবাহ হয় কান্তিচন্দ্র মুখুজ্যের পুত্রের সঙ্গে, কান্তিচন্দ্র ছিলেন জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী। বিভাবতীকে ভাওয়ালের মেজকুমারের সহিত বিবাহ দেওয়া হয় এবং প্রভাবতীকে উমাকালী মুখার্জ্জির পুত্র হাইকোর্টের উকীল সুশীলের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তাহাদের মাতুলগণ উচ্চপদস্থ লোক ছিলেন এইজন্য এবং তাহাদের কৌলীন্য ও বালিকাদের সৌন্দর্য্যের জন্যই এইসব সম্পর্ক সম্ভব হইয়াছিল দ্বিতীয় বিবাদী ভাওয়াল এষ্টেটের তাহার অংশের ভার গ্রহণ সম্পর্কে আপত্তি জানাইয়া বোর্ড অব রেভিনিউর নিকট যে একখানি দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজেকে উত্তরপাড়ার মুখার্জ্জি বংশের লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা এষ্টেট পরিচালনা সম্পর্কে তাঁহার যোগ্যতার অন্যতম কারণ বলিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি ঐ দরখাস্তে তাঁহার পিতার কথা উল্লেখ করেন নাই।

মেজরাণীর তিন মাতুলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মাতুল প্রতাপনারায়ণ বিভাবতীর বিবাহ উপলক্ষে বিভাবতীকে সঙ্গেই জয়দেবপুর আসেন। প্রতাপ নারায়ণের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী এবং বিভাবতীর ভ্রাতা সত্যবাবুও আসিয়াছিলেন। সত্যবাবু ঐ সময় ছাত্র ছিলেন। বিবাহ হইয়া গেলে কন্যাপক্ষ সকলেই চলিয়া যায়; কিন্তু বিভাবতী দেবী থাকেন। ১৯০২ সালের মে মাসে মিঃ সুরেন্দ্র মতি লাল ম্যানেজার ছিলেন ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাণী (মেজরাণীর শাশুড়ী) ঐ সময় জীবিতা ছিলেন এবং তিনিই গৃহকর্ত্রী ছিলেন। কিন্তু পূরাপূরী ভাবে নহে; কারণ ঐ সময় রাণী সত্যভামা দেবী (রাণী বিলাসমণির শাশুড়ী) ও জয়মণি দেবীও জীবিত ছিলেন।

বিবাহের প্রায় একমাস পর মেজরাণী, বড় কুমার, রাণী সত্যভামা এবং জয়মণি ও কৃপাময়ীর সঙ্গে কলিকাতা যান। তথা হইতে তিনি তাঁহার মা'র নিকট উত্তরপাড়া যান এবং তথায় প্রায় তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি জয়দেবপুর আসার পথে এক সপ্তাহকাল কলিকাতা

থাকিয়া, পরে জয়দেবপুর ফিরেন। তাহা ৭ই শ্রাবণ হইবে—মেজরাণীর উক্তিতেই তাহা দেখা যায়।

চিঠি-পত্র

১৯০২ সালের ১০ই আগষ্ট মেজকুমার তাঁহাকে বাঙ্গালা একখানি চিঠি লিখেন বলিয়া বলা হইয়াছে। বিভাবতী দেবীর উক্তিতে দেখা যায়, মেজকুমার তাঁহাকে মোট ৯খানি চিঠি লিখিয়াছেন, অবশ্য প্রভাবতীর নিকট যে চিঠি লেখা হইয়াছে সেইখানা বাদে এবং ইহা (ঐ বাঙ্গালা চিঠি) তাহার মধ্যে অন্যতম। মেজকুমারেব বর্ণজ্ঞান যে মোটেই ছিল না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বাদীপক্ষে বলা হইয়াছে যে, প্রতারণার উদ্দেশ্যে ঐসব চিঠি জাল করা হইয়াছে। কুমারের বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার সময় ইহার উল্লেখ করা হইবে।

জয়দেবপুর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথম বিবাদীনী, যাঁহাকে আমি দ্বিতীয় রাণী বলিয়া অভিহিত করিতে ইচ্ছা করি, বাঙ্গলা ১৩১১ সনের (১৯০৪ সালের অক্টোবর) আশ্বিন মাস পর্যান্ত জয়দেবপুরই অবস্থান করেন ঐসময় কয়েকটি ঘটনা ঘটে। ১৯০২ সালের নবেম্বর মাসে মিঃ মেয়ার, (যিনি বিবাদী পক্ষে কমিশনে জবানবন্দী দিয়াছেন) ম্যানেজার নিযুক্ত হন একজিবিট ২৮৩)। ১৩০৯ সনের আশ্বিন মাসে (সেপ্টেম্বর অক্টোবর) বড়কুমারের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তিনমাস বয়সেই তাহার মৃত্যু হয় ১৩০৯ সনের পৌষ মাসে (১৯০২ সালের ডিসেম্বর) মেজরাণীর মাতা শিশু-সন্তানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একখানি চিঠি লিখেন, এই শিশু জকি বলিয়া পরিচিত ছিল এবং জয়দেবপুরে তাহার নামানুসারে জকি প্রাইমারী স্কুল নামে একটি স্কুল আছে।

১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে বড়কুমার দিল্লী দরবারে যোগদান করেন। মিঃ মেয়ার বলিয়াছেন যে, ইহার পর তাঁহাকে (বড়কুমারকে) রাজা, করিবার কথা হয়।

১৩১০ সনের ১০ই মাঘ (১৯০৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী) একই তারিখে ছোট কুমার ও কনিষ্ঠা ভগ্নি তড়িন্ময়ীর (ডাকনাম মটর) বিবাহ হয়। ছোট কুমারের সহিত ৪র্থ বিবাদিনী আনন্দকুমারীর বিবাহ হয়। আনন্দকুমারীর বয়স তখন ১৩ বৎসরের কিছু বেশী ছিল এবং ঢাকা জিলায় হারিয়া নামক কোন গ্রামের এক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিন রাণীর মধ্যে আনন্দকুমারীই ঢাকা জিলার মেয়ে। অপর দুইজনের মধ্যে একজন কলিকাতার এবং আর একজনকেও কলিকাতার মেয়েই বলা যাইতে পারে; কারণ

উত্তরপাড়া কলিকাতা হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। বাবু ব্রজলাল ব্যানার্জ্জির সহিত মটরের বিবাহ হয়, বর্ত্তমান সময়ে তিনি ঢাকার উকীল। ব্রজলাল বাবু আধা-ঘরজামাই ছিলেন, কারণ তিনি প্রায়ই শ্বশুরবাড়ী থাকিতেন না। যদিও পরে তাঁহার স্ত্রী মটর ঢাকা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। ১৩১০ সালের ১০ই ফাল্গুন ইন্দুময়ীর কন্যা মণিকে সাগরের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

সুতরাং ১৯০৪ সালের প্রথমভাগে রাজপরিবারে তিন কুমার। তাঁহাদের তিন ভগ্নী, ছেলে মেয়ে এবং দুই জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর দুই স্বামী। ঠাকুরমা রাণী সত্যভামা, জয়মণি ও রাজার ভগ্নী কৃপাময়ী এবং তাঁহার স্বামী বিলাসবাবু প্রভৃতি ছিলেন। বিলাসবাবুর বাড়ী ফরিদপুর জিলায়, তাঁহার আর একটী স্ত্রী ছিল এবং তাঁহার গর্ভজাত পুত্র কন্যাও ছিল তাঁহার পুত্র কন্যার মধ্যে দুইজন বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। আমি যখন সাক্ষ্যপ্রমাণাদি আলোচনা করিব তখন এই সব বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইবে। কৃপাময়ী দেবীর কোন সন্তান ছিল না। রাজার মৃত্যুর পর রাজবাড়ীতে দুইটি জিনিষ সংযোজিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কুমার চটানের দক্ষিণ দিকে একটি নূতন আস্তাবল প্রতিষ্ঠা করেন। আমি বলিয়াছি যে, ইহার ফলে পিলখানা অনেকটা নিকটে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। দ্বিতীয়, কুমার একটি চিড়িয়াখানা স্থাপন করেন এই চিড়িয়াখানায় দুইটি বাঘ, দুইটি চিতা বাঘ এবং অন্যান্য একদল পশু ছিল। এইগুলির মধ্যে একটি সাদা রংএর শিয়াল, যাহার কথা বাদী উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ শিয়াল সম্বন্ধে এই মামলায় আলোচনা হওয়াতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় কুমারকে চিড়িয়াখানায় দেখিয়াছে, তাহাকে অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই, ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে কারণ এই লোকটি উপরোক্ত সাদা শিয়ালটিকেও দেখিয়াছিল। বিবাদী পক্ষের একজন সাক্ষীও (বিবাদী পক্ষের সাক্ষী নং ২৬৭) এই পশুটিকে (সাদা শিয়াল) দেখিয়াছে।

১৯০৪ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কিছু করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯০৪ সালের ১৫ই জুন তারিখে মিঃ মেয়ার ঢাকার কালেক্টরের নিকটে এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন (একজিবিট ২৮৪)। এই রিপোর্টে কুমারদের জননী রাণীর খাস কর্ম্মচারী মিঃ মেয়ার ষ্টেট পরিচালনে তাঁহার মনিব হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া অভিযোগ করেন; রাণী অর্থের অপব্যয় করিতেছেন এবং ষ্টেটের পক্ষে ক্ষতিকর অনেক কার্য্য করিতেছেন বলিয়াও ঐ অভিযোগে বর্ণনা করেন। বড়কুমারের প্রশংসা করায় বড়কুমারও এ বিষয়ে তাঁহার অভিযোগ সমর্থন করিতেছেন বলিয়া মিঃ মেয়ার কালেক্টরকে জানান; কিন্তু তিনি ঐ অভিযোগে ছোট দুই কুমারের যে চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা

নালিশের আর্জ্জিতে বলা হয়,—কোর্ট অব ওয়ার্ডস যেভাবে সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে চান যে, সম্পত্তিতে বাদিনী রাণীর কোনও বিষয় স্বত্ব দখল নাই সুতরাং কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট হইতে বাদিনীকে সম্পত্তি দখল দেওয়া হউক; এই মামলা দায়ের হইবার পর, ১৯০৫ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস সম্পত্তি ছাড়িয়া দেন। বাদীর ৯৭৭ নং সাক্ষী সাগরবাবুর সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়, ঐ বড়কুমার মট লেনের এক বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তখন বড় কুমারের স্ত্রী এবং পরিবারের অপরাপর সকলে ৩নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীতেই থাকিতেন।

রাজ-পরিবারের লোকদিগের কলিকাতা ত্যাগ

মধ্যম কুমার এই সময়ে কিরূপভাবে গতিবিধি করিতেন, কিরূপ লোকজনের সহিত মেলামেশা করিতেন, কিরূপ খেয়ালে চলিতেন এবং কোন সময় কিভাবে কি করিতেন, তৎসংক্রান্ত সাক্ষ্যের আলোচনা পরে করা যাইবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ২৩।৩।১৯০৫ তারিখের পূর্ব্বেই বড়কুমার এবং রাজপরিবারের অন্যান্য সকলে জয়দেবপুরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ১৩।৩।১৯০৫ তারিখে বড়কুমার কর্ত্তৃক লিখিত পত্র (একজিবিট ৩৩৫) হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু মধ্যমকুমার যে অন্যান্য সকলের সহিত ঐ সময় জয়দেবপুরে ফিরেন নাই, তিনি যে সকলে চলিয়া আসিবার পরও কয়েক দিন কলিকাতায় ছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় কারণ, রাজপরিবারের সকলে চলিয়া আসার পর মেজকুমার কয়েকদিন কলিকাতায় থাকা কালে যে সম্পন্ন হয়, এই মামলায় তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং মামলা সম্পর্কে তাহার যোগ্যতা অপরিসীম।

মধ্যম রাজ কুমারের জীবন বীমার কথা

১৯০৫ সালের ২৫শে মার্চ্চ মধ্যমকুমার এক বীমার কাগজ স্বাক্ষর করেন। ১৯০৫ সালের ২রা এপ্রিল, হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডাক্তার মিঃ আর্ণল্ড কে ডি মধ্যমকুমারকে পরীক্ষা করেন। সেই ডাক্তারী রিপোর্টে সচরাচর যেমন হইয়া থাকে রাজপরিবার সংক্রান্ত কতকগুলি বিবরণ বিস্তৃতভাবে লেখা হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্টে কুমারের জন্মের তারিখ এবং অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং শরীরের মধ্যকার কতকগুলি চিহ্নের উল্লেখ ছিল। এখন দেখিতে হইবে, বাদীর শরীরে চিহ্নের সহিত ঐ সকল চিহ্নের মিল আছে কি না এবং ঐ সকল চিহ্ন

বাড়ী সাজান হইয়াছিল। (বিবাদীপক্ষের ৩২৬নং সাক্ষী গৌরচন্দ্র মজুমদারের সাক্ষ্য।)

সর্ব্বপ্রকারে বিচার করিয়া দেখা যায়, কুমারগণ অথবা দ্বিতীয় কুমার ১৯০৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতায় ছিলেন, প্রকাশ, ঐ দিন তিনি একখানি চিঠি স্বাক্ষর করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। (বিবাদীপক্ষ কর্ত্তৃক দাখিলী ৪৭০নং একজিবিট) কুমারগণ কোন সময় জয়দেবপুরে ফিরিয়া যান, সে তারিখ সঠিক নির্দ্ধারণ করা কঠিন। ২৫।১২।১৯০৬ তারিখে দেখা যায়, রাজপরিবারের কয়েকজন কলিকাতায় আছেন। রাণীর নিকট ইন্দুময়ী দেবী কর্ত্তৃক ১৫ই পৌষ অর্থাৎ ৩০-১২ ১৯০৬ তারিখে লিখিত পত্র (একজিবিট ২৩৬) হইতে বুঝা যায়, কুমারের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ইন্দুময়ী, দ্বিতীয়া রাণী, বড়কুমার এবং তাঁহাদের সঙ্গেরপ্রায় ৬৫ জন লোক ঐ দিন ভাওয়ালে, পৌছিয়াছেন। অন্যান্য প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, ঐ বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেস ও শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল। রাজপরিবার ঐ সময় কলিকাতায় আসিয়া মিঃ এ, এম, বসুর ১৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ছিলেন, সাক্ষ্য প্রমাণে তাহা পাওয়া যায়। তখন রাণী বিভাবতী রক্তশূন্যতায় ভুগিতেছিলেন বলিয়া ঐ সময় তাঁহারা কলিকাতায় আসেন। অনেকে রাণীর রক্ত দূষিত হইয়াছে বলিয়াও অনুমান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়া রাণীর তাহার কলিকাতা পরিদর্শনের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে রাণীর মাতা কর্ত্তৃক লিখিত তিনখানি পত্র আছে। একজিবিট (৩০২, ৩০৪, ৩০৫) ঐ তিনখানি পত্র হইতে জানা যায়, ১৯০৭ সালের ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্তও রাণী বিলাসমণি কলিকাতায় পৌছেন নাই। ঐদিন দ্বিতীয় কুমারের কলিকাতায় আসার কথা ছিল ; কিন্তু তিনিও পৌছেন নাই। তিনি ঐদিনের পরে কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাণী বিলাসমণি মধ্যম কুমারের সহিত ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা পৌছেন, কিন্তু এই বিষয়টী আমার পূর্ব্বোল্লিখিত নয়খানি পত্রের সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলেই দেখা যায়, রাণী বিলাসমণি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কেবল তিনি নহেন ; অন্যান্য মহিলাগণ এবং আত্মীয় স্বজন, ১৯০৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

রাণী বিলাসমণি দেবীর লোকান্তর প্রাপ্তি

১৯শে জানুয়ারী রাণী বিলাসমণি কলেরায় আক্রান্ত হন। ২১শে জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মধ্যম রাণীর এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্য হইতে এই

এই সকল বিষয় একটু পরেই বর্ণনা করিতেছি। তখন তিনি গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতেন, শিকারে যাইতেন, ঢাকা আসিতেন, এবং এই বৎসরই তিনি নবাব সলিমুল্লার সঙ্গে ১০০০৲ টাকার বাজীতে টমটম চালাইয়া ঐ বাজী জিতেন (বাদী পক্ষের ৬৭৬ ও ৮১৩নং সাক্ষীর সাক্ষ্য)। বিবাদী পক্ষও এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছেন যে, মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও অপরিচিত লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্যবান লোক বলিয়া মনে করিত। ১৯০৮ সালে কতকগুলি ব্যাপার ঘটিতে থাকে; কিন্তু ঐ সকল ঘটনা, এবং উহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি সম্যক বুঝিবার নিমিত্ত রাজপরিবারের ও কুমারদের তাৎকালিক অবস্থা এবং তাঁহাদের চালচলন কাজকর্ম্ম এবং নৈতিক চরিত্র বর্ণনা করিব।

এই সময় রাজপরিবারে ছিলেন তিন কুমার ও তাঁহাদের পত্নীগণ, কুমারদের তিন ভগিনী, প্রথম তুই ভগিনীর সন্তানগণ এবং কুমারদের পিতামহী রাণী সত্যভামা দেবী। আর ছিলেন কুমারদের পিসীমাতা কৃপাময়ী দেবী, তিনি তাঁহার স্বামী সহ কুমারদের আবালস্থলের পার্শ্ববর্ত্তী অংশে থাকিতেন; তখন রাজকুমারীদের সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। বড় কুমারী ইন্দুময়ীর স্বামী গোবিন্দবাবু রাজবাড়ীতেই থাকিতেন; তিনি এম-এ, বি, এল ছিলেন। কিন্তু নির্জ্জনে থাকিতেন, কাহারও সঙ্গে মেলামিশা করিতেন না। রাজবিলাসের দোতলায় ছিল অন্দরমহল; তথায় রাজপরিবারের মহিলারা থাকিতেন ও শয়ন করিতেন। পর্দ্দাপ্রথা এমন কঠোর ছিল যে, নেহাৎ ছোট ছেলে না হইলে চাকরবাকরেরাও উপর তলায় যাইতে পারিত না। অবশ্য কুমারেরাই ছিলেন মালিক; কিন্তু অন্দরমহলের কর্ত্রী ছিলেন, কুমারদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দুময়ী দেবী, (যেমন রাণী বিলাসমণি তাঁহার পূর্ব্বে অন্দর মহলের কর্ত্রী ছিলেন)। ছোটরাণীর কোনও কোনও পত্র হইতে দেখা যায়। ইন্দুময়ীকে তাঁহারা শাশুড়ীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন (একজিবিট ৩২০ ও ৩২৯) ১৯০৯ সালেও ছোটরাণী ঢাকা হইতে ইন্দুময়ীকে চিঠি লেখার অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বাড়ী নেওয়া হউক। (একজিবিট ৩২৭) সমস্ত নজর মহিলাদিগকে দেওয়ার নিয়ম ছিল। ইন্দুময়ী উহা রাখিতেন (একজিবিট ৩৩৭)। তাঁহার নিকট আমানতখানার চাবি থাকিত, আমানতখানা অন্দরের একটি ঘর, তথায় মূল্যবান্ দ্রব্যাদি রাখা হইত। বৌ'দের অলঙ্কারাদি তিনিই তৈয়ার করাইতেন এবং উহার ব্যয় এষ্টেট হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেন। (একজিবিট ৩২৪)। কুমারেরা ভগিনীদিগকে ভালবাসিতেন বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। (একজিবিট ৬৯ ও ৭১—বড় কুমারের পত্র); সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে বুঝা যায়, ইন্দুময়ীই অন্দরের

কর্ত্রী ছিলেন ; মেজো রাণীর সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, উহার কোনও উক্তি দ্বারা এই বিষয়ক সাক্ষ্যের বিন্দুমাত্রও ইতরবিশেষ হয় নাই।

রাজকুমারদের স্বভাবচরিত্রের কথা

বিবাদীপক্ষের সাক্ষী মিঃ মায়ার যাহাকে বলেন "উচ্ছৃঙ্খল জীবন", প্রত্যেক কুমার তদ্রূপ জীবনযাপন করিতেন। ১৯০৪ সালে যখন মিঃ মায়ার তাঁহার মনিব রাণী বিলাসমণির বিরুদ্ধে কালেক্টরের নিকট নালিশ করিয়াছিলেন, তখন বড়কুমারকে ভাল লোক বলিয়া মেজকুমার ও ছোটকুমারের সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আপনি নিজেই জানেন মেজকুমার ও ছোটকুমারের সঙ্গে কিছু করা অসম্ভব। তাঁহারা সর্ব্বদা নীচ সংসর্গে থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গীরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার দুষ্কার্য্য করিতে প্ররোচনা দেয়। মিঃ মায়ার বলেন, মেজ ও ছোটকুমারদের দ্বারা বিষয়কার্য্য করান সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাঁহারা লেখাপড়া প্রায় একটুও শিখেন নাই। মিঃ মায়ার ১৯০২ সালের নবেম্বর হইতে ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—বড়কুমার অত্যন্ত মদ্যপান করিতেন এবং বেশ্যাসক্ত ছিলেন। বড়কুমার নিশ্চয়ই খুব কম বয়সে ঐ সকল কুক্রিয়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন, এজন্য বড়কুমার আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। সুতরাং উইল করা আবশ্যক মনে করিয়া মিঃ মায়ার ১৯০২ সালে কলিকাতায় তাঁহাকে পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। মিঃ মায়ার বলেন, মেজকুমার ও ছোটকুমার ঠিক বড়কুমারের মতই মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত ছিলেন—যদিও এই মামলায় স্বীকার করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের দুইজনের কেহই সুরাপান করিতেন না। সকলেই স্বীকার করেন, তাঁহাদের চরিত্র খারাপ ছিল, এবং উপদংশ হইতে মেজকুমারের চরিত্র যত খারাপ ছিল বলিয়া মনে হয়, তাঁহার চরিত্র তাহা অপেক্ষাও খারাপ ছিল। ম্যানেজার রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ রাজার মৃত্যুর পরও জয়দেবপুরে ছিলেন। তাঁহার পুত্র রায়বাহাদুর সারদাপ্রসন্ন ঘোষ বলেন, পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে মেজকুমার কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার পর তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন। পিতৃবিয়োগের সময় তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরেরও কম ছিল, তখনই তাঁহার চরিত্র খারাপ হয়। কুমারের মামা কেদারেশ্বর (বাদী পক্ষের সাক্ষী) বলেন ১৯০২ সালে বিবাহের পরও মেজকুমারের চরিত্র খারাপই ছিল। ১৯০২ সালের মে মাসে মেজকুমারের বিবাহ হয়। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে রাজবাড়ীর একটি ঘরেই তিনি

পক্ষে এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নাই এবং এই সকল সাক্ষ্যে এমন কিছু অসঙ্গতিও নাই যে, ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইতে পারে। মিঃ মায়ার যে 'স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত' কথা বারবার ব্যবহার করিয়াছেন এব' ঢাকার তৎকালিক কালেক্টর মিঃ রেক্সিন যে তাঁহাদিগকে 'উচ্ছৃঙ্খল' বলিয়াছেন, উহা হইতেই ঐ দুইটি ঐ উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। ঢাকার অন্যতম সিনিয়র উকিল রেবতীবাবু বলিয়াছেন, মেজকুমারের চরিত্র "জঘন্য" ছিল।

নিজ গৃহে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

তাঁহাদের চরিত্র ছিল এই,—গৃহে তাঁহারা কিরূপ দৈনন্দিন জীবন-যাপন করিতেন, সাক্ষ্যে তাহাও সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। মহিলারা উপরতলায় অন্দরে থাকিতেন। কুমারেরা তাঁহাদের বৈঠকখানায় থাকিতেন। রাজবিলাসের নীচের তলায় সকলের পূর্ব্বদিকে মেজকুমারের বৈঠকখানা ছিল। উহার পিছনে একটি শয়নকক্ষ ছিল। উহার পিছনে একটি বারান্দা—মেজকুমার সাধারণত' তথায় আহার করিতেন। উহার উত্তরদিকে ছিল তাঁহার বাথরুম। তথায় ছিল দুইটি শৌচাগার, এবং একটি জলের কল, ছোট কুমারের বৈঠকখানা ছিল রাজবিলাসের নীচের তলায় সকলের পশ্চিম দিকের ঘর, উহার উত্তরের দিকের ঘরে ছোট কুমার আহার করিতেন। উহার উত্তরের দিকের ঘরে তাঁহাব শুইবার ঘর ছিল এবং ঐ শয়নকক্ষের পিছনে ছিল বাথরুম। বিল্লু ও সাগর সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে এই বর্ণনা দিয়াছেন। (উভয়েই বাদীপক্ষের সাক্ষী) বিল্লুকুমারের ভাগিনেয়; কুমারেরা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই বিল্লু রাজ বাড়ীতে ছিলেন এবং ১৯০৩ সালে বিবাহের পর হইতে সাগরও জয়দেবপুরে গিয়া রাজবাড়ীতে বাস করিতেন এই বর্ণনার কোনও বিষয় বিবাদীপক্ষ অস্বীকার করেন নাই। তবে তাঁহারা বলিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ণিত ঐ শয়নকক্ষ বাস্তবিক শয়নকক্ষ ছিল। কুমারেরা রাত্রিতে তথায় শুইতেন, উহা বিশ্রামাগার ছিল, বিবাদীপক্ষ আরও বলিয়াছেন, মেজকুমারের বাথরুম যেখানে ছিল বলিয়া বিল্লু ও সাগর বলিয়াছেন, উহা তথায় ছিল না, মেজরাণী বলিয়াছেন, রাজ বিলাসের উপরের তলায় প্রত্যেক রাণীর শয়নকক্ষ ছিল, কুমারেরা রাত্রিতে তথায় রাণীদের সহিত শয়ন করিতেন এবং দুপুর বেলায়ও তথায় নিদ্রা যাইতেন, শুধু তাঁহারা বৈঠকখানার নিকটবর্ত্তী বিশ্রাম ঘরে দিবা-নিদ্রা যাইতেন। বড়কুমারেরও ঐরূপ একটা বৈঠকখানা ছিল, বৈঠকখানার নিকট শুইবার

সত্ত্বে' একথা বলিবার কারণ এই—লুঙ্গি পরার কথা সাহেবী পোষাকের সহিত খাপ খায় না। তৃতীয় কুমার ঢিলা পায়জামা পছন্দ করিতেন এবং বড়কুমার সাধারণভাবে ধুতি পরিতেন। শুধু সাহেব অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী-দের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে তাঁহার সাহেবী পোষাক পরিতেন। এ পর্য্যন্ত কোন বিতর্ক নাই। (বিবাদী পক্ষের ৭নং সাক্ষী রাণী, বিবাদী পক্ষের ২৯০ নং সাক্ষী বীরেন্দ্র, ২১ নং সাক্ষী রুক্মিণী এবং ৪১ নং সাক্ষী পাখাওয়ালার সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)।

বিবাদী পক্ষ শুধু এই কথা বলিতে চাহিতেছেন যে, শিকারে বাহির হইবার সময় কুমার সাহেবী পোষাক পরিতেন, অথবা খাকী শিকারেব পোষাক পরিতেন। বাদী পক্ষ ইহা অস্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন যে, সব শিকারের সময়ই কুমার এইরূপ পরিতেন না, শুধু ব্যাঘ্র শিকার অথবা ঐরূপ কোন শিকারের সময় ঐ পোষাক পরিতেন। কুমার সাহেবী পোষাক অথবা বিভিন্ন পোষাক সম্পর্কে কিরূপ জ্ঞান ছিল অথবা ঐসবের নাম তিনি জানিতেন কি না তৎসম্পর্কে আমাকে আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু ব্যাঘ্র-সহ একটী ফটোতে আমি তাহাকে ধুতি পরিহিত অবস্থায় দেখিতেছি।

মেজকুমারের দৈনন্দিন অভ্যাস ও সাধারণ কাজকর্ম্ম সম্পর্কে বাদীপক্ষ যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। উহাতে একমাত্র রাণীর উক্তি ভিন্ন আর কিছুই খণ্ডন করিবার নাই।

কুমারের ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কুমারের ছেলেবেলা হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী জীবনেব যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই :—

বাল্যকালে দ্বিতীয় রাজকুমার দুর্দ্দান্ত ও একগুঁয়ে ছিল, কিন্তু বড়কুমারও ছোটকুমার সেইরূপ ছিল না। পাঁচ বৎসরের সময় তাহার হাতে খড়ি হয় এবং দ্বারকানাথ মুখার্জ্জির অধীনে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয় দুই বৎসর পর ও ঐ শিক্ষকের অধীনেই তিনি পড়াশুনা করেন। মাঝখানে আর একজন শিক্ষকও ছিলেন এবং ইহা দেখা দরকার এই সব শিক্ষকদের চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছিল। ঐ সব শিক্ষকের শিক্ষাকার্য্য যখন চলিতেছিল তখন অন্যান্য বালকদের মত সে ছাগল, পাঁতি হাস, ভেড়া, কবুতর, ইত্যাদি লইয়া খেলা করিত। ফলে ১৯০১ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সে দুইটী ব্যাঘ্র, দুইটী চিতাবাঘ, দুইটী ভল্লুক, একটী সাদা শিয়াল, একটী উটপাখী, তিনটী তিত্তিরপাখী, এবং দুইটী ওরাংওটাং সংগ্রহ

করে। ১৯০৪ সালে এষ্টেট প্রথম কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে গেলে মিঃ হাড উহা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন।

চালচলন

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে মোটর গাড়ী চালাইত, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিত, টমটম চালাইত, হস্তিপৃষ্ঠে উঠিয়া বেড়াইত, সে শিকার ভালবাসিত, ইহা উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন। ভাওয়ালে বনের অভাব ছিল না এবং যথেষ্ট শিকার মিলিত। সে প্রতিদিন অথবা প্রায়ই হস্তিপৃষ্ঠে বন্দুক লইয়া বাহির হইত এবং শূকর, হরিণ, শিয়াল, খরগোস এবং ব্যাঘ্রও শিকার করিত। সে ভাল শিকারী একথা উভয়পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে ভাল ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন, বাদীপক্ষ তাহা বলিয়াছেন।

সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে চা পান করিত এবং বিস্কুট ও রুটি খাইত। ইহার পর আস্তাবলে যাইয়া ঘোড়া, পিলখানায় যাইয়া হাতী, এবং গো-শালায় যাইয়া গরুর তত্ত্বাবধান করিত। বহু সাক্ষী কুমারকে আস্তাবলে অথবা পিলখানায় দেখিয়াছে। তাঁহাকে সাধারণতঃ ঐ সব স্থানে পাওয়া যাইত (বাদীপক্ষের ১৮, ২৯, ২, ৩, ৮, ৫৭৩, ৯৫৯নং সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) এই সম্পর্কে সমস্ত সাক্ষীর তালিকা দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ কেহ ইহা অস্বীকার করেন নাই এবং আশুতোষ ডাক্তারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষের ৬১নং সাক্ষী মাহুত আমানুল্লা স্বীকার করিয়াছে যে, সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোক কুমারের সঙ্গী ছিল না। মেজকুমার প্রাতঃকালে পিলখানায় আসিতেন এবং মাহুত হাতীর প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের আদেশ আনিতে যাইত, অথবা কোন হাতীর অসুখ হইলে তাহা তাহাকে বলিতে যাইত।

যদি দ্বিতীয় কুমার পিলখানা, অশ্বশালা ও বাথান প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, যদি ২০টী হাতীর মাহুত, ৪০টি ঘোড়ার সহিস, কোচ্ম্যান, যতদিন চিড়িয়াখানা ছিল ততদিন চিড়িয়াখানার কর্ম্মচারীবৃন্দ আদেশ লইবার জন্য কুমারের নিকট আসিতেছিল, তাহা হইলে কুমার নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন, এই প্রমাণের মধ্যে সত্য আছে বলিতে হইবে। এই সমস্ত লোককে কুমারের সঙ্গী বলা যাক কিম্বা না যাক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

এই সমস্ত লোককে বাদ দিলে স্বাভাবিক সঙ্গী কাহারা ছিল? নিম্নস্তরের একদল যুবক, যাহারা নিজেদিগকে কুমারের কেরাণী বলিয়া

রাত্রিযাপন—সমস্তই বাহিরে চলিতেছিল। কুপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট মোসাহেব-শ্রেণীর একদল লোক সর্ব্বদা তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকিত, বহু চাকর তাহাদের ফরমাইসে খাটিত; যেমন খুসী আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রচুর অর্থ তাঁহাদিগকে দেওয়া হইত। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে জেরা করিবার সময় মিঃ চৌধুরী বলেন,—১৯০৯ সালে কুমারগণ তাহাদের পরিবারের জন্য ৮০ হাজার টাকার গহনাপত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। সত্য সত্যই গহনাপত্র ক্রয় করা হইয়াছিল; তবে এই গহনা ক্রয়ের ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত একটা মামলায় ডিক্রি হইয়াছিল। এই গহনা কিন্তু কুমারদের পত্নীগণ পান নাই। রাণী নিজেই একথা বলিলেন। গহনা যদি রাণীদের জন্যই হইত, তাহা হইলে বড়রাণী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা লিখিত হইত না, এবং বিবাদিগণ স্বয়ং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালিকাদের কথা উত্থাপন করিতেন না। এই বালিকাদের জন্য ৭০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এরূপ বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এমন কোন প্রমাণই নাই যাহাতে বলা যায় যে, দ্বিতীয় কুমার কখনও তাঁহার স্ত্রীকে কোন কিছু উপহার দিয়াছেন; সর্ব্বোপরি দ্বিতীয় কুমারের উপদংশ রোগ হইল; এই রোগ সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল, এবং কুমারের দুষ্ট ক্ষত উৎপন্ন হইল। সন্তানহীনা এই ভদ্র মহিলার (মেজরাণীর) অল্পকাল স্থায়ী বিবাহিত জীবনের মধ্যে আমি এমন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, যাহার কথা স্মরণ করিয়া তিনি সুখ অনুভব করিতে পারেন। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিবার পর হইতে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার সময় পর্য্যন্ত আমি কোন দিক দিয়াই এমন কোন কিছু দেখিতে পাইতেছি না, যাহার সংসর্গ অথবা স্মৃতি তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর গৃহের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারে।

তিনি তাঁহার বিবাহিত জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। যে সমস্ত তথ্য কাহারও বিশ্বাস-প্রবণতার উপর নির্ভর করে না, এমন কি তাঁহার ভগিনীর পত্রে প্রদত্ত মর্ম্মস্পর্শী উপদেশাবলীরও অপেক্ষা রাখে না, সেই সমস্ত তথ্য দ্বারাই এই চিত্র অপসারিত হইয়াছে। ১৯১১ সালে তিনি যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিজেই কুমারদের অপরিমিত অভ্যাস ও অমিতব্যয়িতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে,তাহাদের প্রত্যেকের আয় এক লক্ষ টাকা হইলেও অমিতব্যয়িতার ফলে ভাওয়াল এষ্টেট ক্রমশঃ ঋণগ্রস্ত হইতেছে।

কুমারদের অভ্যাস ও নৈতিক চরিত্র ছাড়াও তাঁহাদের আচরণ এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বহু প্রমাণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় কুমার ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলা-

করিতেন এবং তাহাদের এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন।' এই ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকের সহিত দ্বিতীয় কুমারের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাদের পরিবার মধ্যে পরস্পরের যাওয়া আসাও চলিত। বয়সের পার্থক্য থাকিলেও কেবল তাঁহারই সাক্ষ্যের উপর এবিষয়ে নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে এবং তাঁহার সম্পর্কে পরিজ্ঞাত অন্যান্য তথ্য হইতে ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কুমার যদি শিক্ষিত হইতেন, তিনি যদি ইংরাজী জানিতেন এবং (কমিশনে সাক্ষ্য লইবার সময় মিঃ চৌধুরী যেমন মিঃ ঘোষালকে বলিয়াছিলেন) শিক্ষিত ভদ্রলোকের ন্যায় সবলতা যদি তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ ধারণা ভুল হইত। আমি যখন কুমারের বর্ণবিষয়ক জ্ঞান ও ভাষা জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করিব, তখন আমি দেখাইব যে, সাক্ষ্য প্রমাণ—বিবাদিগণের নিজেদের সাক্ষ্যাদির উপরও নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে বিসম্বাদ করা চলে না।

মেজো কুমারকে কিপ্রকার দেখাইত

মেজোকুমারের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও অবয়ব সম্পর্কে পরে আলোচনা করিব। আপাততঃ আমি তাঁহার অবয়ব সম্পর্কে সমস্ত বিশ্লেষণ ক্ষান্ত রাখিয়া দ্বিতীয় কুমারকে কিরূপ দেখাইত, তাহাই সাধারণভাবে উল্লেখ করিব। সর্ব্বশেষে গৃহীত তাঁহার ফটো হইতেছে একজিবিট এ—১০। দার্জ্জিলিংএ যাইবার পূর্ব্বে গৃহীত। ইহাই সর্ব্বশেস ফটো, জলারপার শিকারের পর ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে এই ফটো তোলা হয়, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একজিবিট এ(২) হইতেছে এই ফটোর ঠিক আগেকার ফটো। এখন আমি কোন বর্ণনার প্রয়াস পাইব না; তবে ফটোতে যাহা দেখা যাইতেছে না এমন কয়েকটি কথা বলিতে পারি প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কুমারের দেহ সুগঠিত এবং পেশী-বহুল ছিল। বিবাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল পুলির মতে কুমারের চুল ছিল স্বর্ণাভ পিঙ্গল—একটা সুস্পষ্ট রক্তাভা বিশিষ্ট। বহু সংখ্যক সাক্ষী ইহাকে বলিয়াছেন, পিঙ্গলা অথবা বাদামী। তাহার গোঁফও এই রংএরই ছিল; তবে কিছুটা পাতলা রং বিশিষ্ট ছিল। তাহার চক্ষু ছিল কটা—অর্থাৎ সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের যে কালো চক্ষু থাকে তাহা নহে, তবে কুমারের চক্ষের সঠিক রং সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ আছে। বাদীর মতে কুমারের চক্ষু ছিল বাদামী অথবা বাদামী ধরণের; কিন্তু বিবাদী পক্ষের মতে তাহার চক্ষু ছিল নীলাভ। কুমারের গাত্র চর্ম্মের রংই সাক্ষীদিগেক সর্ব্বাধিক অভিভূত করিয়াছে। এই রংটা ঠিক

গায়ের রং কালো অথবা কৃষ্ণাভ। বড়কুমার ছিল লম্বায়, ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। মাথায় চুল ছিল না, মোটা, সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের যেরূপ চোখ থাকে সেরূপ কালো চোখ, টেরা চাহনি এবং মুখ একদিকে মোচরান। ছোট-কুমারও মোটা ছিল, কিন্তু মধ্যম কুমার অপেক্ষা খাট। ১৯০৫ ২রা ২রা এপ্রিল জীবন বীমার জন্য ডাঃ কে, ডি যে মেডিকেল রিপোর্ট লেখেন, তাহাতে দেখা যায় তখন মধ্যম কুমারের উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। বিবাদীপক্ষের ৮২নং সাক্ষী একজন গ্রামিক, তাহার সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলে যে, মধ্যমকুমার দেখিতে আমাদের দেশী লোকের (সাধারণ লোকের মত ছিল না; তাহার চেহারা ছিল 'সাহেবসুবা'র মত) এক কথায় বলিতে গেলে তাহার চেহারা,—গায়ের রং, চোখ এবং চুল—অতীব অসাধারণ ছিল এবং চেহারার এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দেখিলেই নজরে পড়ে।

গায়ের রং

বিশেষ করিয়া তাহার গায়ের রং সম্বন্ধে একজন সাক্ষী বলিয়াছে, "এমন দুধে আলতা রংয়ের মানুষ আর আমি দেখি নাই।" (বাদী পক্ষের ৫১নং সাক্ষী) কুমারকে সনাক্ত করণের পক্ষে এই সাক্ষ্য বিশেষ কোন কাজে আসে না। সে শুধু রাস্তায় কুমারকে দেখিয়াছিল; কিন্তু রাজবাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়াইয়া সে যেদিন প্রথম কুমারকে দেখিয়াছিল—সেদিনের কথাই সে বলিতেছিল।

এখানে বিচার্য্য বিষয় হইল এই যে, সে কুমারকে ভুলিয়া যায় নাই। তাহাকে একবার দেখিলে ভুলিয়া যাওয়া সহজ নয়; তাহাকে যাহারা চিনিত, তাহাদের সাম্নে কুমার বলিয়া আর একজনকে দাঁড় করানও সহজ নয়।

বাদীর জীবন-যাত্রানির্ব্বাহ প্রণালী

এই আশ্চর্য্য গায়ের রং, অস্বাভাবিক চক্ষু এবং চুল ও সুদৃঢ় মাংসপেশী বিশিষ্ট ২৩ বৎসরের এই যুবক ১৯০৮ সালে যে ভাবে জীবন যাপন করিত, তাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। তখন দেখা যায়, সে ঘোড়ায় চড়িত, শিকার করিত, মোটর চালাইত, বেশ্যাগমন করিত, তাহার প্রিয় হাতী ফুলমালায় চড়িয়া বেড়াইত, আমোদের জন্য বড়দিনের ছুটি অথবা ঐরূপ কোন বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে কলিকাতা আসিত, প্রায়ই ঢাকায় যাতায়াত করিত, মোসাহেব এবং চাকরবাকর পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিত, জলের মত টাকা খরচ করিত,

বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার একটা জুয়েলারী ফারমের লাভচাঁদ মতিচাঁদের নিকট প্রেরিত একটা তার হইতে এই তারিখ (একজিবিট জেড ১৯৫ জেড এবং ১৯৫ (২) জানা যায়। উক্ত তারে একটা বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিবার জন্য এবং ৬ই তারিখ ষ্টেশনে লোক পাঠাইবার জন্য বলা হইয়াছিল।

দুই কুমার কলিকাতায় পৌছিয়া পুলিশ হসপিটাল ষ্ট্রীটস্থ লাভচাঁদ মতিচাঁদের বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন, বিবাদীপক্ষের ৮৭নং সাক্ষী লাভচাঁদের পুত্র সৌভাগ্যচাঁদের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা দুই রাণীকে লইয়া তথায় পনর দিন ছিলেন। এই বাড়ীটী তাঁহাদের গেষ্ট্ (অতিথিশালা) হাউস ছিল। তারপর তাঁহারা ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীতে চলিয়া যান। ইহার কিছুদিন পর ছোটকুমার তাঁহার দলবল সহ আসেন এবং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন, অতঃপর বড়কুমার তাঁহার প্রকৃতির অনুকূলমত ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ ওয়াটার ওয়ার্কসের নিকট আর একটা বাড়ীতে চলিয়া যান। ইহা বাদী পক্ষের ১৩৮ নং সাক্ষী বিল্লু. ২৬২নং সাক্ষী যোগেশ রায় এবং বিবাদী পক্ষের ৮৭নং সাক্ষী সৌভাগ্য, ৩৬৫নং সাক্ষী আশু ডাক্তার, ১৪০নং সাক্ষী মেজরাণীর খানসামা বিপিন, ২১নং সাক্ষী ছোটকুমারের খানসামা রুক্মিণী এবং ৮৯নং ছোট রাণীর সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। কোন্ দলে কে গিয়াছিল, সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে তাহা সঠিক বুঝা যায় না, সকল কুমার একসঙ্গে গিয়াছে বলিয়া রুক্মিণী বলিয়াছে। কিন্তু অন্য কেহ তাহা স্বীকার করে না। ছোটরাণী বলিয়াছেন যে, তিনি প্রথম দলের সহিত গিয়াছিলেন এবং বড়রাণী ও মেজরাণী দ্বিতীয় দলের সহিত গিয়াছিলেন। তবে উক্ত পরিবার যে দুইভাগে গিয়াছিলেন, উহা ঠিকই, দ্বিতীয় দলে ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত এবং জয়দেবপুর হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ২৬২নং সাক্ষী যোগেশ রায় গিয়াছিলেন, ইহা আশু ডাক্তারও স্বীকার করিয়াছেন।

কলিকাতায় মেজোকুমারের চিকিৎসা সম্বন্ধে কথা

এইবার মেজকুমারের চিকিৎসার জন্যই তাঁহারা কলিকাতা গিয়াছিলেন। উভয়পক্ষই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, তাহার উপদংশ ইতিমধ্যেই অর্ব্বুদে পরিণত হইয়াছে। বিবাদী পক্ষ বলেন যে, পিত্তশূল রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং তৎসঙ্গে জ্বরও ছিল। তাহারা তাঁহার উপদংশ ছিল বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। বাদী পক্ষ

কলিমুদ্দি হাজি বলিয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অক্টোবর কি নবেম্বর মাসে নাগরগড়ে কুমার প্রথমবার ব্যাঘ্র শিকার করেন। সাক্ষীর এই শিকারের কথা স্মরণ আছে। সাক্ষী জোলারপাড়ের শিকারও দেখিয়াছে। এই সাক্ষী বলিয়াছে যে, জোলারপাড়ের শিকার ফাল্গুন বি চৈত্রমাসে হইবে অর্থাৎ এপ্রিল মাসের প্রথমভাগে। অপর সাক্ষিগণও ইহাই বলিয়াছে উভয় শিকারেরই ব্যাঘ্রসহ কুমারের ফটো তোলা হইয়াছে একজিবিট 'এল' নগরগড় শিকারের পর তোলা ফটো। এই ফটোতে কুমারের পরিধানে ধুতি ও পাঞ্জাবী; দ্বিতীয়বারের ফটোতে কুমারের পরিধানে পায়জামা ও পট্টি। দার্জ্জিলিংএ কুমারের মৃত্যু অথবা তথাকথিত মৃত্যুর পূর্ব্বের ইহাই শেষ ফটো। শেষবারের শিকারের সময় ঐ দলের সহিত সত্যবাবুও যে ছিলেন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু বলা হইয়াছে যে, সত্যবাবু ভীত হওয়ায় তাহাকে কোন একস্থানে রাখিয়া যাইতে হইয়াছিল। এক শিকার সম্পর্কে বহু সাক্ষ্য প্রমাণ রহিয়াছে। এই মামলা সম্পর্কে ইহার ফটোই প্রয়োজনীয়। এই শিকার এবং অন্যান্য শিকারের দ্বারা দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে কুমারের স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল তাহাই বুঝা যায়। তিনি ক্রমাগত শিকারে যাইতে ছিলেন। তিনি কাসিমপুর গিয়াছিলেন (বিবাদী পক্ষের সাক্ষী এ, পি, রায় চৌধুরীর কমিশন জবানবন্দী দ্রষ্টব্য) তিনি কোড়ডা বারুণী স্নানে গিয়াছিলেন (বিবাদী পক্ষের ৩৮নং সাক্ষী) তিনি ঢাকা আসিতেছিলেন এবং ১লা এপ্রিল তাঁহার ভাইদের সঙ্গে ৫০০০৲ টাকার একটি হ্যাণ্ডনোট পরিবর্ত্তন করিয়া দেন এবং ভাইদের সঙ্গে একত্র হইয়া ৯ই এপ্রিল ৫০ হাজার টাকা ধার করেন। (একজিবিট 'ও' হইতে 'ও' (৪) পর্য্যন্ত) ১৬ই এপ্রিল তিনি গৃহচিকিৎসক মোহিনী বাবুর বাড়ীতে আহার করেন এবং ১৭ই এপ্রিল মোহিনীবাবুর পুত্র আশুবাবুকে গোয়ালন্দে খাবার ব্যবস্থা রাখিবার জন্য ৩০৲ দিবার আদেশ দেন। ১২ই এপ্রিল দার্জ্জিলিং রওনা হইবার পূর্ব্বে বাবু দিগিন্দ্র ঘোষের বরাবরে তিনি একটী দলিল সম্পাদন করিয়া দেন। এইসব নিঃসংশয়িত ঘটনার দিকে লক্ষ্য করিলে এবং এই সম্পর্কে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, দার্জ্জিলিং রওনা হইবার সময় কুমারের কোন অসুখ ছিল না। বড়রাণী বলিয়াছিলেন যে, 'তিনি (কুমার) হাসিমুখে' চলিয়া যান কোন ব্যক্তি ফিরিয়া না আসিলে এইসব খুটিনাটি ব্যাপার মনে থাকে? কুমার প্রকৃতপক্ষে ১৮ই এপ্রিল তারিখ দার্জ্জিলিং রওনা হন।

দার্জ্জিলিং যাত্রার কথা

ফরাসখানার নিশি (বাদীপক্ষের ১৮৯নং সাক্ষী) তাঁহার বিছানা পত্র বাঁধে। জয়দেবপুর রেল ষ্টেশনে তিনি ষ্টেশনমাষ্টার আশুবাবুকে (বাদী পক্ষের ৫৯নং সাক্ষী) বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা কবেন, 'মাষ্টর, আমার গাড়ী কই ?" ষ্টেশনে বাদী পক্ষের ২২০, ৮৮১, ৯৪৯ নং সাক্ষী, ৯নং সাক্ষী যতীন, সাগর, মাস্থক, একজন রেলকর্ম্মচারী (বাদী পক্ষের ২৩১ নং সাক্ষী) এষ্টেটের মোক্তার সর্ব্বমোহন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; তাঁহারা সকলেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। যতীন্‌বাবু তাঁহার সঙ্গে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত, সাগর ও মাস্থক ঢাকা ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ট্রেণ ফতুল্লায় থামিলে ২৩১ নং সাক্ষী তাঁহাকে অভিবাদন জানাইয়া ছিলেন এবং সর্ব্বমোহন নারায়ণগঞ্জে তাঁহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জে গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টীমারে আরোহণ করেন। এই সকল সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তখন কুমারের একমাত্র উপদংশ ছাড়া আর কোনও পীড়া ছিল না। এখন বিবাদী পক্ষ এই কথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু বিবাদী পক্ষের সাক্ষী এণ্টনী মোরেল, এবং মিঃ আর, এন, ব্যানার্জ্জী কমিশনে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক সময় বিবাদী পক্ষের বক্তব্য এই ছিল যে, কুমার যখন দার্জ্জিলিং পৌছেন, তখন তিনি পীড়িত ছিলেন, এবং দার্জ্জিলিং এর পূর্ব্বাপর তিনি পীড়িত ছিলেন ; কিন্তু বিবাদী পক্ষের এই সকল সাক্ষ্যের পর বিবাদী পক্ষের ঐ উক্তি আর টিকিল না,—যতটুকু টিকিল তাহাও মাত্র এক খানা ডাক্তারী সার্টিফিকেট অবলম্বনে, তারপর বিবাদী পক্ষই সাক্ষ্য দেওয়াইলেন যে ১৩০৯ সালের ৫ই মে শেষ রাত্রিতে পীড়িত হইবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কুমার দার্জ্জিলিংএ প্রায় সুস্থই ছিলেন। কুমারকে দার্জ্জিলিংএ বাড়ীর বাহির হইতে দেখা গিয়াছিল, ইহা প্রমাণের কোনও উদ্দেশ্য ছিল, বলিয়াই যে বিবাদী পক্ষ এই সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছেন তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। কোনও কোনও সাক্ষী তাঁহার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তাঁহাকে পূর্ণ স্বাস্থ্যবান লোকের ন্যায় দেখাইয়াছিল। মৃত্যু হইয়াছিল কি না তাহা আলোচনার সময় এই বিষয়টিও আলোচনা করিব। কিন্তু সাক্ষ্যে দেখা যায় ১৮ই এপ্রিল তারিখে কুমার যখন দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন, তখন উপদংশের ঘা ছাড়া দৃশ্যতঃ কুমারের আর কোনও পীড়া ছিল না এবং কুনুইয়ের ও পায়ের ঘা অন্ততঃ বাহুর ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। বিবাদী পক্ষ এই সাক্ষ্য খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

ক্রন্দনের সোরগোল ওঠে. ডায়েরীতে বলা হইয়াছে যে, "আমি যাহাতে বিভাকে কলিকাতা না লইয়া যাই, তজ্জন্যই জয়দেবপুর হইতে অত লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে পোড়াদহে রাখা হইয়াছিল।" সত্যবাবু নিজেকে অত্যন্ত উপেক্ষিত মনে করেন, কারণ, তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া অপর এক ব্যক্তি (সত্যবাবু তাঁহার ডায়েরীতে এই ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়াছেন)। মেজরাণীকে বাড়ী লইয়া যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার যে প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল, তাহা হস্তগত করাই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহাকে ধরিবার জন্য পোড়াদহে যে লোকজন পাঠান হইয়াছিল, তাহাতেই সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে রাজপরিবারের লোকেরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন না, এবং তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, রাণীকে হাত করার অর্থ জমিদারী হাত করা—রাণীর অংশের বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা হাত করা। তাঁহার নিজ ডায়েরী হইতে এবং তাঁহার ডায়েরীদ্বারা সমর্থিত অন্যান্য সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না, এবং ইহাও সত্য যে কলেজের ছাত্র এই দরিদ্র যুবকের হৃদয়ে যৌবনোচিত কোন ঔদার্য্য ছিল না, বরং তাঁহার মাথার ভিতরে এমন চালবাজি, বজ্জাতি ও হীনতা ছিল—যাহা ষাট বৎসর বয়সের বৃদ্ধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

জয়দেবপুরে প্রত্যাবর্ত্তন

পোড়াদহ হইতে প্রেরিত একখানা টেলিগ্রাম এবং দামুকদিয়া ঘাট হইতে প্রেরিত আর একখানা টেলিগ্রামে দেখা যায়, পোড়াদহ হইতে তাহারা চাঁদপুর মেলে যাত্রা করেন ও ১১ মে দুপুর রাত্রিতে জয়দেবপুর পৌছেন, নারায়ণগঞ্জ হইতে তাঁহাদের গাড়ী ঢাকা হইয়া যায়, এদিকে বড়কুমারও ডাউন ট্রেণে ঢাকা আসিতেছিলেন। মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন, উহাতে বড়কুমারের ঔদাসীন্যই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, মেজরাণী বাড়ী পৌছিয়া অন্যান্য মহিলাদের সহিত সাক্ষাৎ কালে যে কান্নার রোল উঠিবে, তাহা যাহাতে না শুনিতে হয়; তজ্জন্যই বড়কুমার ঢাকা আসিতেছিলেন।

সত্যবাবুর ডায়েরীতে দেখা যায়, ১১ই মে রাত্রিতে তিনি ছোটকুমারের সঙ্গে বড় দালানে ছিলেন।

পরদিন প্রাতে সত্যবাবু, ম্যানেজার মিঃ সেনের সহিত দেখা করেন, এবং তৃতীয় কুমারের সাক্ষাতেই বলেন,—'দ্বিতীয়কুমার কোন উইল করিয়া যান নাই, তবে তাঁহার স্ত্রীকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়া গিয়াছেন।' ইহা মিথ্যাকথা, উভয় পক্ষের স্বীকৃতি অনুসারেই ইহা মিথ্যা বলিয়া দেখা যাইতেছে।

এস্থলে একখানি পত্রের কথা উল্লেখ করিব, এই পত্রই বিবাদীকে স্বীকার করিতে বাধ্য করে যে, ১৯১৭ সালে, বাদীর অভ্যুদয়ের চারিবৎসর পূর্ব্বে অল্প সময়ের জন্য একটা গুজব রটিয়াছিল যে, দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯১৭ সালেই যে এরূপ একটা গুজব রাষ্ট্র হইয়াছিল, বাদী পক্ষ তাহার যথারীতি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।

কুশপুত্তলিকা

এই কুশপুত্তলিকা দাহ সম্পর্কে জেরায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হয় যে, এই প্রথা অজ্ঞাত, অপ্রচলিত, অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। জেরা দ্বারা ইহা প্রমাণের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হইয়াছে। শাস্ত্রে কুশপুত্তলিকার কথা আছে, এই পথ রক্ষাও করা হয়; তবে কদাচিৎ এরূপ ব্যাপার ঘটে। কোনও লোক মারা গিয়াছে, অথবা তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এই বলিয়া অনুমান করিবার কারণ ঘটিয়াছে; অথচ তাহার শব সংকার হয় নাই, কিম্বা হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই,—এরূপ স্থলে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে তাহার শবের অনুকল্প কুশ (একপ্রকার ঘাস) দ্বারা নির্ম্মিত আকৃতি যথারীতি দাহ না করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পাদিত হইতে পারে না। যথারীতি শব দাহের অনুকল্প এই অনুষ্ঠান তাহার শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই করিতে হয়। বিবাদী পক্ষের ৯২নং সাক্ষী ফণীবাবু স্বীকার করিয়াছেন,—তাঁহার ভ্রাতা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তির মৃতদেহ নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাই তাঁহার ভ্রাতার শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে কুশপুত্তলিকা দাহ করিতে হইয়াছিল।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে দ্বিতীয় কুমারের কুশপুত্তলিকা দাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, এই বিষয়ে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা জয়দেবপুরেই ছিলেন। এই সাক্ষীদের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, তাহার জামাতা। কুমারের ভাগিনেয় বিল্লু (বাদী পক্ষের ৯৩৮নং সাক্ষী) ব্যতীত পুরাতন ভৃত্য, কর্ম্মচারী এবং আত্মীয়গণ আছেন। ইঁহারা ঘটনার সময়ে জয়দেবপুরে ছিলেন। (বাদী পক্ষের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ১৫, ১৬, ৩৫, ৩২, ৪৮, ৫২, ৩৭, ৮৭, ১৫৫, ২৬২, ৮৫২, ৫২২, ৫৫৭, ৮৯২, ৯৫৮, ৮৫২ নং সাক্ষী) ইহাদের মধ্যে স্থলের জমিদার এবং বিল্লুর শ্বশুর অখিলবাবু ছিলেন। শ্রাদ্ধের সময় তিনি নিশ্চয়ই সেখানে ছিলেন। ১৯০৯ সালের ১১ই মে তারিখে প্রেরিত তাঁহার তারে (২৬২নং একজিবিট) তিনি বলিয়াছিলেন যে ১৩ই মে তারিখে তিনি আসিতেছেন। ইহা হইতেই তাহার উপস্থিতির কথা প্রমাণিত হয়। ১৮ই মে তারিখে

শ্রাদ্ধ হয়। মৃত্যুর দিনকে প্রথম দিন ধরিয়া হিসাব করিয়া ১১শ দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই সাক্ষী বলেন, তিনি আসিয়া সত্য-বাবুকে জয়দেবপুরে দেখিতে পান। এবং তাঁহার আগমনের ২ কিম্বা ৩ দিন পরে সত্যবাবু কলিকাতা চলিয়া যান। অতএব সত্যবাবু যখন বলেন যে, তিনি শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন না,১৬ই তারিখে কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কথা সত্য। শ্রাদ্ধের কাছাকাছি সময়ে সত্যবাবু সেখানে ছিলেন, ইহা নিশ্চিত। তথাপি সত্যবাবু নিজেই কুমারের শব দাহ করিয়াছেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান এবং কেলেঙ্কারী এড়াইবার আগ্রহ হইতেই কুশপুত্তলিকা দাহের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ার যে প্রমাণ আছে, তাহার মধ্যে বিশ্বাসের অযোগ্য কিছু নাই। কোন কোন সাক্ষী ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে, সত্যবাবু শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি যে শ্রাদ্ধের সময় হাজির ছিলেন না, একথা এমন কি রাণীর পর্য্যন্ত মনে উঠে নাই ; সত্যবাবু সাক্ষীর কাঠগড়ায় না আসা পর্য্যন্ত এই কথাটি বলার বিষয় কাহারও মনে স্থান পায় নাই।

অপরদিকে সাক্ষীদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, কুশপুত্তলিকা সম্বন্ধে এই আলোচনা হয় নাই। এই সকল সাক্ষী হইতেছেন রাণী এবং সত্যবাবু ব্যতীত, রায়সাহেব যোগেন্দ্র বাঁড়ুযো (বিবাদীপক্ষের ৩১০নং সাক্ষী), ফণীবাবু এবং এষ্টেটের আরও কয়েকজন বর্ত্তমান কর্ম্মচারী। বাহিরের সাক্ষী বলিয়া একমাত্র যে ব্যক্তিকে ধরা যায়, সে হইতেছে শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে ব্রাহ্মণকে আনা হইয়াছিল, সে অর্থাৎ বিবাদীপক্ষের ২৮৩নং সাক্ষী। সে বলিয়াছে যে, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং টঙ্গী হইতে সে ট্রেণে গিয়াছিল এবং তাহাকে ট্রেণের ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল. কিন্তু দেখা যায় সে,তখনও টঙ্গী-ভৈরব লাইন খোলা হয় নাই। সুনিশ্চিত কথা তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদের কিম্বা কোনও সাক্ষী বিশেষের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করিয়া এই মামলায় কোন কিছু নির্দ্ধারণ না করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এই কুশপুত্তলিকার যে প্রস্তাব, তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও অন্যান্য উপায়ে ইহা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার দ্বারা কোনই প্রমাণের ভিত্তিতে উপনীত হওয়া যায় না। কুমারের শব দাহ হইয়াছে কিনা, তাহাই এস্থলে আসল প্রশ্ন। যদি প্রমাণিত হয় যে,শব দাহ হইয়াছে,তাহা হইলে কুশপুত্তলিকার প্রস্তাব দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। আর যদি শব দাহ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, কুশপুত্তলিকার কথা হইয়াছে। কারণ দার্জ্জিলিংএ সমবেত জনতার মধ্যে কেহ কেহ বলিতে সুরু করিয়াছিল যে, শব দাহ হয়

নাই, এই বিষয়ে যে সকল প্রমাণ আছে সেগুলি অগ্রাহ্য করিবার কোন উপযুক্ত কারণ দেখিতেছি না।

মেজোকুমার সম্বন্ধে নানা গুজব

মেজো কুমার জীবিত আছেন, এই গুজবের দ্বারা কিছু প্রমাণিত না হইলেও একথা ঠিক যে,ইহা রটিয়াছিল। বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন, এই গুজব ১৯১৭ সালে রটিয়াছিল, তাহা ঠিক নহে। ১৯০৯ সালেই এই গুজব রটিয়াছিল। কেবল যে শত শত সাক্ষীই ইহা শুনিয়াছিল এমন নয়, ইহা যাহারা শুনিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ঢাকার আর্ম্মেনিয়ান ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় আর্ম্মেনিয়ান গীর্জ্জার সভাপতি মিঃ ষ্টীফেন (বাদীপক্ষের ১১২ নং সাক্ষী), এই রাজ পরিবারের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত, ময়মনসিংহের জমিদার হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ১৯০৯ সালে জয়দেবপুর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশ রায় (বাদীপক্ষের ২৬২নং সাক্ষী), কলিকাতার লক্ষপতি শ্রীযুত হলধর রায় (বাদী পক্ষের ২৪৮নং সাক্ষী), সরকারী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত। ঢাকার জমিদার নবেন্দু বসাক (বাদী পক্ষের ৪২৬ নং সাক্ষী), ঢাকা-প্রকাশ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বাদী পক্ষের ৩৫৫নং সাক্ষী), জগদ্বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীযুত সোমেশচন্দ্র বসু (বাদী পক্ষের ৪৩৫নং সাক্ষী), ঢাকার প্রবীণ উকিল রেবতীবাবু (বাদী পক্ষের ৬২নং সাক্ষী), অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ঘোষ (বাদী পক্ষের ৭৮৯ নং সাক্ষী), অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কালীমোহন ঘোষ, প্রবীণ উকিল এবং ঢাকা সহরের প্রতিষ্ঠাপন্ন এবং বিত্তশালী জমিদার হারাণ বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু হরেন্দ্রকুমার ঘোষ, ব্যারিষ্টার মিঃ এস, কে, নাগ, জমিদার ও ব্যাঙ্কার রাজেন্দ্রকুমার রায়, ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন রায় সাহেব আনন্দকুমার গাঙ্গুলী, জয়দেবপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বসু, ঢাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ দেবেন্দ্র বসু, কলিকাতার বিশিষ্ট বিত্তশালী ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি, সি, গুপ্ত, ঢাকার জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বসাক প্রভৃতির ন্যায় দেশ-প্রসিদ্ধ লোকও আছেন। আমি যাহাদের নাম করি নাই, তাঁহাদের মধ্যে আরও এমন বহু বিশিষ্ট, পদস্থ ও প্রবীণ ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্র কারণও নাই। আমি তাঁহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করি।

কেবল যে তাঁহাদের বিশ্বস্ততার দিকে চাহিয়াই সাক্ষ্য বিশ্বাস করা হইতেছে এমন নহে। ১৯১৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বাদীর আত্মপ্রকাশের

কুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হইতেছে, তবে তাহা সন্ধ্যায় কি প্রাতঃকালে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই (২৫৬ নং একজিবিট), উক্ত পত্রের প্রমাণ্যের উপর জোর দিয়াই বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্যে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, ঐ ঘটনার পর মধ্যম কুমারের জীবিত থাকার গুজব লোপ পায়।

কিন্তু একবার যে রটনা হয়, অকস্মাৎ তাহা বিলুপ্ত হয় না। মানুষ সহজে তাহা ভুলিতে পারে না। মধ্যম রাণী ঐ রটনার আধুনিকতার বিষয় বর্ণনা করিলেও, ইহা নিঃসন্দেহ যে, পূর্ব্ব হইতে যদি ঐ ধরণের কোনও গুজব প্রচারিত না থাকিত, তাহা হইলে ১৯২১ সালের মৌনি-সন্ন্যাসীসংক্রান্ত কাহিনী এবং দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছেন কি না—এরূপ প্রশ্ন কখনও কাহারও মনে আসিত না। এ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছেন বলিয়া তখন ভাওয়ালে জোর গুজব চলিয়াছিল এবং কুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কীয় প্রশ্ন কেবল যে বাদীর আত্ম প্রকাশের পরই উঠিয়াছিল, তাহা নহে। সে প্রশ্নের আলোচনা পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল।

তখন সত্য কি করিলেন

মধ্যম কুমারের শ্রাদ্ধ দিনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাই, সে এক শোচনীয় ব্যাপার; সে শ্রাদ্ধে কোনও আড়ম্বর নাই। ১৮ই মে কুমারের শ্রাদ্ধ হয়, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১৬ই মে অথবা প্রায় ঐ সময়ে সত্যবাবু কলিকাতায় চলিয়া যান। মুকুন্দ গুপ্তও সত্যবাবুর সহিত ঐ সময় কলিকাতায় যায়। প্রকাশ থাকে যে, এই মুকুন্দ গুপ্ত কুমারের লোকজনের সহিত দার্জ্জিলিং গিয়াছিল। সত্য বাবু বলেন, তাঁহার মা তখন পীড়িতা ছিলেন, সেইজন্য এবং উকিলের সহিত পরামর্শ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি কলিকাতা গিয়াছিলেন। যে কারণে তাঁহার উকীলের পরামর্শ লইবার আবশ্যক হয় এবং মধ্যম কুমারের শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই এত তাড়াতাড়ি তাহা আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা এই যে, বড়কুমার সম্পত্তি শাসন সংরক্ষণের জন্য এক খানি দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং সেই দলিল অনুসারে সম্পত্তি পরিচালনায় সত্য বাবুর ভগ্নী রাণী বিভাবতী দেবীর কোনও হাত ছিল না। মাসিক তাঁহার জন্য হাজার টাকা হিসাবে মাসোহারা বরাদ্দ হইয়াছিল। ঐ প্রকারের এক দলিল যে প্রস্তুত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ দলিলের উদ্দেশ্য ছিল, মধ্যম রাণীর ভ্রাতাকে দূরে রাখা; কারণ, তাঁহার মনোভাব সকলেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন সত্যবাবুর নিজের ডাইরীতে (দৈনন্দিন কার্য্যবিবরণী)

সার্টিফিকেট লইয়াছেন ; এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, অপর দুই কুমার ইনসিওরেন্সের টাকার অংশের দাবী করেন নাই। এবং ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বড় কুমারের মৃত্যুর পূর্ব্বে কলিকাতাতেই টাকা তুলিয়াছেন। ডায়েরী উপস্থিত করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই মামলায় ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, এষ্টেটই টাকা তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি শুধু চেকখানি লইয়াছেন। এখন ইহা নিঃসন্দেহ যে, তিনিই টাকা তুলিবার জন্য ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট মৃত্যু সম্পর্কিত এফিডেভিট পাঠাইয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম কর্ণেল ক্যালভার্টের নিকট হইতে এফিডেভিট নেওয়া হইয়াছিল। তিনিও এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছেন। কুমারের অসুখ এবং মৃত্যু সম্পর্কে এই এফিডেভিটটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিল। কর্ণেল ক্যালভার্টের নিকট এফিডেভিটের জন্য কুমারের লোকগণ গিয়াছিল বলিয়া বলা হইয়াছে। আবার বলা হইয়াছে যে, ডাঃ শিশির পালের অনুরোধে তিনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চন্দের নিকট এফিডেভিট পাঠাইয়াছিলেন, মিঃ চন্দ এখনও দার্জ্জিলিংএ বাস করিতেছেন। ডাঃ ক্যালভার্টের প্রদত্ত মৃত্যু সম্পর্কিত এফিডেভিট নেওয়ার জন্য এষ্টেট হইতে কোনও লোককে দার্জ্জিলিং পাঠান হইয়াছে বলিয়া, কোন সাক্ষী, এমনকি রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথও বলেন নাই, এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ৪ঠা মে বাদী আত্মপরিচয় দেওয়ার পর ১০ই মে সত্যবাবু রেভিনিউ বোর্ডের অফিসে যান এবং তাঁহার নিকট যে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নিকট প্রেরিত এফিডেভিটের নকল ছিল, উহা তিনি তখন দাখিল করেন।

সত্যবাবুর চালচলন

কুমারদের দুইজনই সত্যবাবুর সহিত ভাল ব্যবহার করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহার জন্য আসবাবপত্র, বিছানা, টাকা পয়সা ও ঘোড়া পাঠাইয়াছিলেন। ইনসিওরেন্সের ত্রিশ হাজার টাকা হইতে কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই, এবং নামমাত্র পনর শত টাকা সেলামী লইয়া এই সহরে এক বিঘার উপর জমি বন্দোবস্ত দিয়াছেন, এই পনর শত টাকাও তাঁহার ভগ্নীর তহবিল হইতে গিয়াছে। ১৯১৩ সালে সত্যবাবু এই জায়গার জন্য ১৪৫০০৲ টাকা দর পাইয়াছিলেন। (একজিবিট নং ৭৭) ডায়েরী প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুমারগণই প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে এই সকল জিনিষপত্র, জায়গা জমি দিয়াছিলেন বলিয়া বলা হইত। ডায়েরী হইতে এইগুলি পরিষ্কার বুঝা যায়। বড়কুমারের বয়স তখন সাতাশের (২৭) মত ছিল এবং তিনি মদ্যাসক্ত ছিলেন। সত্যবাবুর

৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইনসিওরেন্সের টাকা ব্যতীত ছত্রিশ হাজার টাকা আনাইয়াছিলেন। ঐ অর্থের মধ্যে মেজকুমারের শ্রাদ্ধের ব্যয় বাবদ দুই হাজার টাকাও ছিল। তিনি ১৩২০ সনের পৌষ মাসে তাঁহার মাতার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১১০০৲ করিয়া পাইতেছিলেন। ইনসিওরেন্সের ত্রিশ হাজার টাকা ধরিলে, তিনি অথবা তাঁহার ভাই একলক্ষ টাকার মত পাইয়াছেন। সত্যবাবু বলেন যে, তাঁহার মা তাঁহার জন্য চাল্লিশ হাজার টাকা রাখিয়াছেন। অথচ তিনি আজীবন তাঁহার কন্যা বা পুত্রের মুখাপেক্ষী ছিলেন! তিনি কোন টাকা রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। উত্তরাধিকারী গণ্য হওয়া সম্পর্কিত সার্টিফিকেট নেওয়া সম্পর্কে অবাঞ্ছিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সত্যবাবু বলিয়াছেন যে, তাঁহার মাতা জীবিতকালেই তাঁহাকে টাকা দিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি তাহা করিয়া থাকেন, বা তাঁহার কোন টাকা থাকে, তবে তাঁহার কন্যারাই ঐ টাকার মালিক হইতেন।

১৯১১ সালে তিনি কলিকাতা চলিয়া যান, তাহার পর আর ফিরিয়া আসেন নাই। তাহার কলিকাতা যাত্রার পরই কোর্ট অব ওয়ার্ডস তাঁহার অংশের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার কলিকাতা গমনের পূর্ব্বেই কোর্ট অব ওয়ার্ডস তাহার অংশের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে উক্তি মিথ্যা। আমার মনে হয়, মিঃ নীডহাম তার করিয়া সেই সংবাদ জানাইলে উহা যেন তাঁহাদের মধ্যে বোমার ন্যায় আপতিত হইয়াছিল। সত্যবাবু তাহাই বলেন; যাহা হইক, এ সংবাদ বোমার মত হউক আর না হউক, কিন্তু মেজ রাণীর পক্ষ হইতে তাঁহার সলিসিটর মেসার্স ওর ডিগনাম এণ্ড কোম্পানী তাঁহার ভ্রাতার পরামর্শক্রমে তাঁহার অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইতে খালাস করিবার জন্য রেভেনিউ বোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছেন। অতঃপর লর্ড সিংহ (তৎকালে মিঃ এস পি সিংহ) তাঁহার পক্ষে ঐ দরখাস্ত সম্পর্কে সওয়াল করেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। উক্ত দরখাস্তের তারিখ ২৫-৫-১১। তাঁহার অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডসেই রহিয়া গেল, এখন পর্য্যন্ত উহা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে আছে।

ছোট কুমারের অংশ ১৯১১ সালের মে মাসে এবং বড়রাণীর অংশ প্রবেটের মামলার নিষ্পত্তি হইবার পরই ১৯১২ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যায়। এই রূপে ১৯১২ সালে সমস্ত এষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যায়। তখন ছোটকুমারের বয়স ২৬ বৎসর, তাঁহার জীবনও ফুরাইয়া আসিতেছিল।

ছোটরাণীকে দেখাইয়া তাঁহাকে বলা হয় যে, তিনি কলিকাতা বা অন্যত্র থাকিতেও ননদের সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল পত্র পুনঃ পুনঃ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখেন এবং বলেন, তিনি ঐ সকল পত্র লেখেন নাই, তবে তাঁহার হস্তাক্ষরের সহিত ঐ সকল পত্রের হস্তাক্ষরের সাদৃশ্য আছে। যদি এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হইত, তবে তিনি যে সকল লেখা তাঁহার হস্তাক্ষর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, উহার সহিত সেই সকল পত্রের হস্তাক্ষর তুলনা করিতাম; যাহা হউক, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার সহিত রাজকুমারীদের অসদ্ভাব ছিল, তাহা প্রমাণকল্পে কোনও সাক্ষ্য নাই এবং তাঁহাদের আচরণেও তাহা প্রমাণিত হয় না, পক্ষান্তরে এমনও প্রমাণ নাই যে, তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল।

তৃতীয় কুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার ভগিনীরা চক্ররে নিজ নিজ বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। কুমারদের পিসী কৃপাময়ী দেবী ছোটকুমারের মৃত্যুতে এমন শোক পাইয়াছিলেন যে, ১৯১৩ সালের ৩রা অক্টোবর তিনি উইল করেন ও তৎপর অগ্রহায়ণ মাসে কাশী যাত্রা করেন; আর তিনি ফিরিয়া আসেন নাই। সত্যভামা দেবীও ১১ই অক্টোবর তারিখে তাহার উইল করিয়া কৃপাময়ী দেবীর সঙ্গে কাশী যাত্রা করেন। কৃপাময়ী দেবী ফিরিলেন না; কিন্তু সত্যভামা দেবী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; ১৯২১ সালে যখন বাদী আসেন, তখন সত্যভামা দেবী জয়দেবপুরে ছিলেন। কৃপাময়ী দেবী ১৯২০ সালের ২০শে এপ্রিল কাশীতে মারা যান।

বড়রাণী ও মেজরাণী কলিকাতায় ছিলেন। জয়দেবপুরে কি ঘটিত না ঘটিত, তাহার সঙ্গে তাহাদের কোন সংশ্রবই ছিলনা; বড়রাণী ৮নং মধু গুপ্ত লেনে তাহার পিত্রালয়ে ছিলেন, বাঙ্গালা ১৩২০ সনের ৬ই আষাঢ় অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১৩ সালের জুন মাসে তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিকট শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন—অবশ্যই উহা যদি শেষ পত্র হইয়া থাকে; কিন্তু তিনি যে তৎপর আরও পত্র লিখিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। এই পত্রখানা একটু কঠোর ধরণের। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বড়রাণীকে লিখিয়াছিলেন, বড়রাণী যেন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্র বুদ্ধুর বিবাহের খরচ দিতে কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে অনুরোধ করেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর ঐ পত্রের উত্তরে বড়রাণী উক্ত পত্র লিখিয়াছিলেন। বড়রাণী ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত মধু গুপ্ত লেনে পিত্রালয়ে ছিলেন। তৎপর তিনি ১১২নং রিপণ রোডের বাড়ীতে উঠিয়া যান। এখনও তিনি তথায় আছেন।

মেজরাণী কলিকাতা গিয়া ৮নং হ্যারিসন রোডে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে

টাকাও দিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে, বাদীর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও মেজরাণীর মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল; তাঁহাদের মধ্যে যে অসদ্ভাব ছিল, এমন কথা কেহই বলে নাই। এই বিষয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোনও প্রতিবাদ হয় নাই, শুধু মেজরাণী বুদ্ধুর স্ত্রীকে গোপনে ব্রেসলেট উপহার দিয়াছিলেন, কি প্রকাশ্যে দিয়াছিলেন, এই বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, সুতরাং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে বলিয়াছেন, বড় রাণীর সঙ্গে তাঁহার অসদ্ভাব ছিল না, আবার হৃদ্যতাও ছিল না, এবং পিতার উইল অনুসারে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে মাসোহারা পাইতেছিলেন, বাদী আসিবার পূর্ব্বে বড়রাণী একবার তাহাতে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, বা উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—তাঁহার এই সকল কথা অবিশ্বাস করিবার পক্ষে আমি কোনও কারণ দেখি না। বড় রাণীর জেরা হইতে এমন কিছু দেখা যায় না যে, তাঁহাদের মধ্যে মনোভাব অন্যরূপ ছিল: বড় রাণীর যে পত্রগুলি বিবাদী পক্ষ দাখিল করিয়াছেন (অনেকগুলি পত্রই দাখিল করা হইয়াছে। এইগুলি সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করিব) তাহা হইতে দেখা যায়, তিনি তাঁহার অধিকার এক চুলও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। সুতরাং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যদি ১৯২১ সালে একটী প্রতারককে কুমার স্বীকার করিয়া তাহার বিধবা ভ্রাতৃ-জায়ার উপর একটি স্বামী চাপাইয়া ভ্রাতৃজায়ার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেন, এবং ছোটরাণীর পোষ্যদের না হউক তাঁহার পোষ্য পুত্রের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া পরোক্ষভাবে ছোট রাণীরও সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে রাণীদের সহিত তাহার শত্রুতা ছাড়া অন্য কোনও কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে। বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন এবং এখনও বলেন, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী একজন প্রতারককে সমর্থন করিয়াছেন, কারণ হিন্দু আইন অনুসারে কুমারদের ভাগিনেয়গণই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতেন, কিন্তু ছোটরাণী দত্তক গ্রহণ করায় তাঁহাদের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া যায়। রাজকুমারীরা যখন নিজ নিজ সংসার পাতেন, তখন তাঁহাদের আয় কত ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না, কিন্তু দেখা যায়, পিতার উইল অনুসারে তাঁহারা বার্ষিক ২৪০০ টাকা অর্থাৎ মাসিক ২০০ টাকা করিয়া পাইতেন, হয়ত তাঁহারা আরও কিছু বেশী পাইতেন, কারণ ১৯২১ সালে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্র বুদ্ধুর জুরীগাড়ী ছিল। যাহা হউক পল্লী গ্রামে মাসিক দুইশত টাকা আয় বিশিষ্ট লোক ধনী না হইলেও, পল্লীগ্রামে মাসিক ২০০ টাকা আয় নিতান্ত কমও নহে।

অবশ্যই ভাওয়াল এষ্টেটের উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভাবনার সহিত তুলনা করিলে উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

রাণীদের সম্পর্কে কথা এই যে, ছোটরাণী ঢাকায় বাস করিতেছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম রাণীও কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহারা ভাওয়ালের সহিত এক প্রকার অপরিচিতা হইয়া উঠিতেছিলেন। ১৯১৩ সালে দ্বিতীয় রাণীর মাতার মৃত্যু হয়; পৌষ মাসে —অর্থাৎ ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় রাণীর মাতৃবিয়োগ হয়। চিরতরে ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে, দ্বিতীয়া রাণী প্রায় এক লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। এই টাকা ছাড়া ১৯১১ সালের এপ্রিল মাস হইতে তিনি মাসিক ১১০০৲ টাকা করিয়া পাইতে থাকেন। ১৯১৩ সালে এই টাকার পরিমাণ বাড়িয়া ২৫০০৲ টাকা হয়। ১৯১৫ সালের কাছাকাছি সময়ে এই টাকার পরিমাণ ৪০০০৲ টাকায় গিয়া দাঁড়ায়। দুই বৎসর পরে ইহা বাড়িয়া ৫০০০৲ টাকা হয়। ১৯১৯ সালে এই টাকার পরিমাণ প্রতি মাসে ৭০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। সেই বৎসর হইতে দ্বিতীয় রাণী মাসিক ৭০০০৲ টাকা করিয়া পাইতেছেন।

মেজরাণী কত টাকা পাইয়াছেন

এই মাসিক ভাতা ব্যতীত, দ্বিতীয় রাণী অতিরিক্ত এবং বাড়্তি টাকাও পাইয়াছেন। তিনি নিজে যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, এই টাকার পরিমাণ গড়ে ৩॥ লক্ষ কিম্বা চারিলক্ষ হইবে। এই যে হিসাব, তাহা আমি দ্বিতীয় রাণীর সাক্ষ্য হইতে এবং হিসাব সম্পর্কে উত্থাপিত যে কোন কাগজপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু সত্যবাবু নিজে এই টাকার পরিমাণ এবং প্রাপ্তির সময় সম্পর্কে তাঁহার ভগিনী অপেক্ষা অধিকতর অস্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। তিনি অপেক্ষা তাঁহার ভগিনীই বেশী কথা জানেন, এই যে ছলনা, তাহা রক্ষা করিবার জন্যই সত্যবাবু এরূপ অস্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। দ্বিতীয় রাণী টাকার অঙ্কগুলি জানেন; কিন্তু এই টাকার কি হইল, তাহা তিনি জানেন না। তিনি কলিকাতার ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডে থাকেন এবং এই বাড়ীটি তাঁহার ভ্রাতার সম্পত্তি বলিয়াই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এই বাড়ী ক্রয় এবং ইহার উন্নতি বিধানের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা আমার ভ্রাতাকে আমি উপহার দিয়াছি। বাড়ীর জন্য কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় রাণী জানেন না। তাঁহার ভ্রাতা আসিয়া বলেন, এই সম্পত্তি তাঁহারই; ইহার জন্য দুই লক্ষ

বাকল্যাণ্ড বাঁধে

বাদীর পূর্ব্বোক্ত উক্তিসমূহ, অর্থাৎ আলোচ্য উপাখ্যানের এতটা অংশ বাদীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে। তাঁহার নিরুদ্দেশ কালের অবশিষ্ট অংশের যে কাহিনী তিনি বিবৃত করিয়াছেন, যদি তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে বাদীর পূর্ব্বোক্ত উক্তি অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধে যখন তিনি উপবিষ্ট হইলেন, সেইখান হইতে এই কাহিনীর (যেখানে আমি অন্য প্রকার বর্ণনা করিব তাহা ছাড়া) আর সকলই সাধারণের বলিয়া স্বীকৃত। তিনি দিবারাত্রি সেখানে বসিয়া থাকিতেন। রৌদ্র বৃষ্টিতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ক্রমাগত তিন চারি মাস—প্রায় ৫ই এপ্রিল অথবা ১৭ সালের চৈত্র মাস শেষ হওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি একভাবে সেখানে বসিয়াছিলেন।

ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, চৈত্রমাস শেষ হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বাদী কাসিমপুরে গিয়াছিলেন, এবং বিবাদীপক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়াই তিনি বলেন যে, তিনি বারুণীর দিন কাশিমপুর অভিমুখে রওনা হন; কিন্তু বাদীর কাশিমপুর যাওয়ার যে কাহিনী বিবাদীপক্ষ বর্ণনা করেন, বাদী তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—৫ই এপ্রিল বা ঐরূপ সময়ে তিনি কাশিমপুর গিয়াছিলেন। সুতরাং বাদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য অনুসারে, বাদী, বাকল্যাণ্ড বাঁধে তিন চারি মাস অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইলেও প্রতিপন্ন হয়,—বাদী অবশ্যই ডিসেম্বর মাসের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট দিনে ঢাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। মিঃ নিডহামও তাঁহার রিপোর্টে (একজিবিট ৫৯) সেই কথাই বলিয়াছেন।

প্রায় চারিমাসকাল বাদী দিবারাত্রি বাকল্যাণ্ড বাঁধে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে সন্ন্যাসীর ন্যায় দেখাইত, লেংটি ছাড়া তাহার পরণে আর কিছু ছিল না। তাঁহার সুদীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফ; মাথার চুল, জটা বাঁধিয়া পৃষ্ঠদেশে বহুদূর বিলম্বিত। তাহা প্রায় জানু পর্য্যন্ত ঠেকিয়াছে। (১৯এ নং একজিবিটের ফটো দ্রষ্টব্য) জলন্তধুনির সম্মুখে তিনি অহরহঃ উপবিষ্ট। আপাদমস্তক সন্ন্যাসীর সমস্ত শরীর ভস্ম-বিলেপিত। শত শত লোক, যাঁহারা বাকল্যাণ্ড বাঁধ দিয়া যাতায়াত করেন, অবশ্যই সেখানে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া থাকিবেন।

দেবব্রত বাবুর মন্তব্য

সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে বাবু দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি সাব্-জজ ছিলেন, এখন তিনি অবসর প্রাপ্ত; কিন্তু তখন তিনি ঢাকার আদালতের বিচারাসনে সমাসীন ছিলেন। বাঁধ হইতে তাঁহার বাড়ী যাইতে

যে, সাধুর পিতা মাতা নাই এ কথা বলেন নাই, যাহা হউক বাদী পাঞ্জাবী কি হিন্দুস্থানী তৎসম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব, মিঃ মুখুজ্জে সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন যে, সাধু পাঞ্জাবী বা দুর্ব্বোধ্য হিন্দী বলেন নাই, সাধুকে কয়েকজন বাঙ্গালীর সহিতও হিন্দীতেই কথা বার্ত্তা বলিতে তিনি শুনিয়াছেন, বাঙ্গালীরা কিন্তু বাঙ্গালাতে কথা বলিয়াছে, তাহারা সন্ন্যাসীর নিকট ঔষধ চাহিয়াছিল, তাহাদিগকে ঔষধ দিয়াছেন কি-না তাহা তাঁহার মনে নাই, বিবাদী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, মে মাসে যখন বাদী আত্মপরিচয় দেন, তখন তিনি বাঙ্গালা বলিতে পারেন নাই। অতুলবাবু কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন ঐ সময় বাদী অদ্ভুত রকমের হিন্দুস্থানীতে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন।

বাদীর স্মৃতিশক্তির কথা

বাদী নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধে যে সকল লোক তাহাকে বিরক্ত করিয়াছে, তাহাদের সহিত তিনি হিন্দীতেই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

আমার নিকট বহুলোক আসিয়াছে। তাহারা তাহাদের মধ্যে বলাবলি করিত—'এই ভাওয়ালের কুমার, ইনিই মেজকুমার।' যাহারা সেখানে আসিয়াছিল তাহাদের অনেককেই আমি চিনিতাম, তাহারা কিছু না বলিলে আমি কিছুই জানিতাম না। তাহারা বাঙ্গালাতে কথা বলিত এবং আমি হিন্দীতে বলিতাম, "আমার গুরু আত্মপরিচয় দিতে নিষেধ করিয়াছেন তাই বলিয়া আমি হিন্দী বলিতাম।"

জেরার উত্তরে তিনি বলেন, যখন আমি ঢাকা পৌঁছি এবং যখন আমি জয়দেবপুরে যাই তখন আমি বুঝিতে পারি যে, আমি বাঙ্গালী, ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশন আমরা নিকট পরিচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কি ভাবে আমি জায়গাটা চিনিলাম, তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইয়া যাই। আমার সন্ন্যাস নেওয়ার পর আমি কখনও ঢাকা আসি নাই, রেলওয়ে ষ্টেশনে আমি রাজার পুত্র বলিয়া ভাবিতেও পারি নাই, স্মরণেও আনিতে পারি নাই। পরদিন আমি বাকল্যাণ্ড বাঁধে গিয়া বসি। আমার কাছ দিয়া যে সকল লোক যাইতেছিল, তাহাদিগকে আমি চিনিতে পারিয়াছিলাম। তাহাদের নাম মনে পড়িতে লাগিল, ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে আমি গরু, মানুষ ও জিনিষ পত্র চিনিতাম, আমি যে রাজার পুত্র তাহা আমি জানিতাম না।

তিনি ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধে খোলা জায়গায় তিন মাস বাস করিয়াছেন, বলিয়া

এবং ৯১৯নং সাক্ষী বলিয়াছে যে, বাদীকে দেখিয়া তাহাদের মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, ইনিই দ্বিতীয় কুমার কি না। এই চিন্তা তাহাদের মনকে আলোড়িত করিয়াছিল। কোন কোন সাক্ষীর মনে অবশ্য এই চিন্তার উদয় হয় নাই; কিন্তু মনে হয় সে সকল সাক্ষী কুমারকে খুব ভাল ভাবে চিনিত না। তাহারা হয়ত রাস্তায় বা ঘটনাচক্রে অন্য কোথাও কুমারকে কদাচিৎ দেখিয়া থাকিবে। আর বাকী সকল সাক্ষী যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। তাহারা দ্বিতীয় কুমারকে মুখ দেখিয়া চিনিত, এবং বাকল্যাণ্ড্ বাঁধে বাদীকে দেখিয়া তাহাদের অনেকের মনেই ইহাকে 'কুমার' বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা ঠিক তখন চিনিয়া উঠিতে পারে নাই। বাকল্যাণ্ড বাঁধে থাকিবার সময় বাদীকে কুমার বলিয়া সন্দেহ করা হইয়া থাকিলেও কুমারের সাদৃশ্য সম্বন্ধে কোন কিছু প্রমাণ হয় না। তবে তাঁহাকে যে কুমার বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল, একথা কেবল বাদীপক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাদী যখন বাকল্যাণ্ড বাঁধে অবস্থান করিতেছিলেন তখন নবাব এষ্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার মিঃ মেয়ার বাকল্যাণ্ড বাঁধের উপর অবস্থিত ওয়াইজ হাউসে বাস করিতেন; বিবাদীপক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বাকল্যাণ্ড বাঁধে এই সাধুকে তিনি অনেকবার দেখিয়াছেন, একটি কারণে সাধুর প্রতি তিনি বিশেষ নজর রাখিতেন; সেই কারণটি হইতেছে এই যে, তাঁহাকে আসিয়া একজন বলিয়াছিল যে, এই সাধু নিজেকে নাকি 'ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার' বলিয়া বলিতেছে, মিঃ মেয়ার বলিয়াছেন,—"এই কথা শুনিবার পর আমি যখন বাকল্যাণ্ড বাঁধে বা অন্য কোথাও বেড়াইতে যাইতাম, তখন তাহার সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহসহকারে অনুসন্ধান করিতাম, এবং আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, সে একজন প্রতারক।" ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বাদী যখন বাকল্যাণ্ড বাঁধে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই তাঁহাকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছিল। যে সকল সাক্ষী এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, তাহারা সত্য কথাই বলিয়াছে, এবং বাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের উক্তিতে সমর্থিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিবাদীপক্ষ বাকল্যাণ্ড বাঁধ সম্পর্কিত ব্যাপার লইয়া আদালতে খুবই তুমুল-ভাবে লড়িবার ফলেও একমাত্র দেবব্রত বাবু ছাড়া, ঢাকা হইতে এমন একজন সাক্ষীকেও আনিতে পারেন নাই, যে ব্যক্তি বাদীকে সেই অবস্থায় দেখিয়াছে। বাদী কিন্তু এই ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ দেখান নাই; আর তা ছাড়া দেবব্রতবাবুও কুমারকে চিনিতেন না, ঢাকায় কুমারকে লইয়া যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

দেন, তখন তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর। বাদী পক্ষে এইরূপ সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি সুস্থ ছিলেন এবং সাক্ষ্য দিতে আদালতে আসিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহাকে আদালতে ডাকা হয় নাই, এবং মামলা যখন শেষ হয়, তখন ঐ জবানবন্দী দাখিল করা হয়, এবং প্রশ্ন উঠে যে, তাঁহার প্রমাণ গৃহীত হইতে পারে কিনা। এক ব্যক্তি সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিয়া বলে যে, সে একজন ডাক্তার। অতুলবাবু পীড়িত হওয়ায় কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। পরে দেখা যায় যে, ঐ ডাক্তার অতুলপ্রসাদেরই একজন গোমস্তা। কিন্তু অতুলবাবু যে এলাকার বাহিরে চলিয়া যান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, **অতুলবাবু পলায়ন করিয়া তাঁহার প্রমাণ গ্রহণযোগ্য করেন**। বোধ হয় পলায়ন করিবার তাঁহার যথেষ্ট কারণও ছিল। বাদীর চেহারার সহিত মেজ কুমারের চেহারার সাদৃশ্য আছে কিনা, তৎসম্পর্কে বিবাদীপক্ষে যে ১০ জন সাক্ষী উপস্থিত করা হইয়াছে, অতুলবাবু তাহাদের অন্যতম। তাহাদের সকলেরই বাড়ী ঢাকা জিলায়। ঐ সময় কোন কোন বিষয়ে কমিশন সাক্ষিগণ যে সব কথা বলিয়াছেন, মামলা আরম্ভ হইবার পর মামলার ক্ষতি না করিয়া কিছুতেই তাঁহাদের ঐসব উক্তি সমর্থন করিবার উপায় ছিল না। এই অতুলপ্রসাদ, বাদী ও মেজ কুমারের চেহারার মধ্যে যে সব পার্থক্য আছে, তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়াছেন; তাহার মধ্যে একটা পার্থক্য এই দেখান হইয়াছে যে, কুমারের চুল কটা ছিল, কিন্তু বাদীর চুল কালো; কিন্তু বাদীর চুল কালো নহে, কটা বটে। কালো হওয়া দূরের কথা—এমনকি, মিঃ লিণ্ডসে ১৯২১ সালের মে মাসে বাদীর সুন্দর গায়ের চামড়া এবং সোনালী কটা চুল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অতুলবাবুর কালো চুলের কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, লাহোরের দশজন সাক্ষীও বলিয়াছেন যে, মালসিংহের চুলও (বাদীকে উজলার মালসিংহ বলা হইয়াছে)। কালো বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী এই কালো'র কাহিনী বাঁচাইবার পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ চেষ্টার পর সে সম্পর্কে অনেক সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন,—বলেন যে, মেজকুমারের সহিত বাদীর চুলের আর কোন মিল নাই। অতুলবাবু আদালতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার এই 'কালো' রংয়ের কাহিনীর কথা বলিতে পারেন নাই। ইহা একটী দৃষ্টান্ত মাত্র; কিন্তু কমিশন সাক্ষ্যদ্বারা ইহা বেশ ধরা যাইতেছে যে, সাক্ষীদের উক্তিতে এমন অনেক বিষয়ই আছে, যাহা তাহাদের পরবর্ত্তী চিন্তার ফল—বিশেষ করিয়া এই সাক্ষীর (অতুলবাবুর) প্রায় প্রত্যেক উক্তিতেই সুস্পষ্টভাবে 'মিথ্যার ছাপ' রহিয়াছে। এই সম্পর্কে যখন আমি আলোচনা

যোগেন্দ্র—যিনি ১৩৩৪ সাল পর্য্যন্ত জয়দেবপুরে বিবাদী পক্ষের কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং এই মামলায় প্রধান তদ্বিরকারক। ইঁহারই পুত্র দার্জ্জিলিংএ বাঙ্গালার গভর্ণর স্যারজন এণ্ডারসনের উপর আক্রমণ করার ফলে তাঁহাকে (যোগেন্‌কে) ডিস্‌মিস্‌ করা হয়। তিনি যাহাতে পুনর্ব্বহাল হইতে পারেন, তজ্জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন এবং তাহা এখনও মুলতুবী আছে। তিনি এই মামলা সম্পর্কে কিরূপ প্রাণপণে আশ্চর্য্য-জনক তদ্বির করিয়াছেন, আমি নিম্নে সেইগুলির মধ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিব।

এই সাক্ষীটি (যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জি) আসিয়া বলেন, প্রথমদিন তিনি বাদীকে বারুণী মেলায় কাশিমপুর যাইবার রাস্তায় হস্তিপৃষ্ঠে দেখেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সাব ডেপুটী কালেক্টর মিঃ তমসারঞ্জন (মৃত) এবং কাশিমপুরের একজন কর্ম্মচারী (তাহাকে ডাকা হয় নাই) ছিলেন। মিঃ তমসারঞ্জন তাঁহাকে বলেন যে, সাধুকে যজ্ঞ করাইবার জন্য এবং সারদাবাবুর স্ত্রীর চিকিৎসা করাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। তিনি (যোগেন্‌বাবু) সাধুকে জয়দেবপুর পাঠাইয়া দিতে বলেন; বাদীকে চিনিতে পারেন নাই, ইহাপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, কুমারের ভাগিনেয় বুদ্ধু তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বাদীকে এই সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করাহয় নাই। এই তদ্বিরকারকের হয়ত বিবাদী পক্ষের কৌসলীদিগকে এইসব কথা বলিবার খেয়াল পূর্ব্বে হয় নাই। **আমি এ ব্যক্তির একটী কথাও বিশ্বাস করি না।** আমি সাব্যস্ত করিতেছি যে, অতুল বাবু বাদীকে বাকল্যাণ্ড বাঁধ হইতে লইয়া যান, বাদী পক্ষের এই উক্তি সত্য। কাশিমপুরে কি হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে বিতর্ক আছে। একদিকে বাদীর সাক্ষ্য এবং অপর দিকে অতুল বাবুর সাক্ষ্য: কারণ এই সম্পর্কে মাত্র আর একজন সাক্ষী আছেন, (বাদী পক্ষের ৮৫৭নং সাক্ষী) এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে তথায় উপস্থিত ছিলেন কিনা, তৎসম্পর্কে সন্দেহও আছে। এই সাক্ষীর উক্তিদ্বারা কাশিমপুরে বাদীকে যে কেহ চিনিতে পারিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। কারণ দেখা যায় যে, বাদী সারদা বাবুর সহিত সাক্ষাতের পর কাশিমপুরেও একটী গাছতলায় বাস করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার্য্য যে, বাদীকে কাশিমপুর লইয়া যাওয়া হইয়াছিল,এবং তথা হইতে তাঁহাকে জয়দেবপুর পাঠাইয়া দেওয়া হয়,এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে লইয়া যাওয়া হয় নাই, ততক্ষণ এই সাক্ষীর উক্তির উপর কিছু নির্ভর করে না। যে কারণে মিঃ মেয়ার বাকল্যাণ্ড বাঁধে বাদীর চেহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন, সেই কারণেই বাদীকে কাশিমপুরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; এবং পরে তাঁহাকে জয়দেবপুর পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

চৈত্র জয়দেবপুর যান। তারিখের এই সামান্য গরমিল কি উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে আমি দেখাইব ; কিন্তু ইহাও স্বীকার করেন যে, যেদিন বাদী জয়দেবপুর পৌছেন, সেদিন ৩০শে চৈত্র অথবা ৩১শে চৈত্রই হউক— তিনি সন্ধ্যা ৬টার সময় তথায় পৌছেন। তিনি রাজবাড়ীতে অবতরণ করেন, এবং মাধববাড়ীর কামিনী ফুল গাছের নীচে পোস্তার উপর বসেন। মাধববাড়ী রাজবাড়ীর ভিতরকার ঠাকুরবাড়ী। বাদী তখনও ভস্মমাখা, জটাধারী, ন্যাংটা সাধু। তাঁহার সঙ্গে মাত্র একখানা কম্বল, চিমটা ও কমণ্ডলু ছিল। রায় সাহেব যোগেন্দ্র বাবু ও মোহিনীবাবু এই কাহিনী বর্ণনা করেন। বাদীর আগমনের দিনই তাঁহারা সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছেন, এবং তাঁহাদের এই উক্তি মিথ্যা, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, সাধু ঐ দিন রাত্রিতে, পরদিন এবং তার পরদিন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত জয়দেবপুরে ছিলেন। এই যাত্রা ঠিক কি ঘটিয়াছিল, তৎসম্পর্কে দুইটি বিষয় ব্যতীত গুরুতর বিতর্ক রহিয়াছে।

সাক্ষীগণের মোটামুটি রিপোর্ট

বাদীর এইবারের জয়দেবপুর আগমন সম্পর্কে কমিশনে গৃহীত সাক্ষী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী (৭০), কুলদাসুন্দরী দেবী, বাদীপক্ষের ১৪নং সাক্ষী রামকানাই শীল, বাদীপক্ষের ৮৫২নং সাক্ষী লালমোহন গোস্বামী, বাদীপক্ষের ৯২২নং সাক্ষী সতীশ রায়,৯৩৭নং সাক্ষী অবিনাশ মুখার্জ্জি, বিল্লুবাবু, বাদীপক্ষের ৯৫৮নং সাক্ষী প্রফুল্লকুমার মুখুটী, ৯৭৩নং সাক্ষী সীতানাথ মুখার্জ্জি এবং ৯৭৭নং সাক্ষী সাগরবাবু সাক্ষ্য দিয়াছেন।

এই সব সাক্ষীদের সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। মোক্ষদাসুন্দরী চণ্ডী নিয়োগীর বিধবা পত্নী। চণ্ডী নিয়োগী এই এষ্টেটের নায়েব ছিলেন। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। তিনি জয়দেবপুরেই থাকিতেন। তাঁহার স্বামী ডিহিতে গেলে তখন তিনি তাঁহার স্বামীর সঙ্গে যাইতেন। তিনি কুমারদের মাতা বিলাসমণির সহিত প্রতিবেশিনী হিসাবে মেলামেশা করিতেন। কুলদাসুন্দরী, রাজা রাজেন্দ্রের জ্ঞাতি ভাই প্রসন্ন ব্যানার্জ্জির বিধবা পত্নী। প্রসন্নবাবু রাণী সত্যভামার (রাজার মাতা) এক ভগ্নীর পুত্র। এই প্রসন্ন বাবুর নাম অনেকস্থলে উল্লেখ আছে। প্রসন্ন (ডাক নাম নিক্কা) নামক অপর এক ব্যক্তির নামের সহিত যাহাতে গোলমাল না হয়, এই জন্য তাঁহাকে জংবাহাদুর ডাকা হইত। এই মহিলা তাঁহার বিবাহের পর হইতে (১১ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়।) সারাজীবন জয়দেবপুরেই বাস করিতেছেন। তাঁহার

আমার সম্মুখে বুদ্ধু বাবুর সহিত আমার ভ্রাতার কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই তাঁহারা একটি ঘরের ভিতরে গিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন।

অতঃপর বুদ্ধু চলিয়া গেলেন—কিন্তু যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি (কেশব বাবু) বলিলেন যে, **তাঁহার মাতা সাধুকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহেন**। সাধুকে একথা বলা হইলে তিনি উত্তর দেন, এখন নয়, বৈকাল বেলায় যাইব। ইহার পর সাগরবাবু ও যোগেনবাবু আহার করিতে যান। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখেন যে, সাধু তখনও সেখানে আছেন। আমি যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম, ততই আমার সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। **যোগেন্দ্রবাবুও সেখানে ছিলেন। তিনি এবং আমি প্রায় ৫টা কি ৫॥০ পর্য্যন্ত সেখানে ছিলাম**। এই সময় বুদ্ধুবাবু আসিয়া তাঁহার গাড়ীতে করিয়া সাধুকে লইয়া গেলেন।

এই যে বিবরণ, ইহার সহিত লালমোহনের সাক্ষ্যের সামঞ্জস্য আছে। লালমোহন বলেন যে, ঐ দিবস সূর্য্যোদয়ের সময় তিনি সাধুকে রাজবাড়ীর রাজ বিলাসের দিকে যাইতে দেখেন, গোল বারান্দায় আরোহণ করিতে দেখেন, এবং গায়ে ভস্ম মাখিতে দেখেন। লালমোহন আরও বলেন যে, মধ্যাহ্নকালে তিনি সাধুকে মাধববাড়ীতে দেখিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ প্রদোষ-কালেও তিনি সাধুকে দেখিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত সাক্ষীর উক্তির সহিত বর্ণিত কাহিনীর কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে প্রদোষকালে মাধববাড়ীতে সাধুকে দেখার যে কথা, তাহার সহিত বর্ণিত ঘটনার মিল নাই; কারণ সেই সময়ে বুদ্ধু বাবু আসিয়া সাধুকে লইয়া গিয়াছিলেন। একটা স্বীকৃত তথ্যের সহিত সাগরবাবুর সাক্ষ্যেরও মিল হয় না। সেই দিন—অর্থাৎ আগমনের দিন অপরাহ্নে **বাদী সহকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবুর বাড়ীতে গমন করেন; ইহা একটা সর্ব্বসম্মত ভিত্তি**। ইহার সহিত যে বর্ণনার মিল নাই, তাহা গ্রহণ করা যায় না।

সীতানাথ বলেন, তিনি সেদিন বাদীকে সহকারী ম্যানেজারের বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ডায়েরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, সেদিনের তারিখ ছিল ১৩-৪-২১ ইরাজী এবং বাঙ্গালা ৩১শে চৈত্র। সহকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবুও বলেন, **বাদী সেদিন বৈকালে আন্দাজ পাঁচটার সময় তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন**। ইহাও সর্ব্বসম্মত একটা ভিত্তি। সাক্ষী সতীশ রায়ের মতে, তথা হইতেই সাধুকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

উঠেন, বারান্দা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া ২য় কুমারের ঘরের নিকটে উপস্থিত হন, দরজার খড়খড়ি তুলিয়া ধরিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অতঃপর আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পায়খানায় প্রবেশ করেন। এই পায়খানার বর্ণনা পূর্ব্বে দিয়াছি। তারপর বাথরুমে আসিয়া একটা কলের তলায় বসিয়া স্নান করেন। বাহির হইয়া আসিয়া সাধু চিলাই নদীর তীরবর্ত্তী শ্মশানেশ্বরী মন্দিরে গমন করেন। তথা হইতে তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে আসেন। এই দিবস প্রাতে বৃদ্ধা মহিলা **মোক্ষদাও তাহাকে দেখিতে পান।** তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, একজন সাধু আসিয়াছেন, **দেখিতে দ্বিতীয় কুমারের মতন।** এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। মোক্ষদা কি দেখিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এই :—

বৃদ্ধা মোক্ষদা দেবীর সাধু দর্শন

আমার কন্যা, আমার পুত্রবধূ এবং আমি সাধুকে মাধববাড়ী যাইতে দেখি। আমরা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ দেখিতে পাই। তাঁহার চলিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমার প্রাণে পুলকের সঞ্চার হয়। আমার **মনে হইল ইহা দ্বিতীয় কুমারের চলিবার ভঙ্গী।** তিনি চলিয়া যাইতে লাগিলেন, এবং আমরা তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি যখন মাধববাড়ীর ঘাটে গিয়া জলে নামিলেন আমি তখন মাধববাড়ীর দক্ষিণ দিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। কুমার আসিলেন এবং কামিনী ফুল গাছের পাশে একটি মাদুরে বসিলেন। সম্মুখে একটা ধুনী জ্বলিতেছিল। তিনি উহা টানিয়া লইয়া নিজের সম্মুখে রাখিলেন। তাঁহার কাঁধে একখানি তোয়ালে ছিল। তিনি উহা লইয়া মুখ মুছিয়া নীচে নামাইয়া রাখিলেন। আমি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, দেখিলাম সেই **একই মুখ, একই চোখ, একই চিবুক, একই কটা রঙের গোঁফ, আমার বড়ই সন্দেহ হইল, হয়ত ইনিই দ্বিতীয় কুমার।** সেখানে অনেক লোক থাকায় তখন আমি আর তাঁহার কাছে যাইতে পারিলাম না।”

ইহা একটি আবিষ্কার বলিয়া আমার মনে হয় না। এই স্মৃতিশক্তি শিক্ষার চাপে নত হয় নাই। একথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তাহার মনে যত সন্দেহই হউক না কেন, সে বাদীকে ঠিক চিনিতে পারে নাই।

বাদী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে

মধ্যাহ্ন প্রায় ১২টার সময় সাধু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে আসিলেন। এই পথে আসিবার শেষ দিন যে তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে

পিঠও নজর দিয়া দেখিলাম। আমি তাঁহার পা ও পায়ের পাতা এবং পায়ের আঙ্গুলও পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। আমার বেশ স্মরণে ছিল যে, আমার মেজো ভাইয়ের নখ এবং পায়ের আঙ্গুল কেমন ছিল কি করিয়া ভুলিব,—আমরা যে ছোটবেলা হইতে এক সঙ্গে থাকিয়াছি। তাঁহার সমস্ত দেহ,—হাত, পা, মুখ এমন কি, চোখের পাতাটী পর্য্যন্ত বিভূতিমণ্ডিত ছিল। তাঁহার চুল লম্বা ছিল। তখন তাঁহার মুখে দাড়ি ছিল। দ্বিতীয় কুমার যখন দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন, তখন দাড়ি রাখিতেন না। আলোচ্য দিনে তাঁহার উচ্চারণ অস্পষ্ট ছিল। **তাঁহার কণ্ঠস্বর দ্বিতীয় কুমারের মতই শুনাইতেছিল**।

আর আর যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেদিন তাহারা সকলেই সাধুর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। কি আলাপ করা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। তাঁহার খাওয়া হইলে, আমরা খাইতে বসি। আমাদের যখন দেখা শেষ হইল, তখন বেলা অপরাহ্ণ ৩টা। অষ্টমী স্নান উপলক্ষে ঢাকা যাইবার জন্য সন্ন্যাসী বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন। **সন্ন্যাসী যে আমার সহোদর ভ্রাতা—এ ধারণা ক্রমেই আমার মনে বদ্ধমূল হয়**। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য আরও কয়েক দিন সন্ন্যাসীকে রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তাহাকে কয়েক দিন রাখিয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল যে, তাহার গায়ে সেই সাবেক দাগগুলি আছে কি না; আমি তাহাকে বাঙ্গালা ভাষায়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তুমি ঢাকা যাইয়া কতদিন থাকিবে?" সন্ন্যাসী বলিয়াছিল,—"সম্ভবতঃ দশদিন।" তারপর-আমার ছেলের টম্‌টমে চড়িয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করে। চলিয়া যাইবার সময়, আমি আমার ছেলেকে গাড়ী চালাইতে দেখিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া আমার ছেলে আমাকে কি যেন কতগুলি কথা বলিয়াছিল।"

সন্ন্যাসী যে ঐ দিন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে ছিল এবং অপরাহ্ণ ৪টার সময় সন্ন্যাসী ঐ বাড়ী হইতে চলিয়া যায়, **সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই**। এ সম্বন্ধে কয়েকটী দলিল থাকার দরুণ (যথা মিঃ নিডহামের রিপোর্ট ৫৯নং একজিবিট দ্রষ্টব্য), ইহা কোনক্রমেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐপ্রসঙ্গ আমি অল্প পরেই আলোচনা করিব। বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য আরম্ভ হইবার পর, যে বিষয় তাঁহারা অস্বীকার করিতে থাকেন, তাহা এই যে,—**সন্ন্যাসী ঐ দিনের পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ, (৩১শে চৈত্র নহে), জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে যান**। এতদ্দ্বারা বিবাদীপক্ষ 'ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, সন্ন্যাসী ২রা বৈশাখ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে ছিলেন।

বিবাদীপক্ষের মন্তব্য

৩১শে চৈত্রই হউক অথবা ১লা বৈশাখই হউক, যে দিনই হউক, সাধু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে উপস্থিত হইবার পর, যাঁহারা সাধুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, সেই সকল সাক্ষীকে বাদ দিয়া, মিঃ চৌধুরী অথবা বিবাদিগণ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জেরার সময়, তাঁহার মুখদিয়া মামলার এই অংশ সম্পর্কীয় কথাগুলি বলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যথা :—

প্রশ্ন—বুদ্ধুর স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূর করিবার উদ্দেশ্যে এবং ফেনীর চোখের জন্য ঔষধ লইবার অভিপ্রায়ে আপনি ১লা বৈশাখ আপনার চক্করের বাড়ীতে সাধুকে আনাইয়া ছিলেন ?

উত্তর।—না, কখনই না।

প্রশ্ন—যখন সাধু আহারে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি থালার উপর হইতে খাদ্য-সামগ্রী লইয়া বাটীর মধ্যে মাখিয়া খাইয়াছিলেন এবং খাওয়া শেষ হইলে বাটীগুলি থালার উপর হইতে লইয়া মেঝেয় রাখিয়াছিলেন ?

উত্তর—না। পাথরের থ লায় করিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছিল, থালার উপর বাটী সাজাইয়া দেওয়া হয় নাই।

মিঃ চৌধুরী, তারিখ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি সন্ন্যাসীর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে উপস্থিতির, এবং অবস্থানের দুই তারিখ সম্বন্ধেও কোন প্রশ্ন করেন নাই। তিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর দ্বারা যাহা স্বীকার করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এই যে—ঐ দুই দিনের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, কেবল তাহাই নহে, তিনি তাঁহার প্রশ্নের মধ্যে তারিখের উল্লেখ করিয়া, যে তারিখের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুনরায় প্রশ্ন করিয়াছেন যে,—১লা বৈশাখ রাণী সত্যভামা দেবী সাধুকে প্রণাম করিয়া প্রণামী স্বরূপ তিনি (রাণী সত্যভামা) সাধুকে দুইটী টাকা দিয়াছিলেন, এ বিষয় সত্য কিনা ?

ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ১লা বৈশাখ সাধুকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। সাধু সেখানে আহারাদি করেন—একথা অনেকে বলিয়াছেন। তখন রাণী সত্যভামা সেখানে ছিলেন, বিবাদীপক্ষ তাহাও সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইহাও স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, সাধু অল্প সময়ের জন্য পূর্ব্বদিন সেখানে গিয়াছিলেন। বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, সন্ন্যাসীর চেহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং পাঞ্জাবী·

বুদ্ধুকে বলেন। কালা, বুদ্ধু ও জিতেন্ সন্ন্যাসীকে শৈবলিনীর বাড়ীতে আনে। শৈবলিনী বিবাদী পক্ষে সাক্ষী দিয়াছেন! তিনি সবই স্বীকার করিয়াছেন, তবে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কর্ম্মচারী জিতেনের নাম তিনি উল্লেখ করেন নাই।

শৈবলিনীর বাড়ীতে বাদী

ইহা সত্য যে, শৈবলিনীর পুত্র কালা এবং বুদ্ধু বাদীকে সন্ধ্যার পর শৈবলিনীর বাড়ীতে আনিয়াছিল। এখানে শৈবলিনীর ও ফণীবাবুর মাসীমা কমলকামিনী, কয়েকটী মেয়ে এবং কুমারের কনিষ্ঠা ভগ্নী মটর, তাঁহাকে দেখিয়াছেন। শৈবলিনী এই সব স্বীকার করিয়াছেন, তবে মটর গিয়াছিল কিনা তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনে নাই বলিয়াছেন। আমি মনে করি, তিনি তথায় গিয়াছিলেন।

কেন সন্ন্যাসীকে তথায় নেওয়া হইয়াছে? শৈবলিনী বলিয়াছেন যে, কালার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূর করিবার জন্য তাঁহাকে নেওয়া হইয়াছে। কালার এক পুত্র ছিল। স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর দুই বৎসর পর (১৮-৪-১৭ তারিখে স্বর্ণময়ীর মৃত্যু হয়) অর্থাৎ ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে কালার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। উক্ত মহিলাকে উহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। তৎপর তিনি জরায়ু রোগের কথা তোলেন, এবং বলেন যে সন্ন্যাসী কিছু করিতে পারেন নাই। এইগুলি সবই মিথ্যাকথা। মটর এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কেন তথায় গিয়াছিলেন? জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সন্ন্যাসীকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিতেন, ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়। সেই জন্যই তাঁহারা তথায় গিয়াছিলেন। স্বর্ণময়ীর কন্যা এবং ফণিবাবুর মাসীমা কমলকামিনী দেবী বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তিনি সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, তিনি শৈবলিনীর বাড়ীতে **বাদীকে দেখিয়াছেন, তিনিও সন্ন্যাসীকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন।** সন্ন্যাসী তথায় আধঘণ্টার মত ছিলেন। তাঁহার পরণে সেই পোষাক, লেংটী ছিল, এবং তাঁহার লম্বা জটা ও দাড়ি ছিল।

সাধুকে জয়দেবপুরে কে আনিল

ইহার পর যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। ৩০শে এপ্রিল সন্ন্যাসী জয়দেবপুরে পৌছেন, এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। কে তাঁহাকে তথায় আনিয়াছে, তাহা লইয়া গণ্ডগোল বাধিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন যে, সন্ন্যাসীকে তাঁহার বাড়ীতে আনিবার জন্য তিনি অতুলবাবুকে পাঠাইয়াছিলেন; অতুলবাবু তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনিও ঐ

মাখিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও আপনি তাহা করিয়াছেন ; আগামীকল্য আপনি আর গায়ে ভস্ম মাখিবেন না।

"পরদিন (৩রা মে) যখন তিনি (বাদী) স্নান করিতে যান, তখন পুরাণ খানসামা আনন্দ ও নগেন ভট্টাচার্য্য (বাদীপক্ষের ৮০৬নং সাক্ষী) তাঁহার সঙ্গে যান। ঐ দিন তিনি ভস্ম মাখেন নাই। তখন আমি তাঁহার গায়ের রং লক্ষ্য করি। **পূর্ব্বে মেজকুমারের গায়ের রং যেরূপ ছিল, বাদীর গায়ের রংও সেইরূপই লক্ষ্য করি, বরং ব্রহ্মচর্য্য পালন করায় তাঁহার রং আরও ফরসা হইয়াছে।** তারপব ভস্মমুক্ত মুখের দিকে চাহিয়া **তাঁহাকে রমেন্দ্রের মত মনে হইল।** তাহার গায়ের রংএর অপেক্ষা চোখের পাতা কালো, ইহাও আমি লক্ষ্য করিলাম। **গাড়ীর চাকা চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার পায়ে যে দাগ হইয়াছিল, আমি তাহাও দেখিলাম ;** আমি তাহার **কব্জির চামড়া খস্‌খসে দেখিলাম। আমার ঠাকুর মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন—যেমন আমি তাঁহাকে চিনিয়াছি।**

সাক্ষী অতঃপর বলেন, যে সব প্রাচীনা স্ত্রীলোক কুমারকে চিনিতেন, তাহারা, বহু প্রতিবেশী, এবং নিকটবর্ত্তী প্রজাবৃন্দ অনেকেই ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। **তাঁহারা সকলেই বলেন "সাধুই কুমার"।** যে সব প্রজা উপস্থিত ছিল, তাহাদের সংখ্যা ১০০ কি ১৫০ হইবে।

৩রা মে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মেজকুমারের শরীরে যে সব চিহ্ন ছিল, সেই সব চিহ্ন সাধুব শরীরে পাওয়া যায় কিনা, তাহা দেখিবার জন্য তিনি তাহার পুত্রকে বলেন। কিন্তু সাধু তাহাতে রাজী হন না।

পরদিন ৪ঠা মে বুদ্ধ সন্ন্যাসীর শরীরেব চিহ্ন দেখিতে চেষ্টা করেন এবং ঐদিন তিনি কোন আপত্তি করেন না। তিনি তাহার পুত্র ও জব্বরকে যে সব চিহ্ন দেখার কথা বলেন, সেই সব চিহ্ন বাহির করেন। **প্রাতঃকাল ৭টার সময় এই সব কাজ হয়** এবং তখন বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত ছিল না। সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি যদি সন্ন্যাসীকে চিনিয়াই থাকিবেন, তাহা হইলে তিনি আর চিহ্ন দেখিলেন কেন ? তদুত্তরে তিনি বলেন যে, "**আমি নিঃসন্দেহ হইবার জন্য ঐ সব চিহ্ন দেখিতে বলি।**"

ঐ দিনই প্রাতঃকাল ৯টার সময় লোকজন আসিতে থাকে। বাদীর সন্ধ্যা সমাপনান্তে যখন আঙ্গিনায় লোকজন আসিয়াছে, তখন আমি বাদীর সহিত আলাপ করি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি—"**আপনার গায়ের**

চিহ্নসমূহ ও চেহারা আমার মেজ ভাইয়ের মত, আপনি নিশ্চয়ই রমেন্দ্রনারায়ণ হইবেন। আপনি আপনার পরিচয় প্রকাশ করুন।

তিনি বলেন,—"না, আমি রমেন্দ্রনারায়ণ নহি। কেন আমাকে বিরক্ত করেন। আমি চলিয়া যাইব। ইহাতে আমি বলি,—"আপনি কে, ইহা আপনাকে বলিতেই হইবে। আপনার অস্বীকার করিলে চলিবে না।"

আমি আমার পুত্রকে বলি,—"উপস্থিত লোকদিগকে বল যে, মেজকুমারের শরীরের সমস্ত চিহ্নই এই সাধুর শরীরে রহিয়াছে। আমার পুত্র ও আমার বোন-পো এ কথা সকলকে বলে। আমি চিকের আড়ালে দাড়াইয়াছিলাম।

এদিন আমার ভাই—এই বাদী, প্রজাদের মধ্যে যাইয়া বসে এবং তাহারা, তিনি কে, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। আমিও তাহাকে বলি, তিনি কে, ইহা প্রকাশ না করিলে আমি আহার করিব না।" সাধু বলেন যে, তিনি রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। তখন অপরাহ্ণ ৪টা কি ৫টা হইবে। জনতার নিকট তাঁহার (সাক্ষীর) ঘরের সম্মুখের চটানে বসিয়া বাদী কি ভাবে তাহার আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন, সাক্ষী তাহা বর্ণনা করেন।

অন্যান্য বহু স্ত্রীলোকের সঙ্গে তিনি বারান্দায় বসিয়াছিলেন। বাদী বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে বসিয়াছিলেন। কেহ বাদীকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনার নাম কি?" তিনি বলেন—রমেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী। পিতার নাম কি?—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। মাতার নাম কি? রাণী বিলাসমণি।

জনতার ভিতর হইতে কেহ তাঁহাকে ঐসব প্রশ্ন করিয়া থাকিবে এবং বাদী তাহার উত্তর দেন, অতঃপর কেহ বলে—"রাজা ও রাণীর নাম সকলেই জানে—আপনাকে লালনপালন করিয়াছিল কে? বাদী উত্তরে বলেন—"অলকা"।

তখন জনতা "মধ্যম কুমারের জয়" বলিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে এবং স্ত্রীলোকগণ "হুলুধ্বনি" করেন। বাদী একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন এবং তাহার 'ফিট' হইবার মত হয়। আমি দৌড়াইয়া তাহার নিকট যাই। ঐ সময় অনুমান ২ হাজার কি ৩ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। আমি যখন বাদীর নিকট যাই, তখন মগ্নমালা আমার সঙ্গে ছিল।

সাক্ষী বলিয়াছে যে, এই 'মামা' ডাকা এবং 'মেজকুমার' বলিয়া ডাকা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়। বাহিরে লোক কেহ ছিল না, অপরাহ্নে ১৫।২০ জন লোক মাত্র আসিয়াছিল। ইহার পর লোকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সাক্ষীর এই কাহিনীর সহিত ইহার আলঙ্কারিক অংশ বাদ দিলে, অপর পক্ষের কথা মিলিয়া যায়। বাদী ঐ বাড়ীতে তিন দিন ছিলেন, প্রত্যহ চিলাই নদীতে স্নান করিতে যাইতেন এবং চতুর্থ দিন তিনি (বাদী) তাঁহার আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি লেংটী ত্যাগ করিয়া ধুতি পরেন। (অপরের মত)। এবং তাহাকে মামা বলিয়া ডাকা হয়। সত্যভামা দেবী ঐ বাড়ীতে তখন ছিলেন। সাক্ষী তাহা অস্বীকার করেন না, এবং তিনি যে মাঝে মাঝে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাস করিতেন, তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই।

ঔষধ দেওয়া সাধু

"ঔষধ দেওয়া সাধু"—এই মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একজন সাক্ষী আসিয়া বলে, সে একদিন ঐ সময় লেংটী পরা একজন সাধুকে চটানে বসিয়া থাকিতে দেখে, এবং তাহার নিকট বাতের ঔষধ চাহে, কিন্তু সাধু বাঙ্গালা বুঝিতে না পারায় বৃদ্ধ হিন্দিতে তাহাকে ঐ কথা বলিলে, তিনি তাহাকে একটী ঔষধ দেন (বিবাদী পক্ষের ১০৮ নং সাক্ষী) ইহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ফণীবাবু বলেন, তিনি ঐ তিন দিনের কোন একদিন সাধুকে চটানে একটী আমগাছের নীচে বসিয়া থাকিতে দেখেন। সাধু নানা লোককে ঔষধ দিতেছিলেন। তাহাকে দুই একবার হিন্দীতে কথা বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, ঐ সময় বাদী 'মেজকুমার', এই সন্দেহ কাহারো মনেই জাগে নাই এবং লোকজন কেহ তাহাকে দেখিতে আসে নাই।

আমি শুধু শুনিয়াছিলাম যে, সন্ন্যাসী পুনরায় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে গিয়াছেন; তিনি যে পুনরায় তথায় গিয়াছেন, তাহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। আমি মনে করিলাম, তিনি কাহারও পীড়ার চিকিৎসা করিতে গিয়াছেন, সন্ন্যাসীর পুনরাগমনকে আমি এমন কোনও সংবাদ বলিয়া মনে করি নাই, যাহা লোকের কাছে বলা আবশ্যক।" এই দুইজন সাক্ষী আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মাত্র ৪ঠা তারিখ অপরাহ্নে শুনিতে পান, সাধু নিজেকে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার বলিতেছেন। এই মর্ম্মে আরও সাক্ষ্য দেওয়ান হইয়াছে যে, এই সংবাদে এমন কোনও চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় নাই,—যাহা উল্লেখযোগ্য।

বলিতেছে, তিনিই মেজকুমার। তাঁহার উপস্থিতিতে এই অঞ্চলে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে।

গতকল্য সন্ধ্যাকালে কয়েক শত প্রজা সাধুকে তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি বলেন, তাঁহার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, তাঁহার পিতার নাম রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং তাঁহার ধাত্রীর নাম অলকা ধাই। ইহা বলিয়াই সাধু অচৈতন্য হইয়া পড়েন, উপস্থিত লোকেরা হুলুধ্বনি ও জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। তখন সেখানে যত লোক উপস্থিত ছিল, তাহাদের সকলের মনেই নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, তিনিই মেজকুমার; যে সকল প্রজা উপস্থিত ছিল, তাহারা বলিতে থাকে যে, এষ্টেট যদিও তাঁহাকে কুমার বলিয়া গ্রহণ না করে, তথাপি তাহারা তাঁহাকে কুমার বলিয়া গ্রহণ করিবে ও তাঁহার সহিত কুমারের ন্যায় ব্যবহার করিবে। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পরলোকগতা ইন্দুময়ী দেবীর এবং শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীর লোকেরা মোহিনী বাবুকে ও মিঃ ব্যানার্জ্জীকে বলে, সাধু এই এই বলিয়াছেন। তাঁহার তৎক্ষণাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে গিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করেন সাধু তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই। আজ প্রাতঃকালেও তাঁহারা তথায় গিয়াছিলেন, কিন্তু সাধু তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি অপরাহ্ণে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। বাড়ীর লোকেরা সাধুকে ভয় দেখাইয়া বলেন, তিনি বাক্যে ও আচরণে মেজকুমার বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ পরিচয় ও অতীত ইতিহাস বর্ণনা না করিয়া ঐস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এমন অবস্থায় এই সাধু সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তদন্ত হওয়া আবশ্যক। প্রাতঃকাল হইতে বিশাল জনতা সাধুকে দেখিতে আসিতেছে; এরূপ তীব্র চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে যে, অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে গুরুতর পরিণতি ঘটিতে পারে।

এই বিষয়ে আপনার নির্দ্দেশের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি

এফ্, ডবলিউ, নীডহাম।

শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবীর নিকট কপি পাঠান হইল।

এফ্, ডবলিউ, নীডহাম, ম্যানেজার।

এই সংবাদ মেজরাণী এবং অপর দুই রাণীকেও জানান হয়, বড় রাণী এই পত্রের যে কপি দাখিল করিয়াছেন, তাহা বাদী প্রমাণ করিয়াছেন। বিবাদীপক্ষ প্রথমে এই পত্র দাখিল করেন নাই, কিন্তু এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার যখন স্বীকার করিলেন যে, মেজরাণীর নিকটও এই পত্রের কপি পাঠান

তারিখ হইতে অর্থাৎ যে তারিখে ঐ পত্র লেখা হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে যে বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছিল, তাহা মোহিনীবাবু নিজে জানিতেন; পত্রে বর্ণিত চাঞ্চল্য ও বিপদ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে উহা মতামতের কথা, অর্থাৎ উহা কিছুই নহে।

সাধু কর্ত্তৃক ঔষধ দেওয়ার কথা লইয়া মোহিনীবাবু মাথা ঘামাইতেছিলেন। পূর্ব্বে কেহই তাঁহাকে কুমার বলিয়া সন্দেহ করে নাই, এবং তিনি যখন কুমার বলিয়া পরিচয় দেন, তখনও শুধু মৃদু চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, জেরায় তিনি বলিয়াছেন যে, ৫ই তারিখ হইতে ১০।১৫ জন করিয়া লোক সাধুকে দেখিতে যাইতেছিল। উহার পূর্ব্বে শত শত লোক সাধুকে দেখিতে যাইতেছিল কি না, তাহা তিনি জানেন না,—বুদ্ধু ও জব্বু প্রভৃতি তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। জয়দেবপুর একটি ছোট গ্রাম, ঐরূপ গ্রামে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিচিত, তদুপরি বুদ্ধুর বাড়ী, এষ্টেটের কর্ম্মচারীদের বাড়ী এবং ডিহি কাছারী, রাজবাড়ীতে যাইবার রাস্তার উপর অবস্থিত। যদি বুদ্ধু বলিত যে, চক্করে আগ্নেয়গিরি উঠিয়াছে! এবং উহা যদি বুদ্ধুর অসত্য উক্তি হইত, তবে রিপোর্টে নিশ্চয়ই তাহা উল্লিখিত হইত না।

থানার রেজেষ্টরী

কিন্তু যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ঐরূপই বটে। জয়দেবপুর থানার জেনারেল রেজিষ্টারে যাহা লেখা আছে, এখন তাহা দেখা যাউক।

জয়দেবপুর থানার তৎকালীন দারোগা ঐ রেজিষ্টার প্রমাণ করিয়াছেন। জেনারেল রেজিষ্টারে দেখা যায়ঃ—

৪-৫-২১, বেলা ৯টা—জটাধারী সুদর্শন সাধু কয়েকদিন ধরিয়া বুদ্ধুবাবুর বাড়ীতে আছেন। সাধুর নাম ও নিবাস অজ্ঞাত। বহুলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে। অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যে, এই সাধুর আকৃতির সহিত পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্রের আকৃতির সাদৃশ্য আছে। জনসাধারণের বিশ্বাস যে, দ্বিতীয়কুমার মারা যান নাই। গত বার বৎসর ধরিয়া তিনি নানাস্থানে ঘুরিতেছিলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়ী ফিরিয়াছেন (একজিবিট ২৩১)

লক্ষ্য করিবার বিষয়, ৪ঠা মে, যেদিন আত্মপরিচয় দেন উহার পূর্ব্বদিন থানার জেনারেল ডায়েরীতে ইহা লেখা হইয়াছে।

৫-৫-২১, বেলা ৩টা—আকাশে মেঘ নাই এই। এলাকায় কোনও

জব্ব ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে বুঝেন। তিনি বলেন, বাড়ীর লোক প্রভৃতি **সকলেই সাধুকে মেজকুমার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে**। ঐ মর্ম্মে তিনি শুনিয়াছিলেন। তিনি মেজকুমারকে অন্যান্যের মতই চিনিতেন। সাধু প্রথমবার যখন জয়দেবপুর গিয়াছিলেন, তখনও তিনি সাধুকে দেখিয়াছিলেন; তিনি সাধুর চেহারাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার চক্ষুর রং ছিল কটা। সাধুই মেজকুমার বলিয়া যে জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সেই কথা তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, তিনি নিজেও নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, সাধুই মেজকুমার, যদিও তিনি তোতাপাখীর ন্যায় পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নাই। যদি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বাদীকে মেজ-কুমার বলিয়া সত্যসত্যই বিশ্বাস করিয়া থাকেন, অথবা যদি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে যে, বাদী ও মেজকুমারের কথাবার্ত্তা এবং মানসিক বৃত্তি পৃথক হইলেও উভয়ের মধ্যে আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা হইলে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ভুল করিয়া থাকিলেও, তিনি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, বাদীই মেজকুমার। দেখা যায় যে, রিপোর্টে এমন কথা বলা হয় নাই যে, সাধুকে মেজকুমারের মত দেখা যায় না, অথবা তিনি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা বলিতেছিলেন। সাধু যখন প্রথমবার জয়দেবপুরে যান, তখন রায়সাহেব ও মোহিনীবাবু উভয়েই তাহাকে কথা বলিতে শুনিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইহা রিপোর্টে বলা হয় নাই যে, বাদীকে মেজকুমারের ন্যায় দেখা যায় না, অথবা বিবাদী পক্ষের অধিকাংশ সাক্ষীই যেরূপ বলিয়াছে, বাদীকে দেখিয়াই বলা যায় তিনি মেজকুমার নহেন। রিপোর্টে শুধু বলা হইয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত আবশ্যক।

জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য বা শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ আবশ্যক, এমন কথা রিপোর্টে বলা হয় নাই। মোহিনীবাবুকেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, রিপোর্টে বর্ণিত বিষয় তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না। তিনি মেজকুমারকে দেখেন নাই; কিন্তু যখন রিপোর্ট রচনা করা হয়, তখন তিনি ও রায় সাহেব একত্র ছিলেন। তিনি বলেন, ৪ঠা মে রাত্রিতে তিনি মিঃ নীডহ্যামের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পরদিন রিপোর্টে যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহা তিনি মিঃ নীডহ্যামের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, মিঃ নীডহ্যাম তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও উহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি পরে বলেন, তিনি উহা বিশ্বাস করেন নাই। তারপর তিনি বলেন, বিশ্বাস করার

বা অবিশ্বাস করার কোনও সময় ছিল না। ব্যাপার জরুরী ও সাংঘাতিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই কথা বলিবার সময় তিনি সাময়িক কালের জন্য ভুলিয়া গেলেন যে, রিপোর্টে যাহাই লেখা থাকুক, সাক্ষ্যদানের সময় তিনি ব্যাপারটীকে অকিঞ্চিৎকর, প্রমাণ করিতে চাহিয়া ছিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি বলেন, তিনি রিপোর্টের এক কথাও বিশ্বাস করেন নাই, উহার সমস্তই নিছক বাজে, কিন্তু তিনি মিঃ নীডহামকে এমন কথা বলিলেন না, বরং এই বাজে কথাই সাজাইয়া গুছাইয়া তিনি এক রিপোর্ট রচনা করিলেন, এবং কালেক্টরের নিকট উপহাসচ্ছলে তাহা প্রেরণের জন্য তাহাতে মিঃ নীডহামের স্বাক্ষর লইলেন। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, রিপোর্টে সাধুর প্রথমবার জয়দেবপুর গমনের কথা প্রসঙ্গে সেই কুখ্যাতি ও কাল্পনিক চা'য়ের মজলিসের কোনও উল্লেখ করা হয় নাই। বাদী যে সেই চায়ের মজলিসে বলিয়াছিলেন, তিনি একজন পাঞ্জাবী, তাহারও কোনও উল্লেখ করা হয়ই নাই।

উল্লিখিত ঘটনা যিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, আলোচ্য রিপোর্ট তাঁহারই লেখা। উহাকে প্রাথমিক এজাহার বলিয়াই যদি ধরিয়া লওয়া যায়,—অবশ্য মোহিনীবাবু ঐরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াই উক্ত রিপোর্টের প্রামাণ্য নষ্ট করিয়াছেন,—তাহা হইলেও উক্ত ঘটনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার রিপোর্ট এমন একজন লোককে দেওয়া উচিত ছিল, যিনি উহার মধ্যে কোনও অসত্য থাকিলে তাহা বুঝিতে পারিতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সত্যতা নির্ণয়ে প্রয়াস পাইতেন এবং সকল অবস্থার তদন্ত করিয়া নিজে সন্তুষ্ট হইয়া জেলার কালেক্টরের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য যথার্থ রিপোর্ট লিখিতে বসিতেন।

বাদীর আত্ম পরিচয় দান

বাদী পক্ষের জবাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলা হইয়াছে যে,—ভগিনিগণ কুমার বলিয়া সাব্যস্ত করিবার জন্য একজন পাঞ্জাবী সন্ন্যাসীকে খাড়া করিয়াছিলেন, ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ কুলোকগণ চক্রান্ত করিয়া সেই সন্ন্যাসীকে কুমার বলিতেছিল এবং কলিকাতার কয়েকজন তাঁহাকে কুমার বলিয়া দাঁড় করাইয়াছিল,—বড় রাণীর জেরার সময় বিবাদীপক্ষ সে সম্বন্ধে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিবাদী পক্ষের পূর্ব্বোক্ত যুক্তিই খণ্ডন হইয়াছে। তারপর বিবাদীপক্ষের আর এক যুক্তি এই যে,—সন্ন্যাসী একজন চিকিৎসক। এ যুক্তিও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব দূর করিবার জন্যই যে তাঁহাকে চিকিৎসকরূপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া

হয় এবং জয়দেবপুর হইতে তাহার অস্তিত্ব যদি একেবারে লোপ করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাদী আদালত পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেও, সাফল্য লাভ করিবেন কি না, এবং তাহার ফলই যে কি হইবে, তাহা যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বুঝিতে পারিবেন না, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয়। উন্মাদগ্রস্ত না হইলে কেহ চিন্তায়ও এ বিষয় আনিবেন না; উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন এরূপ চেষ্টায় কেহ যোগ ও দিবেন না, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাহা করিয়াছিলেন। ৭ই জুন সন্ন্যাসী জয়দেবপুর পরিত্যাগ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি সন্ন্যাসীকে পরিত্যাগ করেন নাই। সেদিন হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নির্ব্বাসিতার ন্যায় বাস করেন।

ভগ্নীদিগের দ্বারা সনাক্ত-করনের কথা

নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া বিতর্ক করা বৃথা। আমার ধারণা, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল—বাদী তাহারভ্রাতা। এক্ষণে দেখা আবশ্যক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সেই বিশ্বাস বাদীকে সত্য সত্য ভ্রাতা বলিয়া চিনিবার ফলে জন্মিয়াছিল কি না। মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলেন, :—ভগ্নিগণ বাদীকে ভাই বলিয়া সত্যসত্যই চিনিতে পারিয়া ছিলেন বলিয়াই, বাদীকে এতদূর পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছেন। পুনরুক্তি ক্ষেত্রে সেইরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ভগ্নিগণের দৃঢ় বিশ্বাসই চূড়ান্ত প্রমাণ নহে, যদিও তাহা সম্পূর্ণ অসাদৃশ্যের যুক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। ভগ্নীদের দ্বারা এ সনাক্ত নিঃসন্দেহে বাদীকে অনেকটা অগ্রসর করায় বটে; কিন্তু মৃত্যুঘটার সামান্য একটি মাত্র প্রমাণ, স্বতন্ত্র প্রকারের মানসিক ভাবের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এবং বাদীর অবাঙ্গালীত্ব বিষয়ক একটি মাত্র যুক্তি বাদীকে মামলার পটভূমি হইতে একেবারে বিদূরিত করিবে।

রিপোর্টের কথা

গত ৪ঠা মে বাদীর পরিচয় ঘোষিত হইবার পর যে ঘটনা ঘটে, তাহা আমার মতে সত্য, এবং ভগ্নীদের দৃঢ় বিশ্বাস উদয় হওয়া সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সিদ্ধান্ত হইল, তদ্বারা তাহাও সমর্থিত হয়। ৫ই তারিখে মিঃ নিডহ্যামের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট প্রেরিত হয়। ঐ রিপোর্টের এক একটী নকল প্রত্যেক রাণীর নিকট পাঠান হয়। মোহিনীবাবু এসকল বিষয় স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্ট নিশ্চয়ই ৬ই মে কলিকাতায় পৌছিয়াছিল। কারণ পোষ্ট অফিসের শিলমোহরে দেখা যায় (৩৯৮নং একজিবিট) জয়দেবপুর পোষ্ট অফিসে ঐ রিপোর্ট ৫ই তারিখে পোষ্ট করা হইয়াছিল। তাহা হইলে

কলিকাতায় উহা ৬ই মে বিলি হইয়াছিল। সে দিন শুক্রবার। ৭ই তারিখে কলিকাতায় "ইংলিসম্যান" পত্রিকায় (৪০০ একজিবিট)। 'এসোসিয়েটেড প্রেসের' প্রেরিত 'ঢাকা সেক্সেশন' শীর্ষক এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। মিঃ নিউহ্যামের পত্র বা টেলিগ্রাম পাইয়া সত্যবাবু কি করিলেন ? তিনি তাঁহার ভগ্নীকে তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। ভগ্নী তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তিনি সে সম্বন্ধে মৃদুভাষায় আলোচনা করিলেন কুমারের চেহারার সহিত বাদীর চেহারা স্বতন্ত্র না দেখাইলেও সত্যবাবু কি জয়দেবপুরে যাইয়া সে লোকের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—সত্যবাবুকে তিনি চিনেন কিনা, অথবা দুই চারিটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আগন্তুককে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ? সত্যবাবু তাহা করেন নাই। তিনি রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ লেথব্রিজের নিকট গমন করেন ও মধ্যম কুমারের মৃত্যু সংক্রান্ত যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ নিরাপত্তায় রাখিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়া ইনসিওরেন্সের টাকা উঠাইবার যে, এফিডেভিট করা হইয়াছিল, সেই এফিডেভিটের একটি নকল মিঃ লেথব্রিজকে অর্পণ করেন। সত্যবাবুর সাক্ষ্যে প্রকাশ, তিনি মিঃ লেথব্রিজকে এই বলিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ইনসিওরেন্সের মূল কাগজ এবং অন্যান্য মূল দলিল যেন অবিলম্বে সংগ্রহ করা হয়। মিঃ লেথব্রিজ স্বীকৃত হন। তিনি ঐ সকল দলিলের নকল ঢাকায় কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ সকল দলিলের মধ্যে ১৯০৯ সালের ৭ই জুলাই তারিখে কুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে কর্ণেল ক্যালভার্ট যে এফিডেভিট করিয়াছিলেন তাহার নকল ছিল। বাদীর দাবীর বিষয় অবগত হইবার এক সপ্তাহের মধ্যে এই সকল যোগাড় করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যবস্থা আরও অল্প সময়ের মধ্যে হইয়াছিল বলিয়াও অনুমান করা যায়। সত্যবাবু বলেন,—পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করা ছাড়াও তিনি অনারেবল মিঃ লীজের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার পরামর্শ অনুসারে বাদী ভাওয়ালের মধ্যমকুমার বলিয়া যাহা "ইংলিশম্যানে" লেখা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়া পাঠান। সত্যবাবুর স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ, ১৯০৯ সালের ৯ই "ইংলিশম্যান" সেই পত্র প্রকাশিত হয়। ৮ই মে, রবিবার ছিল। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে, সত্য বাবু ৯ই মের পূর্ব্বে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ; সম্ভবতঃ ৬ই ও ৭ই মে উক্ত কর্ম্মচারীদিগের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

ঢাকার তাৎকালিক কালেক্টর মিঃ লিণ্ডসে স্বতন্ত্র এক রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। ৫ই এবং ১৫ই মের মধ্যে রায় বাহাদুর শশাঙ্ককুমার ঘোষ

দত্ত, (হাজির করা হয় নাই) জলদচন্দ্র মুখুজ্জ্যে (মৃত)। সীতানাথ বাড়ুয্যে। (বাদী পক্ষের ৯৭৭নং সাক্ষী) ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র মুখুয্যে, (বাদী পক্ষের ৯৩৮নং সাক্ষী), সীতানাথ মুখুয্যে বাদী পক্ষের ৯৭৩নং সাক্ষী), যোগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত (হাজির করা হয় নাই), নস্থ প্রধানিয়া (হাজির করা হয় নাই), অছিম মুন্সি (হাজির করা হয় নাই) উমেদ আলি ভূঞা (বাদীপক্ষের ২৬নং সাক্ষী)।

যাঁহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, আমি তাঁহাদের নামের সঙ্গে নম্বর দিয়াছি। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উহা ৬ই মের রিপোর্ট। উক্ত রিপোর্টে (একজিবিট নং ২ (২০৩) ৬।৫।২৯ তারিখকে ৫।৫।২৯ তারিখের মত দেখায়। মোহিনীবাবু বলিয়াছেন যে, ৫ নহে ৬। রায় সাহেবের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, ৬ই তারিখ কোর্ট অব ওয়ার্ডস সাধুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং বিবাদীপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, উক্ত দিবস জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং রায় সাহেব গিয়াছিলেন; এই সম্পর্কে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং রায় সাহেবকে সাক্ষ্য দিতে না আনিয়া, বিবাদীপক্ষ অন্য একজন সাক্ষীকে আনিয়াছে। আমি তাঁহার সম্পর্কে আলোচনা করিব, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রিপোর্টে কতকগুলি বিষয় বলা হইয়াছে, যেমন 'সাধু মেজকুমার বলিয়া প্রচার করিতেছেন।' পারিবারিক ঘটনা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেন নাই; তাঁহাকে অভিযুক্ত করিবার জন্য বলা হইয়াছে। ৫ই তারিখের রিপোর্টে যে চা পার্টির কথা উল্লেখ হইয়াছে, উহাতে ঐ লোক পাঞ্জাবী বা হিন্দীভাষী তৎসম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয় নাই, এবং পারিবারিক ঘটনার বিষয়ও উল্লেখ করা হয় নাই, এবং পরিবারস্থ লোকজন তাঁহাকে স্বীকার করে নাই বলিয়া বলা হইয়াছে।

বাদীর সহিত ৫ই মের সাক্ষাৎকারের ঘটনা ৬ই মের রিপোর্টে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বাদীর বিরুদ্ধে গিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি, একটা মামলা দায়ের করার জন্যই পূর্ব্ব হইতে তাহারা ঐপ্রকার রিপোর্ট তৈরী করিয়াছে এবং সেখানে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা যথাযথভাবে উল্লেখ না করিয়া বাদ দিয়াছে। এই সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাই, কারণ বাদীর সহিত ৫ই মে যে সাক্ষাৎ করা হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্পর্কে অনেক কথা বাহির হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহার পর আর কখনো বিবাদীপক্ষ তাঁহার নিকট যান নাই বা এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেন নাই। এই মামলার সময় ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, বাদীকে কুমারের জীবনের

ম্যানেজারকে তাঁহার কাজের জন্য এবং এই মামলার সাফল্যের জন্য প্রশংসা করা হইয়াছে, ইহা তিনি জানেন না। দেখিয়া ঐ কথার প্রতিবাদ করা ভিন্ন, এই মামলায় তাঁহার আর বিশেষ কিছু করিবার ছিল না। এই মামলায় আসামীকে বাদী নিশ্চয়ই সমর্থন করিয়াছিলেন। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, 'দার্জ্জিলিংয়ে কুমারকে আশু ডাক্তার বিষ খাওয়াইয়াছিলেন' বলিয়া উক্ত পুস্তিকায় লেখা হইয়াছে। সাক্ষ্য প্রমাণে একটি ক্ষেত্রে এমন কি আশু ডাক্তারও ভুলিয়া যান। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, পি, ঘোষের এজলাসে এই মামলার একবার বিচার হয়। ইহার পর আবার আর একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, এম, ঘোষের এজলাসে এই মামলার বিচার হয়। ঢাকাতেই এই বিচার হয়।

এই মামলায় ফরিয়াদী পক্ষে দারোগা আবদুল হামিদ সাক্ষ্য দেয়। জেরায় সে বলে—

"একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে যাই এবং সেখানে গিয়া দেখি যে, সন্ন্যাসী দ্বিতীয় কুমার কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য তথায় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার মোহিনীবাবু, রায় সাহেব জে, এন, বাঁড়ুয্যে, আশু ডাক্তার, গৌরাঙ্গবাবু (সাব রেজিষ্ট্রার) এবং আরও অনেকে উপস্থিত আছেন। সন্ন্যাসীকে বহু প্রশ্ন করা হয়। আশু ডাক্তার প্রশ্ন করেন, আপনি যদি কুমার হন, তবে দার্জ্জিলিংয়ে কে গুলি করিয়া একটি পাখী মারিয়াছিল, তাহার নাম নিশ্চয়ই বলিতে পারিবেন, ইহা সত্য যে, কুমার উত্তর দেওয়ার আগে, সাব রেজিষ্ট্রারের নিকট ঐ লোকটির নাম বলিবার জন্য আশু ডাক্তারকে কোন কোন ব্যক্তি বলেন। তদনুসারে আশু ডাক্তার সাব্ রেজেষ্ট্রারের নিকট ঐ লোকটির নাম বলেন, সন্ন্যাসী ইহার পর আশু ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং খুব সম্ভব বলেন যে, হরিসিংহ নামে এক ব্যক্তি সেই পাখীটি মারিয়াছিল। গৌরাঙ্গবাবু তখন বলেন যে, আশুডাক্তার বীরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের নাম বলিয়াছিলেন। পরে আমি গৌরাঙ্গ বাবুর নিকট শুনিয়াছি যে, এ সম্পর্কে পরে খোঁজ করা হইয়াছিল, এবং সন্ন্যাসীর উত্তরই ঠিক হইয়াছিল। বীরেন্দ্র বাঁড়ুয্যেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। **তিনি স্বীকার করেন যে, সাধুর কথাই ঠিক।**

ইহা মূল প্রমাণ নহে। তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার এখন যাহা স্মরণ আছে তাহা এই যে, রাজবাড়ীর আঙ্গিনায় কোন মাঠে—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ী। রাজবাড়ীর ভিতরে বলিয়াছেন—কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য ভদ্রলোক সমবেত হন, এবং সন্ন্যাসীকে তাহাদের মধ্যে একজন

সংক্ষেপে বলা যায় যে, তিনি ৫ই তারিখের ঘটনা সম্পর্কে দুই রকমের বিবৃতি দিয়াছেন, এবং তাহা এড়াইবার জন্যই দুইবারের বেশী গিয়াছিলেন। এই সকল কথা বলেন, যে তারিখে এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ও গৌরাঙ্গ বাবু উপস্থিত ছিলেন তাঁহাকে সেই তারিখের সহিতই যুক্ত রাখা হইয়াছে। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তিনি বাদীকে মাত্র দুইবার দেখিয়াছেন—(একবার রেলওয়ে ষ্টেশনে) ইহা বলিয়াছেন কেন, তখন তিনি বলেন যে, 'দেখা' অর্থে তিনি দুইবার বাদীর সঙ্গে 'কথা' বলিয়াছেন, ইহা বলিতে চাহিয়াছেন; এবং যখন দেখা গেল যে, 'দেখার' অর্থ 'কথা' করা হইলে, ৫ই যে (সেদিন এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ও গৌরাঙ্গবাবু উপস্থিত ছিলেন) তিনি বাদীর সহিত কথা বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়, তখন তিনি বলেন যে, 'দেখা'র অর্থ 'কথা' বলা ইহা তিনি বলিতে চাহেন নাই।

মেজকুমারের মৃত্যু সম্পকে এই সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, সাক্ষীর জবানবন্দী তাহার গুরুত্ব কতটা লাঘব হইয়াছে ইহা তাহার একটা সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র। তিনি চা-পার্টির কথা উল্লেখ করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বাদীকে—১লা বৈশাখ যেদিন বাদী জয়দেবপুর হইতে চলিয়া যান—রেলওয়ে ষ্টেশন দেখিয়াছেন।

মোহিনীবাবু, রায় সাহেব ও ফণীবাবু কি বলেন

৫ই তারিখে কি ঘটিয়াছিল তৎসম্পর্কে মোহিনীবাবু, রায়সাহেব এবং ফণীবাবু সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বাদীকে তাঁহার নাম ও পিতার নাম জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল এবং তিনি তাহা ঠিকমত উত্তর দেন; কিন্তু রাজার মৃত্যু কবে হইয়াছিল এবং রাণীর (মাতার) কোথায় মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারেন নাই। এই সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বাদী ফোঁপাইতে আরম্ভ করেন। এই ফোঁপাইবার কথা রিপোর্টে উল্লেখ নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকেও এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় নাই। এই তিনজন সাক্ষী, আশুবাবু পাখী শিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করিয়াছেন, বলিয়া অস্বীকার করেন, এবং প্রত্যেকেই ১লা বৈশাখের চা-পার্টির কথা স্বীকার করেন। বাদীর প্রথম জয়দেবপুর আগমন উপলক্ষে কি হইয়াছিল ফণীবাবু তাহার একটি বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ সময় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কাঁদেন নাই, এবং তিনি ও সত্যভামা দেবী সন্ন্যাসীকে

তিনি বলেন যে, তিনি পরিবারের লোক দিগকে তাহাদের অসঙ্গত কার্য্যের জন্য অনুযোগ দেন। তিনি এই কথাও বলেন যে, তাহাদের রাণীদের নিকট এই সম্পর্কে লেখা উচিত। ৮ই তারিখের কাহিনী সমর্থনের জন্য বিবাদী পক্ষ্য ৬ই তারিখের রিপোর্টের ন্যায় মোহিনী বাবুর লিখিত একটী রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ঐ রিপোর্ট বিলম্বে কেন দাখিল করা হইল, বিবাদী পক্ষ তাহার কোন কৈফিয়ৎ দেন নাই। আমি ঐ রিপোর্ট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি, কারণ জালিয়াতির অভিযোগ আনা হইয়াছিল এবং সত্য সত্যই এই মামলায় জালিয়াতি হইয়াছে। ঐ দুই দিনের ব্যাপার সম্পর্কে বাদীকে আবশ্যক কোন প্রশ্ন করা হয় নাই। যদি একমাত্র ঐ দুইদিনের ঘটনাব উপরই পরিবার সম্পর্কে বাদীর অজ্ঞতা নির্ভর করে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উহা কৌঁস্থলীর অথবা তাহার মক্কেলের পূর্ব্বে খেয়াল হয় নাই।

আমি সাব্যস্ত করিতেছি যে, ৬ই মে তারিখের রিপোর্টে প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। ৬ই মে তারিখে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের যে মনোভাব ছিল, সেই মনোভাবের সহিত যাহাতে খাপ খায়, সেইভাবেই ঐ রিপোর্ট লেখা হয়; এবং পরে ঐ সম্পর্কে যেসব আদেশ দেওয়া হয়, তাহাতে এই বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আমার মনে হয় যে, ৬ই মে তারিখেই ইহা লইয়া বিতর্ক হয়। আমি স্বীকার করি, অন্ততঃ ১৯১১ সালের ৬ই মে এই বিতর্ক উঠিয়াছিল, উহার পর নহে। এই মামলাটি যেরূপ তাহাতে এই বিতর্ক ৪ঠা তারিখেও অর্থাৎ যেদিন বাদী আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, সেই দিনও আরম্ভ হইতে পারে; কারণ যে সকল লোক মারা গিয়াছে এবং যাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে আনা সম্ভব নহে, তাহাদের উক্তি প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু তাহাদের আচরণ প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। কি ঘটিতেছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য আমি যদি দুই একটি ঘটনা বর্ণনা করিও, তবুও এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে একটী কথা বলা আবশ্যক। মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন, ৬ই তারিখে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কোয়ারী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার স্থলে শ্রীযুত কিরণ ঘোষ নামক আর একজন সাক্ষী আমদানী করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ ঢাকায় কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহের ইন্সপেক্টর ছিলেন, এখন তিনি গবর্ণমেণ্ট প্রেস ডিপোর ম্যানেজার। তিনি বলেন, তিনি কালীগঞ্জে ছিলেন, এবং কালেক্টর মিঃ লিণ্ডসেও তথায় উপস্থিত ছিলেন। বেলা ৯টাব সময় মিঃ লিণ্ডসের নিকট একজন লোক একখানা শিলকরা চিঠি দেয়। মিঃ লিণ্ডসে মিঃ চন্দ নামক একজন ডিপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে

বলিয়াছেন যে, বাদী আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বাদী যখন আমাকে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেন, তখন ইনিই সেই লোক ইহা বুঝিতে পারিয়া আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল। বাদীপক্ষের ৫৫নং সাক্ষী বলিয়াছেন—"তাঁহার সহিত আমাদের কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই আমরা প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছিলাম, তিনিও কাঁদিয়াছিলেন। তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছিল।" মিঃ নীডহ্যাম তাঁহার রিপোর্টে যে দৃশ্য ও যে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমি তাহাই সুস্পষ্ট করিবার জন্য উপরের কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

দিনের পর দিন এইরূপ চলিতেছিল। এইরূপ চিহ্নাদি প্রদর্শন, একস্থানে বসিয়া থাকিয়া লোকদিগকে দর্শন দেওয়া, এই কান্না, সাধারণ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলা,—এই ব্যাপারগুলি যে কুমার জনসাধারণ হইতে দূরে থাকিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে অসাধারণ আচরণ কি না তাহা নির্ণয় করিতে, এবং বাদীর সমস্ত আচরণের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। তিনি শান্তভাবে মিঃ নীডহ্যামের নিকট যাইয়া এষ্টেটের দখল দাবী করিলেন না কেন? মিঃ চৌধুরী আমাকে এই প্রশ্নটার কথা বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন, কুমার যদি সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি আভিজাত্যগর্ব্বী ব্যক্তি হইতেন, (যাহা প্রমাণ করিবার জন্য মিঃ ঘোষালকে (কমিশনে) প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং কার্য্যতঃ বাদীকেও ঐ ভাবে জেরা করা হইয়াছিল) তাহা হইলে এই বিবরণের অনেকাংশই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইত এবং এই আচরণের অনেকটা অসাধারণ—এমন কি অবিশ্বাসী বলিয়া মনে হইত। বাদী অবশ্য ২৫ দিন পরে কালেক্টর মিঃ লিণ্ডসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আমি আড়াই বৎসর ধরিয়া এই মামলা শুনিয়াছি। অধিকাংশ লোক তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানে, আমি সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে তাহা অপেক্ষা সম্ভবতঃ বেশী জানি। আমি তাঁহার সম্বন্ধে একটি ধারণা পাইয়াছি এবং আমি প্রথমে বলিব তিনি কি ধরণের লোক ছিলেন, এবং তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই আচরণের কথা বিচার করিব। কিন্তু ধরা যাক্ যে, কুমারের একটি আঙ্গুলের ছাপ যদি পাওয়া যাইত এবং তাহা বাদীর আঙ্গুলের ছাপের সহিত মিলিয়া যাইত, তাহা হইলে আচরণের কোন কথাই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিত না। এখন কেবল কুমার কিরূপ ছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলেই হইবে না। ১২ বৎসরের ভীষণ অভিজ্ঞতার পর (ঐ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তাহাকে যাইতে হইয়াছে ইহা ধরিয়া লইয়া) তিনি কিরূপ হইবেন তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত এবং তাহার পরে ৭ই জুন তিনি জয়দেবপুর পরিত্যাগ

জিবিট ৩৫৩(১)) তাহাতে হয়ত তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, কোন প্রজা বা অন্য কেহ তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না। বিবাদী পক্ষ আদালতের কাছে এই প্রার্থনা জানাইতেছিলেন যে, বাদী পক্ষেরা সাক্ষ্য উপস্থিত করা বন্ধ করিয়া, সাক্ষীর স্রোত বন্ধ করা হউক, তাহাতে আমি মোটেই আশ্চর্য্য হই নাই। সঙ্কীর্ণ ষড়যন্ত্রের কাহিনী ভিত্তিহীন বলিয়া পরিগণিত হইতে বসিয়াছিল। যে সকল সাক্ষী বাদীকে ভিন্ন লোক বলিয়া দেখিয়া একই ব্যক্তি বলিতেছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে কি বলা যাইবে তাহাও ক্রমেই কঠিনতর সমস্যা হইয়া উঠিতেছিল।

আনন্দচন্দ্র রায়

এই সভার দিনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীলবাবু আনন্দচন্দ্র রায়—যিনি ঘনিষ্ঠভাবে রাজ পরিবারকে জানিতেন এবং যাঁহাকে কুমারেরা কাকা বলিয়া ডাকিতেন; তিনি আসিয়া ছিলেন এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল বাদীর সহিত নির্জ্জনকক্ষে ছিলেন। তিনি যখন বাহির হইয়া আসেন, তখন সকল ভদ্রলোক ঐ বাড়ী আসিয়া জড় হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যে, সন্ন্যাসীই কুমার। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই মত বিরোধের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া উহাকে প্রমাণ বলিয়া ধরা হয় নাই—যদিও এই মামলা তারিখের বয়সাধিক্যের জন্য শ্রীযুক্ত আনন্দ রায়ের সাক্ষ্য দিবার ক্ষমতা ছিলনা। কিন্তু ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, তিনি বাদীর একজন খুব বড় সমর্থক ছিলেন। মিঃ লিণ্ডসেও তাঁহার একখানা চিঠিতে এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। (একজিবিট ৪৩৫) বিবাদীরাও বাদীর গুরুর আগমন সম্পর্কে একটি ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত আনন্দরায় কি করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ বিবরণ নিম্নলিখিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। (বাদী পক্ষের ৯৯৭, ৯৮৫, ৮৫২, ৮০৬, ৯০৯, ৯৫৯, ৯৬১, ৯৬৭, ৬৩নং সাক্ষী) এই সম্পর্কে ইহাদের সাক্ষ্য আমি মানিয়া লইয়াছি। ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও ঢাকার একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক মিঃ সতীশচন্দ্র দের সাক্ষ্যের কথা আমি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব।

রাজ-জামাতা ব্রজলাল

এই দিনের সহিত আরও একটি ব্যাপারের যোগ আছে। তাহা এইরূপ, —রাজার কনিষ্ঠা কন্যার স্বামী ব্রজলালবাবু ঐ দিন বাদীকে দেখিতে আসিয়া-

খাজানা আদায় করিয়াছিলেন ; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের কোনও প্রতিবাদ হয় নাই ; দিগিন্দ্র বাবু ও জগদীশবাবুর সাক্ষ্য হইতেও বুঝা যায়, ঐ সকল কথা সত্য। জগদীশ ভাওয়াল তালুকদার ও প্রজাসমিতির সদস্য ছিলেন, কিন্তু বিবাদী পক্ষে কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

সভার তিন চারিদিন পর কুমারদের কনিষ্ঠা ভগিনী তড়িন্ময়ী দেবী, ঢাকা হইতে জয়দেবপুরে যান, তিনি ঢাকায় তাঁহার স্বামী উকিল ব্রজলাল বাবুর সঙ্গে বাস করিতেছিলেন, **তড়িন্ময়ী দেবী বাদীকে দেখিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে থাকেন। কনিষ্ঠা ভগিনী যেমন করে, তদ্রূপ তিনি বাদীর উরুদেশে মাথা রাখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এতদিন কিরূপে বাড়ী ছাড়িয়া ছিলেন ?"** (জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্য ও মোক্ষদার কমিশন সাক্ষ্য) তাঁহার পরবর্ত্তী আচরণে এবং তাঁহার একটি কাজে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যদিও তিনি সাক্ষ্য দেন নাই, তথাপি তাঁহার তৎকালীন আচরণ সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা সত্য।

তড়িন্ময়ী কি করিলেন

তিনি যে কারণে সাক্ষ্য দেন নাই, তাহা সুস্পষ্ট। তিনি যে কাজটি করিয়াছেন বলিয়া বাদীপক্ষ বলিয়াছেন, তাহা বিবাদীপক্ষ অস্বীকার করেন নাই, বরং মিঃ লিণ্ডসে তাহা স্বীকারই করিয়াছেন। তাঁহার সেই কাজটি এই যে, তিনি যে পাঁচ দিন জয়দেবপুরে ছিলেন, উহার কোনও একদিন অর্থাৎ ২৩শে মে তারিখের পূর্ব্বে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে তিনিও একযোগে কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে, বাদীর পরিচয় সম্পর্কে তদন্ত করা হউক। মিঃ লিণ্ডসে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐরূপ দরখাস্ত করা হইয়াছিল। সত্যবাবুও ঐরূপ দরখাস্তের কথা শুনিয়াছিলেন। সেই দরখাস্ত তলব করা হয়। এবং কালেক্টর তাহা দাখিল করেন।

মিঃ লিণ্ডসের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে,সাধুর সম্পর্কে সমস্ত কাগজ-পত্র একটা ফাইলে রাখা এবং সেই ফাইল ওয়ার্ডস ডেপুটী কালেক্টরের চার্জ্জে রাখা হয়। মিঃ আর সি দত্তও (বিবাদী পক্ষের ৪৩৫নং সাক্ষী) ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই দরখাস্ত আদৌ আমলে আনা হয় নাই। কুমারের মৃত্যু হইয়াছিল, ইহা প্রমাণের জন্য যদিও বহুলোকের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল, তথাপি কুমারের ভগিনিগণ বা বাদী কিংবা ঢাকা ও

"বেলা ১১টার সময় সাধু আসেন, তাঁহার সঙ্গে বাবু শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাবু প্যারীলাল দাস এবং মনে হয় কাশিমপুরের ম্যানেজারও ছিলেন। তিনি বলেন, প্রজাদের উপকার হইতে পারে, এমন ভাবে যাহাতে তাঁহার জমিদারীর বন্দোবস্ত হয়, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। আমি তাঁহাকে বলি যে, তিনি মেজকুমার নহেন, ইহা ধরিয়া লইয়াই, বোর্ড অব রেভিনিউ কাজ করিবেন; কারণ কুমার মারা গিয়াছেন বলিয়াই বোর্ড অব রেভিনিউ অনেক বৎসর যাবৎ ধরিয়া আসিতেছেন। আমি তাঁহকে আরও বলি, তিনি আদালেতে মামলা করিয়া তাহার পরিচয় সপ্রমাণ করিতে পারেন; নতুবা তিনি যদি আমার নিকট প্রমাণ উত্থাপন করিতে চাহেন, তবে আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার সঙ্গের উকীলদ্বয় বলেন, আগামীকল্য তাঁহারা তদন্তের জন্য দরখাস্ত করিবেন। তাঁহারা আরও বলেন, রেভিনিউ বোর্ড যাহাতে খরচ দেন, সেই ব্যবস্থা করা হউক, আমি উত্তর করি, তাঁহারা ঐ মর্ম্মে দরখাস্ত করিলে আমি ঐ সম্পর্কে যাহা হয় অর্ডার করাইব।

"আমার প্রশ্নের উত্তরে সাধু বলেন, দার্জ্জিলিংএ তিনি দুই হইতে চারি দিন নিউমোনিয়ায় ভুগিবার পর তাঁহার সংজ্ঞা বিলোপ হয়। দার্জ্জিলিংএর যে বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীর নাম তাঁহার স্মরণ নাই, বলিয়া তিনি বলেন। তিনি আরও বলেন, যখন জয়দেবপুর হইতে দার্জ্জিলিং যান, তখন তাঁহার কোন অসুখ ছিল না, শুধু ডান পায়ের জানুর উপর একটী ফোঁড়া হইয়াছিল এবং দার্জ্জিলিং যাত্রার পূর্ব্ববর্ত্তী দশ দিনের মধ্যে ঐ ফোঁড়া হইয়াছিল। ঐ ফোঁড়া হইবার একটী বিশেষ কারণও ছিল। উহার পূর্ব্বে তিনি কখন কলিকাতা গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হয়, তখন একজন সাধু উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সাধু পরে তাঁহার গুরু হইয়াছিলেন। সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তিন চারি দিন অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে এমনভাবে মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল; যেন তাঁহাকে ফেলিয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাঁহাকে পাওয়ার পূর্ব্বে বৃষ্টি হইতেছিল; সুতরাং তাঁহার শরীর বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে দিনের বেলা পাওয়া গিয়াছিল কি রাত্রিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা সাধু তাঁহাকে বলেন নাই।"

(স্বাঃ) জে, এইচ, লিণ্ডসে,

২৯-৫-২১

"এষ্টেটের কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বেই যথারীতি খাজানা আদায় করিবেন,—সাধু এই প্রস্তাবে সম্মত হন। উকিলেরা বলিলেন যে, যদি মৃত মেজকুমারের নাম বাদ দিয়া শুধু বিভাবতীর নামে রসিদ দেওয়া হয়, তবে প্রজাদের খাজানা দিতে কেন আপত্তি হইবে?"

(স্বাঃ) জে, এইচ, এল
২৯ ৫-২১"

যে কাগজে মিঃ লিণ্ডসের উক্ত বিবরণ লেখা হইয়াছিল' উহার কিনারায় তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন।

সাধুকে দেখিয়া মনে হইল, তিনি হিন্দুস্থানী, রং চমৎকার; শরীরে উপদংশের কোনও চিহ্ন নাই, তাঁহার চুলের বর্ণ সোনালী—'আতিকুল্লার' ন্যায়. লাল নহে।

(স্বাঃ) জে এইচ এল
২৯-৫-২১"

বাদী অন্যান্য সকলের সহিত যে সকল উক্তি করিয়াছেন বলিয়া বলা হইয়াছে, উহার সহিত আমি মিঃ লিণ্ডসের উক্ত লিখিত বিবরণ আলোচনা করিব। কিন্তু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মিঃ লিণ্ডসের সহিত বাদীর সাক্ষাতের কথা মিঃ লিণ্ডসের প্রায় কিছুই মনে নাই; তাঁহার শুধু এইটুকু মনে আছে যে, তাহাদের মধ্যে হিন্দীতে বাক্যালাপ হইয়াছিল। বাদী বলিয়াছিলেন, তাঁহার গুরুর নাম ধরমদাস নাগা—তাঁহার বাহুতে উল্কী ছিল এবং সাধুর চুলের বর্ণ সোনালী কটা ছিল ও গায়ের রং ফর্সা ছিল, এবং যখন সাধুর সঙ্গে তাঁহার কথা হয় তখন উকীল দুইজন উপস্থিত ছিলেন না। মিঃ লিণ্ডসে বাদীর কথা যতদূর বুঝিয়া ছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার কতদূর স্মরণ ছিল. তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, কারণ মিঃ লিণ্ডসে বলিয়াছেন, কথাবার্ত্তা যখন চলিতেছিল তখন তিনি তাঁহার ঐ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কি তাহার পর লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই; তবে ঐ দিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দুইটী বিষয় সুস্পষ্ট বুঝা যায়, বাদী পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলেন নাই, এবং বিবাদী পক্ষের সাক্ষী অতুল বাবু যে বলিয়াছেন,—যাহা বিবাদী পক্ষ বলেন—বাদী তদ্রূপ হিন্দী ভাষায়ও কথা বলেন নাই। তিনি অনাহূতভাবে কোনও বিষয়ে কাহারও নিকট হইতে কোনও ইঙ্গিত না পাইয়া, একাকী একেবারে সিংহের গহ্বরে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং

সালেও বাংলা বলিতে পারিতেন না। বাদীর বাক্যালাপ এবং বাংলা কথা-বার্ত্তা বলা সম্পর্কিত বিতর্কের আলোচনা অতঃপর যথাস্থানে করিবার প্রয়াস পাইব।

বাদীর পক্ষে পুস্তকাদি প্রচার ও গান রচনা

প্রায় এই সময়েই (প্রকৃত সময় নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়) অথবা মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে, বাদীর বিষয় সম্পর্কে—আদালতে দাখিল পুস্তিকাদি হইতে সিদ্ধান্ত করা যায়, প্রধানতঃ বাদীকে সমর্থন করিয়া পদ্যে ও গদ্যে পুস্তিকাদি প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। (বাদীর ৩৩, ৯, ২২০, ৩২৬, ৯১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) ফিরিওয়ালাগণ সর্ব্বত্র সেই পুস্তিকা বিক্রয় করিত। একজন সাক্ষী (বাদীর ৩০নং সাক্ষী) গান রচনা করিত এবং গ্রামে গ্রামে সে গান গাহিয়া বেড়াইত। আর একজন সাক্ষী (বাদীর ৩৫নং সাক্ষী) তাহার কবিগাণের মধ্যে উক্ত গান সন্নিবিষ্ট করিয়া (৩০নং একজিবিট) জনতার সমক্ষে—কবিগানে সাধারণতঃ যে প্রকার জনতা আকৃষ্ট হয়—সেই কবিগান গাইত। এ সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়া চাঁদাও সংগ্রহ করা হইত (বিবাদীর ৬৩৩ ও ২২১নং সাক্ষী) এবং সংবাদপত্রেও এতৎ সম্পর্কে আন্দোলন চলিয়াছিল। (বাদীর ৯১নং সাক্ষী এবং মিঃ চাকলাদারের কমিশন সাক্ষী দ্রষ্টব্য)।

যাঁহারা সাধুর বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারাও সাধুর বিরুদ্ধে কবিতা ও পুস্তিকাদি প্রচার করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তাঁহাদের প্রচারিত "ভাওয়ালের ভূতের কাণ্ড" নামক পুস্তিকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিতর্ক বিতণ্ডা দুইটী বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যেই চলিয়া থাকে। কিন্তু এক পক্ষের গাহিয়া বেড়াইবার উপযোগী কোনও গান ছিল না; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষের গান গীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। আর আর সকল বিষয়ে সম্পর্কহীন ও অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বাদীর সাদৃশ্য বিষয়ক প্রশ্ন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও মুখ্য প্রমাণের সত্যাসত্য নির্ণয় উপলক্ষে এই আন্দোলনের বিষয় স্মরণ করিবার আবশ্যক হইবে।

বিবাদী পক্ষের কৌসুলী যদিও বাদীর স্বীকারোক্তি বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য ঐ সকল পুস্তিকাদি হইতে বিষয় বিশেষ বাছিয়া লইয়া বাদীর বিরুদ্ধে বলাইবার উদ্দেশ্যে সাক্ষী দিগকে তৎসংক্রান্ত প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বড়ই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। (বাদীর ৩৭৭, ২২৮, ৬৮০, ৭৭, ১৯৩, ২৬২, ৩২৬, ৩৫৮, ৩৮৭, ৯৫৮, ৬৩৯, ৬৮০ ও ৯২১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)।

১৯০৯ সালের পূর্ব্বে মধ্যমকুমার যেভাবে ঢাকার রাস্তায় টমটম হাঁকাইতেন, বাদীও এসময় ঠিক সেইভাবে ঢাকার রাস্তায় টমটমে চড়িয়া বেড়াইতেছিলেন। বাদী নিজেই টমটম হাঁকাইতেন। (বাদীর ৩২৬, ৬৬৬, ৭৩৯, ৪৫০, ৪৭২, ৬০২, ৭৮৯, ৮৩৩, ৯১৫, ৯১৪, ৯০২, ৭৯২, ৮০৬, ৯৫১, ৯৭৭, ১০০২, ৯৭০, ৯৭৬, ৯২৮, ১০০৯, ১০১৯, ১০১৫, ১০১৬, ১৯নং সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) ঢাকার রাস্তায় যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিই কেহই তাহা অস্বীকার করেন নাই। মিঃ মায়ারও এই সময় বাদীকে টমটমে চড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিলেন।

একদিন বিবাদী পক্ষের সাক্ষী সর্ব্বমোহন চক্রবর্ত্তী (কমিশনে ইহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়), আর্ম্মাণীটোলার বাড়ীতে বাদীর নিকট আসেন। তিনি যখন ঐ বাড়ীতে উপস্থিত, ঠিক সেই সময়ে বাদী টমটমে চড়িয়া বেড়াইতে যান। সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, বাদীর টমটম হাঁকাইবার অদ্ভুত কৌশল ছিল। বাদীর জয়দেবপুর থাকা কালে সকলেই দেখিয়াছিলেন; কেহই তাহা অস্বীকার করেন নাই। আমি যখন বাদীর সনাক্ত করিবার জন্য শরীরের চিহ্ন এবং বাদীর চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করিব, সেই প্রসঙ্গে পুনরায় এতদ্বিষয়ের অবতারণা হইবে।

বাদীর গুরু বাবা ধর্ম্মদাস নাগার কথা

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাদী ৭ই জুন ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার লম্বা চুল এবং গোঁফদাড়ি ছিল। গোড়াতেই তাঁহার গুরু বাবা ধর্ম্মদাস নাগার নাম করিয়াছিলেন। গোড়াতেই তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার গুরুই তাহার হাতে উল্কি পরাইয়া দিয়াছিলেন। বাদীর সাক্ষ্যে প্রকাশ,—সেই ধর্ম্মদাস নাগা, সন্ন্যাসী চতুষ্টয়ের একজন, যিনি দার্জ্জিলিংএর শ্মশান হইতে বাদীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে বাদী, মিঃ লিণ্ডসেকে, তাহার হাতের উল্কি দ্বারা লিখিত নাম দেখান।

ভাওয়ালের এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজারের এক নোটীশে প্রকাশ,—"ভাওয়াল-সন্ন্যাসীর দল গোড়াগুড়িই বলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার গুরু ধরমদাস আবির্ভূত হইবেন।" (২১২নং একজিবিট) ঢাকায় পৌঁছিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বাদীর গুরুকে দেখিবার জন্য উৎসুক হন; এবং তাঁহাকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করেন। প্রথমে তিনি জব্বু ও জিতেনকে পাঠান, তাঁহারা গুরুকে দেখিতে পায় না, তারপর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা সাগর (বাদীর ৯৭৭নং সাক্ষী), অতুল রায় এবং হাবীর নামক জনৈক সাধু,

গুরুকে আনিতে যান। তাঁহারা গুরুকে পাইয়া ১৯২১ সালের ভাদ্র মাসের একদিন ঢাকায় লইয়া আসেন। মিঃ লিণ্ডসের এক পত্রে ঠিকভাবে তাহার তারিখ জানা যায়। সে তারিখ ১৯২১ সালের ২৬শে আগষ্ট। বিবাদী পক্ষ ঐ তারিখের কথা বলেন এবং আমিও তাহা মানিয়া লইলাম। ৩০শে আগষ্ট গুরু চলিয়া যান। বাদীর জনৈক সাক্ষীকে (বাদীর ১০৪০নং সাক্ষী) জেরা করিবার সময় বিবাদী পক্ষই ঐ তারিখের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগা যে ঢাকায় আসিয়াছিলেন, এই মামলায় তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা হইয়াছে। বাদী বলেন,—পুলিশের ভয়ে তাঁহার গুরুকে ঢাকা ছাড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু বিবাদী পক্ষ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বাদীর গুরু পুলিশের ভয়ে চলিয়া যান নাই। তিনি পাঞ্জাবের এক অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছিলেন যে, বাদী (ধর্ম্মদাসকে ফটো দেখাইয়া) তাঁহার চেলা সুন্দর দাস সাধু হইবার পূর্ব্বে, সুন্দরদাস লাহোর জেলার আউজলা গ্রামের এক রাখাল বালক ছিল। তখন তাহার নাম ছিল—মাল সিং। কিছু পরে এই প্রসঙ্গের পুনরবতারণার আবশ্যক হইবে।

ম্যানেজার সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রিপোর্ট

ভাদ্র মাসের শেষের দিকে বাদী তাঁহার দাড়ি ফেলিয়া দেন, তখনও তাঁহার মাথায় জটা থাকে। তিনি তখন সাধারণ ধুতি পরা আরম্ভ করিয়াছেন। ঢাকা আসিবার পর ইহাই তাঁহার প্রথম ধুতি পরা। প্রথম আত্ম-পরিচয়ের দিন হইতেই বাদী লেংটি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে, ১৯২১ সালের ১লা জুলাই এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রিপোর্ট পান। ইন্সপেক্টার মমতাজউদ্দিন সমভিব্যাহারে সুরেন্দ্র বাবু পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন। ৩১শে মার্চ্চ তাঁহারা উভয়ে পাঞ্জাবে যান। সুরেন্দ্র বাবু রিপোর্ট দিয়াছিলেন,—এই বাদীর নাম সুন্দর দাস। তিনি রামদাসের চেলা। (৩২৭২ একজিবিট)। ২রা জুলাই ম্যানেজার মধ্যম রাণী বিভাবতী দেবীকে তারযোগে এই সংবাদ জানান যে, 'বাদীর গোড়ার খবর সমস্ত পাওয়া গিয়াছে।'

বিবাদী পক্ষীয়দিগের অপচেষ্টা

এ সকলই ১৯২১ সালের ঘটনা। সমস্ত বৎসর ধরিয়া এমন কি পরবর্ত্তী বৎসরেরও কতক সময় পর্য্যন্ত, বাদীর অজ্ঞাতসারে দার্জ্জিলিংএ তাহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য, সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের জোর আয়োজন

কুশপুত্তলিকা দাহের কথা হইয়াছিল, এবং কেন হইয়াছিল তাহাও তোমার জানা আছে।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এখানে আসিয়া একবার তাহাকে দেখা তোমার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলেই তোমার মনে কোন সন্দেহ থাকিবে না। তাহার ঢাকায় আগমনের পর তোমরা কেহই স্বচক্ষে দেখ নাই। হয়ত তোমরা লোকমুখে নানা কথা শুনিয়াছ, এবং সংবাদপত্রে নানারূপ বর্ণনা পড়িয়াছ।

"আমি তাই স্নেহভাবে তোমাকে আহ্বান করি যে, তুমি আসিয়া দেখ; তাহা হইলেই সত্য কথাটি ঘোষণা করা যাইবে। অতএব আমার ঐকান্তিক অনুরোধ, তুমি একবার আসিয়া, স্বচক্ষে একবার দেখ, অতঃপর ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে যাহা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করিয়া আমার বিখ্যাত স্বামীর পরিবারের মানসম্ভ্রম রক্ষা কর।" (স্বাঃ) শ্রীসত্যভামা দেবী।

অবিনাশচন্দ্র মুখুয্যেই শ্রীযুক্তা সত্যভামা দেবীর কাজকর্ম্ম দেখিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন,—সত্যভামা দেবীর উপদেশ অনুসারে তিনি এই পত্রখানা লিখিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা সত্যভামা দেবী কিভাবে স্বয়ং তাঁহার শীলমোহর বাহির করিয়া আনিয়া স্বহস্তে পত্রের উপর শীলমোহর দিয়াছিলেন, তাহাও এই সাক্ষী বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে তিনি তাঁহার নিজের সত্যিকার মতামত বর্ণনা করিয়াছিলেন কি না, তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই বর্ণনা অগ্রাহ্য করিয়া দেওয়ার কোন কারণও পাইতেছি না। কেবলমাত্র তাঁহার উক্তিকেই প্রমাণ বলিয়া ধরা যায় না। তাঁহার কার্য্যাবলীর যেটুকু প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হইতেই সত্যভামা দেবীর প্রকৃত মতামত নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তবে কথা এই যে, যদিও দ্বিতীয় রাণী জানিতেন যে, এই পত্র সত্যভামা দেবীর নিকট হইতে আসিয়াছে; তথাপি তিনি ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা পত্রের উল্লিখিত বিষয় স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল, এমন কথা কেহই বলেন না। তবে দ্বিতীয় রাণীর চালচলন ও ভাবগতিকের কথা সমালোচনা করিবার সময় এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে।

কালেক্টার মিঃ ড্রামণ্ডের নিকট পত্র

ঢাকায় আসিবার পর সত্যভামা দেবী এই পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং আরও দুইটি কাজ করিয়াছিলেন। ১৯২২ সালের ২০শে জুলাই তারিখে তিনি

ঢাকার সিভিল সার্জ্জন কর্ণেল ম্যাক কেলাভ আই এম-এস দ্বারা তাঁহার চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে একখানি সার্টিফিকেট লইয়াছিলেন (৭৪নং একজিবিট)। তখন বলা হইতেছিল এবং দ্বিতীয় রাণীও স্বীকার করিয়াছেন যে, সত্যভামা দেবীর দৃষ্টিশক্তি খারাপ হইয়া গিয়াছিল; তাঁহার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিও অক্ষুণ্ণ ছিল না। অতএব তিনি যাহা বলিতেছিলেন, তাহার সম্পর্কে সন্দেহ করিবার অবকাশ ছিল। ফণীবাবুর সাক্ষ্যেও এইরূপ ইঙ্গিত আছে যে, সত্যভামা দেবীর দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল না।

সত্যভামা দেবী আর একটী কাজ, যাহা এই সময়ে করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে এই যে, তিনি ২৯-৭-২২ ইংরাজী তারিখে মিঃ ড্রামণ্ডের নিকট এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্র আদালতে পেশ করার তাগিদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পেশ করা হয় নাই। ২৭৪নং একজিবিট হইতেছে এই পত্রেরই একখণ্ড নকল। আমি সেই পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মহাশয়, ২৫শে মে তারিখে লিখিত আপনার পত্রখানি যথাসময়ে আমি পাইয়াছি। বিগত ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমার পত্রে লিখিত অনুরোধ রক্ষায় আপনি সরকারী কারণে অসমর্থ হইয়াছেন বটে, তথাপি আপনি আমার মনোভাবের প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ হইয়াছি।

"আপনার প্রস্তাব অনুসারে আমি ক্লেশ স্বীকার করিয়াও ঢাকায় আসিয়াছি, এবং সাধুর সঙ্গে দেখা করিয়াছি"। অতঃপর এই পত্রে সত্যভামা দেবী বলেন,—প্রত্যহ তিনি সাধুর সহিত দেখা করিতেছেন, কেন তিনি ইহাকে মধ্যম কুমার মনে করেন, তাহার কারণ প্রদর্শন করেন, দার্জ্জিলিংএ কুমারের মৃত্যু সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্যের অবতারণা করেন, একতরফা তদন্ত দ্বারা সত্য প্রমাণিত হইতে পারে না; এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন। সত্যভামা দেবী আরও বলেন যে, রাণী বিভাবতী দেবী, তাঁহার ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে বাস করিতেছেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা তাঁহার স্বার্থের পক্ষে সুবিধাজনক নহে; বাদীর বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া নিরপেক্ষ অথচ বিশিষ্ট আইনজীবী দ্বারা পরীক্ষা করাইবার ব্যয়ভার বহনে তিনি রাজী আছেন; তাঁহার দৃষ্টিশক্তির কোন বিঘ্ন ঘটে নাই, ড্রামণ্ড আসিয়া যদি তাঁহাকে দেখেন, তবে ভাল হয়, ইত্যাদি।

মিঃ লিণ্ডসে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভগ্নীদের প্রেরিত আবেদনগুলি সম্পর্কে কোন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই; ঠিক সেইরূপ ভাবেই সত্যভামা দেবীর এই পত্রের উপরও কোন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই।

১৯২৩ সালে আর একটা প্রয়োজনীয় ঘটনা ঘটে। কোর্ট অব ওয়াড'স এবং রেভেনিউ বোর্ডের তদানীন্তন বিশিষ্ট সদস্য মিঃ কে, সি, দে, আই-সি এস্ এই সময়ে ঢাকা পরিদর্শন করেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তখন তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন। উত্তরে মিঃ দে তাঁহাকে এক বাঙ্গালা পত্র (২০০নং একজিবিট) লেখেন। আমি এই পত্রের ইংরাজী অনুবাদ দিলাম।

ঢাকা, ৭-৮-২৩ ইং

কে, সি দে, রেভেনিউ বোর্ডের সদস্য সমীপে—

"২৬শে শ্রাবণ তারিখে লিখিত আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি আমার বাসায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছেন। আপনি একটী অতি পদস্থ ভদ্র পরিবারের মহিলা। অতএব আপনি আসিয়া সার্কিট হাউসে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন. ইহা আমি সঙ্গত মনে করি না। আপনি আগামী বৃহস্পতিবার দিবস আপনার জামাতাকে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন। সকালে ৮টা সময় তিনি আমার নিকট আসিয়া আপনার সমস্ত বক্তব্য আমাকে জানাইতে পারেন। তিনি যাহা বলেন, তাহা শুনিয়া আমি প্রয়োজনীয় আদেশ দিব।

(স্বাঃ) শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

মিঃ দে'র বক্তব্য সম্বন্ধে মন্তব্য

আমার মতে এই পত্রখানি একটি সর্ব্বজনীন দলিল। সে যাহাই হউক না কেন, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা মিঃ চন্দ্রশেখর বাঁড়ুয্যের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। মিঃ কে, সি, দে তাঁহার সাক্ষ্যে, এই পত্র এবং এক জামাতার সহিত সাক্ষাৎকারের কথা স্বীকার করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরবাবু আদালতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, মিঃ দে তাঁহাকে সনাক্ত করিতে পারেন নাই। তবে এইটুকু বলিয়াছেন যে, জ্যোতির্ম্ময়ীর জামাতা হিসাবে এই ব্যক্তিই হয় ত আসিয়াছিলেন। প্রায় ৪৫ মিনিট কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ইহা স্বীকৃত যে, এই সাক্ষাৎকারের সময় মিঃ দে প্রস্তাব করেন যে, স্বয়ং বাদী যেন একটা আবেদন করেন; কারণ ভগিনী, পিতামহী অথবা প্রজাদের আবেদনের উপর নির্ভর করিয়া কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না। চন্দ্রশেখরবাবু বলেন,—বাদীই প্রকৃতপক্ষে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার কি না, এই সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্য তদন্তের দাবী করিয়াছিলেন; উত্তরে মিঃ কে, সি, দে বলিয়াছিলেন, রাম একথা বলিতেছে, শ্যাম সেই

কুমারের কলিকাতা বাস

কলিকাতায় বাদী হরিশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত বসু পার্ক নামে একটি বাড়ীতে বাস করিতেন। এবং তাঁহার সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও তাঁহার পুত্রবধূ বাস করিতেন। বাদী ইহাদের সঙ্গে এবং কুমারদের আর এক ভাগিনেয় জব্বু, দিগিন্দ্র ঘোষ (বাদী পক্ষের ২১২নং সাক্ষী) ও অপর তিন ব্যক্তির সঙ্গে কলিকাতায় যান। এই শেষের তিন ব্যক্তির মধ্যে দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী একজন। বাদী পক্ষের সাক্ষী মনোমোহন রায়, ও আমি যাহার সাক্ষ্য হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, এক বাড়ীতে ছিলেন। দুর্গানাথ ও মনোমোহন বাদীর কর্ম্মচারী।

বাদী এই বাড়ীতে প্রায় ৫ বৎসর বাস করেন। যেদিন তিনি কলিকাতায় পৌছেন, সেইদিনই তিনি ৮নং মধুগুপ্ত লেনে প্রথম রাণী সরযুবালা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাদী বলিয়াছেন যে, তাহাদের পরস্পর দেখা হইলে তিনি (প্রথম রাণী) তাহাকে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারেন। প্রথম রাণীও সেইভাবেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহা আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে হইবে।

১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে একবার এবং ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে একবার, বাদী অল্প কয়েকদিনের জন্য ঢাকা যান। ইহা ভিন্ন ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাস (১৩৩৬ সালের আশ্বিন) পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায়ই বাস করেন। ঐ তারিখের পর হইতে বাদী ঢাকায় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পরিবারের সঙ্গেই বাস করিতেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও বুদ্ধু ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ৪ বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতায় বসু পার্কে বাদীর সঙ্গে বাস করিয়াছেন। ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কোন বিবাহ উপলক্ষে ঢাকায় আসেন এবং আর ফিরিয়া যান নাই।

কলিকাতা অবস্থানকালে বাদী লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, বড় বড় অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, জমিদার সমিতির সভ্য হন, এবং ইষ্ট বেঙ্গল ফ্লোটিলা সার্ভিস লিঃ কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর হন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী মিঃ হলধর রায় (বাদীপক্ষের ২৪৮নং সাক্ষী) ঐ কোম্পানী পরিচালনা করেন। এই সময় তিনি হাইকোর্টের উকীল রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রায়বাহাদুর ঐ সময় হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তিনি গোবিন্দ রায়ের সঙ্গে (বাদী পক্ষের ১৫৮নং সাক্ষী) সাক্ষাৎ করেন। গোবিন্দ রায়

করিয়াছেন এবং তাহাতে দেখা যায় যে প্রজাগণ খাজানা দিয়াছে। অনেক প্রজা সাক্ষ্য দিয়াছে যে তাহারা খাজনা দিয়াছে। এই সময় খাজনা আদায় বন্ধ রাখা সম্পর্কে যে সব আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে, (একজিবিট ২১৭, ২১৪, ২৭৬, ২৬০ ইত্যাদি)। প্রজাদের উপর অত্যাচার করা হইতেছে, এইরূপ অভিযোগ করিয়া বড়রাণী ও গবর্ণমেণ্টের নিকট তার ও চিঠি পাঠান হয়। ম্যানেজার বিগনল বড় রাণীকে (দ্বিতীয় বিবাদিনী) এই বলিয়া চিঠি লিখেন যে, অনেক প্রজা খাজনা দিতে অস্বীকার করিতেছে, ইহা সত্য কথা। তিনি (বড রাণী) যেন প্রজাদিগকে সাধু আমাদের প্রিয় রমেন্দ্রনারায়ণ রায় (একজিবিট নং ৩৬৩) এইরূপ বলিতে উৎসাহ না দেন। বাদীকে খাজনা আদায় করিতে এবং জয়দেবপুর যাইতে নিষেধ করিয়া তাঁহার উপর উপর কাঃ বিঃ ১৪৪ ধারা (শান্তিভঙ্গ) অনুযায়ী আদেশ জারী করা হয় (একজিবিট ২৭৬নং)। পরে বাদী জয়দেবপুর যাইবেন না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে একটী আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

বাদী ঢাকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ ষ্ট্রীটস্থিত বাড়ীতে ক্রমাগত তিনবৎসর পুণ্যাহ করেন। সাক্ষীদের উক্তি এবং ফটোদ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। ১৯৩০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হয়—

প্রঃ—রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মহাশয় কি জানেন যে, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলায় ভাওয়াল এষ্টেটের বহু প্রজা এমন এক ব্যক্তিকে খাজনা দিতেছেন, যিনি নিজেকে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, এবং সমগ্র ভাওয়াল এষ্টেটের এক তৃতীয়াংশের মালিক বলিয়া দাবী করিতেছেন?

অনারেবল স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র—হাঁ (একজিবিট ২৬৩)

মামলার সূত্রপাত

১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল মামলা দায়ের করা হয়।

১৯৩৩ সালের ২৭শে নবেম্বর শুনানী আরম্ভ হয়। ১০ই ডিসেম্বর বাদীর সাক্ষ্য আরম্ভ হয়। তিন দিনের কিছু বেশী তাহার জবানবন্দী গৃহীত হয়। ১৫ই তারিখে তাঁহার জেরা আরম্ভ হয় এবং ২০শে পর্য্যন্ত জেরা চলিতে থাকে। অতঃপর পুনরায় বাদীকে কয়েকটী প্রশ্ন করা হইলে তাঁহাকে পুনরায় জেরা করা হয়। কারণ বাদীর পরিচয় সম্পর্কে আর

হইয়াছে। কুমার একজন শিক্ষিত লোক ছিলেন, এই সুর জেরার সময় হইতেই বাদীর অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কিছু নরম হইয়াছিল কিনা, তাহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিতেছি না।

কিন্তু পরে বিবাদীপক্ষ ইহা প্রমাণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন যে, কুমারের অতি সামান্য অক্ষরজ্ঞান ছিল এবং সামান্য ইংরেজী বলিবার ক্ষমতা ছিল। অবশেষে বিবাদী পক্ষের সাক্ষী মিঃ আর, সি, সেন আসিয়া বলেন যে, কুমারের ইংরেজী জ্ঞান মোটেই ছিল না—যাহা অনেক পূর্ব্বেই বুঝা গিয়াছিল। কুমারের তথাকথিত সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে যাহা সামান্য লেখা-পড়া জানা লোকেরও থাকে—জেরা করা ভিন্ন তাঁহাকে তাহারা স্মৃতি সম্পর্কে নামে মাত্র জেরা করা হয়। এই সম্পর্কে বিবাদী পক্ষের কৌস্থলী এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে, বাদীকে শিখাইবার যথেষ্ট সময় পাওয়া গিয়াছিল, এবং তিনি ঐ ফাঁদে পড়িবেন না; সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃত পক্ষে সামান্য কয়েকটি প্রশ্ন ভিন্ন যাহা বাদী নির্ভুলভাবে উত্তর দিয়াছেন। কুমারের স্মৃতি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হয় নাই। এবং উহার অধিকাংশ প্রশ্নই কুমারের স্মৃতি মাত্র স্পর্শ করিয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে হয়, যেন উপর হইতে 'ইঙ্গিত হইয়াছে এবং বাদীর উত্তরে চালাকি ধরা পড়িলে সোজাসুজি পলায়ন করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

জেরার আলোচনার সময় এই মন্তব্য কেন করা হইল, তাহার কারণ দেখাইব। ধরিয়া লওয়া যায় যে, কুমার বাদীর মতই অজ্ঞ, কিন্তু তাহা হইলেও বাদীকে কুমার বলা যাইবে না, যদি তাঁহাদের মধ্যে শারীরিক সাদৃশ্য বর্ত্তমান না থাকে। বাদীর সহিত কুমারের সাদৃশ্য আছে কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে শারীরিক সাদৃশ্যই প্রধান বিচার্য্য বিষয় হইবে। একজন মৃতব্যক্তি অথবা পাগলকে কেহ সনাক্ত করিতে পারে। কিন্তু যেখানে এই সনাক্ত করণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে এবং যে সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী প্রমাণ রহিয়াছে, সেখানে ব্যক্তি বিশেষের মত মনকেও লক্ষ্য করিতে হইবে। যেখানে (যেমন বর্ত্তমান মামলায়) শিখাইয়া রাখা হইয়াছে, এই অজুহাতে ইচ্ছা করিয়া মনের কোন সন্ধানই করা হয় নাই এবং যে স্মৃতির ভাণ্ডার কোন কৌশল দ্বারাই কাল্পনিক প্রতিপন্ন করা সম্ভব হইত না, সেই ক্ষেত্রেব শারীরিক সাদৃশ্যই প্রধান বিচার্য্য বিষয়; সুতরাং আমি এখন জেরা এং বাদী মামলার পূর্ব্বে যে সব সাক্ষীদের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, সেই সাক্ষ্য আলোচনা করিব; কিন্তু আমাকে শরীর সম্পর্কেই প্রথম আরম্ভ করিতে হইবে।

চিরকাল অন্য একজনকে দেখিয়া আসিয়াছে, সে অপর ব্যক্তির শিশুকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যে কোন সময়ের গৃহীত ফটো হইতেই তাহাকে চিনিতে পারিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ মেজকুমারের যে আটখানা ফটো দাখিল করা হইয়াছে, তাহার কথাই ধরা যাক। ১নং একজিবিটে তিনি একটি ক্ষুদ্র বালক। ৪০ একজিবিটে তাঁহাকে ১৪ বৎসরের একটী বালকরূপে দেখা যায়। বাদী পক্ষের ৬৩নং সাক্ষী মুখুটি, যিনি ঐ ফটোতে কুমারের সহিত রহিয়াছেন, তিনিও একথা বলেন। ক (১৫নং) একজিবিট একটি আধুনিককালের ফটো এবং ১১নং একজিবিট আরও পরবর্ত্তী কালের। বাদীর উক্তি অনুসারে উহা দার্জ্জিলিং যাওয়ার পূর্ব্বে গৃহীত। এক্ষণে এই ফটোগুলির কোন দুইটিই যাঁহারা কুমারকে দেখেন নাই, তাঁহাদের নিকট একই ব্যক্তির ফটো বলিয়া বোধ হইবে না; যাঁহারা কুমারকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কিন্তু কুমারকে চিনিতে অসুবিধা হয় নাই। রাণী (১নং বিবাদিনী) (একজিবিট নং ৪০এ) তাঁহার স্বামীকে চিনিতে পারেন নাই। তাহার কারণ তিনি তাঁহাকে ১৪ বৎসর বয়সে দেখেন নাই। বীরেন্দ্র (বিবাদীপক্ষের ২৯০নং সাক্ষী) যাহার সঙ্গে কুমারের পরে পরিচয় ঘটিয়াছিল, তিনিও তাঁহাকে ঐ ফটোতে চিনিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, না বলিয়া দিলে ঐ ফটো যে মেজকুমারেরই ফটো, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না। আপনারা যদি ১১নং একজিবিট মধ্যস্থিত মেজকুমারের ফটো, (ক) ১৫নং একজিবিটে ফ্রক ও কোট পরিহিত মেজকুমারের ফটো এবং বাদীর শ্মশ্রুবিহীন যে কোন ফটো দেখেন, তাহা হইলে কুমারকে পূর্ব্বে না দেখিয়া থাকিলে আপনারা সকলেই উহা বিভিন্ন ব্যক্তির ফটো বলিয়া মনে করিবেন। আর আপনাদিগকে যদি বলা হয় যে, এই ফটোগুলির মধ্যে যে কোন দুইখানিতে একই ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস আপনারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া পরে যে ধারণাই করুন না কেন—প্রথমেই আপনারা ফ্রক ও কোট পরিহিত ফটো এবং বাদীর ফটো—এই দুইখানার দুইটি ফটো বলিয়া বাছিয়া লইবেন। যাহা সহজেই ধরা যায় বলিয়া আমার নিকট বোধ হয়, তাহা নিয়াই আমি এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। ইহার কারণ এই যে, মিঃ চৌধুরী এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন এবং এমন কি মিঃ পার্সি ব্রাউন এবং মিঃ মসলহোয়াইট মূলতঃ ইহা স্বীকার করিয়া নিলেও এই সহজ সত্যটি অস্বীকার করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন—এতদ্ব্যতীত ইহাও বলা প্রয়োজন যে, শুধু ফটো দেখিয়াই আমরা এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিতে পারি না।

বিবাদীপক্ষের সাক্ষীরা বলিয়াছে, তাহারা বাদীকে প্রথম হইতেই ভিন্ন লোক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। বাদী পক্ষের বহু সাক্ষী বলিয়াছে, তাহারা বাদীকে খাজানা বা নজর দিয়াছে। এই দুই দলের সাক্ষীদের উক্তি সম্বন্ধে কোনও কিছু সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে এই সম্পর্কে দুইখানি চিঠির কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ১৯৩৩ সালের ৩১শে মে বর্ত্তমান মামলা দায়ের হইবার প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে, রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জী জনৈক নায়েবকে বাঙ্গালায় যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

"রাজ তরফে সাক্ষ্য দিবার জন্য আপনি যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন, তাহাদের জবানবন্দী লইয়া আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। কি রকম জবানবন্দী দিতে হইবে, তাহার নমুনা এই সঙ্গে পাঠাইলাম, দেখিবেন, সাক্ষীদের সকলেই যেন একই কথা একইভাবে আবৃত্তি না করে। অপরপক্ষ যাহাদের সাক্ষী মানিয়াছে, তাহাদেরও তলব করিয়া ঐরূপ জবানবন্দী লিখাইয়া লইবেন।"

জবানবন্দীর নমুনা নিম্নলিখিতরূপ (একজিবিট ৩০৯ (১) :—

"আমার বয়স......আমি......রাজ সরকারে খাজানা দেই। মধ্যম কুমারের জীবিতকালে আমি বহুবার রাজবাড়ীতে দরবারে গিয়াছি। সকল কুমারকেই আমি চিনিতাম; তাঁহারাও সকলে আমাকে চিনিতেন। পরলোকগত মধ্যমকুমার বিচার করিতেন, তাঁহার নিকট বহুবার আমি খাজানা দিয়াছি এবং তাঁহাকে খুব ভাল করিয়া চিনিতাম, এই সন্ন্যাসী হিন্দিতে কথা বলেন; স্বর্গত মধ্যমকুমার আমাদের সহিত বাঙ্গালায় কথা কহিতেন।

মধ্যমকুমারের কণ্ঠস্বর ও চেহারার সহিত সন্ন্যাসীর কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। মধ্যমকুমারের (সন্ন্যাসীর) আগমনকাল পর্য্যন্ত আমি কোনও দিনও গুজব শুনি নাই যে, তাঁহার শবদাহ হয় নাই, বা তিনি প্রকৃত পক্ষে মারা যান নাই। এই সন্ন্যাসী যে মধ্যমকুমার ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জী এই মামলায় বিবাদী পক্ষের প্রধান তদ্বিরকারক ছিলেন। তিনি এই চিঠির কথা (৩০৯নং একজিবিট) স্বীকার করিয়াছেন।

অপর চিঠিখানি (৩৫৩ (১) নং একজিবিট) ভাওয়াল এষ্টেটের জনৈক ইনস্পেক্টারের সার্কুলার। উহা 'লিথো' করা ছিল এবং উহাতে বিভিন্ন

যাইত। সকালে তিনি প্রায়ই অশ্বশালায় যাইতেন, তিনি পিলখানায়ও যাইতেন। হস্তীপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠে, গাড়ীতে তিনি বাহির হইতেন। রথে রাজবাড়ীর সম্মুখের ময়দানে, হাটে, রেলওয়ে ষ্টেশনে তিনি যাইতেন; শিকার করিতে তিনি জঙ্গলেও যাইতেন। বিবাদী পক্ষের সাক্ষীগণ ইহার অধিকাংশই স্বীকার করিয়াছেন এবং অন্যান্য কেহও ইহা অস্বীকরে করেন নাই। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে পাহারা নিযুক্ত করিয়া, চিড়িয়াখানায় প্রবেশের নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক করিয়া অথবা নাটমন্দির বা অন্য প্রজা বা দর্শকের সম্মুখে বাহির হওয়া লজ্জার বিষয়, বলিয়া গানের সময় নাটমন্দিরের কোন ঘরের মধ্যে কুমারের বসিবার বন্দোবস্ত হইত। দ্বিতীয় কুমারকে লোকচক্ষুর আড়াল রাখিতে বিবাদীগণ সক্ষম ছিলেন না। এইরূপ কিছুই ছিল না; বরং কুমারের পক্ষে ইহা শিষ্টাচারেরই বিষয় ছিল। প্রজারা অবশ্যই কুমারের নিকট হইতে দূরেই থাকিত। কিন্তু ম্যানেজারগণকে স্মরণে রাখা, ভূমিকম্পে রাজবাড়ীর ক্ষতির কথা, পিলখানা বর্ত্তমান স্থানে সরাইবার ঠিক সময় বলা, তাহাদের বয়সের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অন্যান্য তারিখগুলি ঠিক ঠিক বলা, প্রভৃতি না বলিতে পরিলেও কিম্বা দ্বিতীয় কুমারের সহিত তাহাদের কোন কাজ কারবার না থাকিলেও, তাহারা নিশ্চয়ই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তাঁহাদের মালিককে দেখিয়াছিল।

ম্যাপ লক্ষ করিলে দেখা যায় যে, এই সমস্ত প্রজার অধিকাংশেরই বাড়ী জয়দেবপুর হইতে তিন মাইল দূরের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামে এই জয়দেবপুরেই তাহাদের রেলওয়ে ষ্টেশন, তাহাদের বাজার এবং ইহাই তাহাদের মালিকের বাড়ী। বিবাদীগণ নিজেরাই সে সমস্ত প্রজা সাক্ষী হাজির করিয়াছেন, তাহাদিগের কথার দিক হইতে বিচার করিলেও আমার নিকট ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয়, প্রজারা যে কুমারকে দেখে নাই, এই মতবাদ কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল।

প্রজাদের দৃষ্টিতে মধ্যম কুমার •

আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এই সকল প্রজারা কুমারদিগকে দেখিয়াছিল এবং দ্বিতীয় কুমারকে প্রায় সকলেই দেখিয়াছিল। আমি এই সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ যে, তাহারা বাদীকে কুমার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। তবে প্রাচীন রাজপরিবারের প্রতি ভক্তি থাকায় এবং চেহারার সাদৃশ্যের দরুণ ভুল করিবার সম্ভাবনা থাকায় অন্য কোনভাবে কুমারের সাদৃশ্য প্রমাণিত না হইলে এই মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া কেবল প্রজাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, এমন যে সকল লোক কুমারকে চিনিতেন এবং তাঁহাদের নিকট মাত্র এই প্রশ্নই করা হইয়াছে যে, কুমারের কথা তাঁহাদের কতদূর মনে আছে।

যাহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা কম প্রশ্ন উঠিবে আমি তাহাদের সাক্ষ্যই বিশ্লেষণ করিব।

যাঁহারা মেজো কুমারকে সত্য সত্যই চিনিতেন

(১) বাদী পক্ষের ৬৬০নং সাক্ষী কুমারদের ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

পূর্ব্বে না হইলেও ১৯২১ সালের ৪ঠা মে আত্মপরিচয়ের দিন হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বাদীকে তাঁহার ভাই বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিবার যে যথেষ্ট কারণ আছে তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং আমি ইহা বিশ্বাস করি। তিনি আন্তরিকভাবে এ বিশ্বাস করিয়াছিলেন—রায় সাহেবও মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি আন্তরিকভাবেই এ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এবং উহাই মিঃ নীডহ্যামের রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছিল মিঃ নীডহ্যামের রিপোর্ট বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারই রিপোর্ট, তিনি কুমারকে অন্যান্যের মতই জানিতেন, তিনি সাধুকেও দেখিয়াছিলেন, যে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, তাঁহার ছেলেমেয়েরা এবং তাঁহার ভগিনীর ছেলেমেয়েরা সাধুকে কুমার বলিয়া সরল মনে বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

এদিকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বিরুদ্ধে বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন যে, তিনি, তাঁহার ভগিনী ও তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সকলেই কুমারদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজবাড়ীতে আরামে বাস করিতেছিলেন, পরে তাঁহাদিগকে রাজবাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং ছোট রাণী পোষ্য গ্রহণ করিলে তাঁহাদের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইয়া যায়। তাঁহারা যে তাঁহাদের ভ্রাতাদের পরিবারের লোক হিসাবে বাস করিতে ছিলেন, তাহা সত্য। ছোট রাণী দত্তক গ্রহণ করিলে তাঁহাদের পুত্রদের এষ্টেট পাইবার আশা যে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল, তাহাও সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগকে রাজবাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই কথা জ্ঞানকৃত মিথ্যা। ছোট কুমারের মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইন্দুময়ী দেবীর বাড়ী নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছিল, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ী নির্ম্মিত হইতে ছিল, এবং ছোট কুমারের যেদিন মৃত্যু হয়, সেইদিন হইতেই তাঁহারা আর জয়দেবপুরের বা নলগোলা রাজবাড়ীতে প্রবেশ করেন নাই। আমি এ স্থলে যাহা বলিলাম, কেহই এমন কি, স্বয়ং রায় সাহেবও তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। মিঃ চৌধুরী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে শুধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

কখনও স্বীকার করেন নাই, এবং বরাবর তিনি ঐ দত্তক পুত্রকে 'তথাকথিত দত্তক পুত্র' বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। একখানা পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীযুক্তা আনন্দকুমারী দেবী যে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমি কখনও বৈধ বলিয়া স্বীকার করি নাই।" সুতারং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যে, এষ্টেটের যে সকল এজমালী ব্যয় হইত তাহার উপর তিনি কড়া নজর রাখিতে এবং যে সকল ব্যয়ে ছোটরাণী উপকৃতা হইবেন বলিয়া মনে করিতেন ঐ সকল বিষয়ে তিনি আপত্তি করিতেন। বাদীর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেজরাণীও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া এরূপ আপত্তি করিতেন। ছোটরাণীর পোষ্য রদের জন্য ব্রজলাল বাবু যে মামলা আনিয়াছিলেন, সেই মামলায় সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে মেজরাণীও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এককথায় বলিতে গেলে ছোটরাণী সম্পর্কে বড়রাণীর মনোভাব একরূপ ছিল এবং উভয়েই দত্তক গ্রহণে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তাহা নহে, তাঁহাকে উপযুক্তভাবে সংবাদ দেওয়া হয় নাই বলিয়া কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বড়রাণী বলিতেছেন যে, ছোটরাণী যে বালকটিকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মায়ের গোত্র ও ভাওয়াল রাজপরিবারের অজ্ঞাত বলিয়া তিনি দত্তকগ্রহণ অবৈধ মনে করেন, কিন্তু ছোটরাণী বলিয়াছেন, শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখায়াই যে, বড়রাণী তাঁহার দত্তক গ্রহণে আপত্তি করেন তাহা নহে, বড়রাণী তাঁহাকে বড়রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে অসম্মত হওয়ায় বড়রাণী তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, বাদীর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছোটরাণীর প্রতি বড়রাণী ও মেজরাণীর মনোভাব একরূপ ছিল, কিন্তু তাহার পর স্বার্থসমন্বয়বশতঃ মেজরাণী ও ছোটরাণী ক্রমেই একদিকে যাইতে থাকেন; সাধু সম্পর্কে বড়রাণীর মনোভাব ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত মেজরাণীর বিরুদ্ধে ছিল না। বড়রাণী বলিয়াছেন, ১৯২৪ সালে সাধুকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারেন। বাদী আত্মপরিচয় দিবার কিছুদিন পর ১৯২১ সালের মে মাসে মেজরাণী ও ছোটরাণী মোহিনীবাবুকে কাজে রাখিবার জন্য পাগলপ্রায় হইয়া রেভিনিউ বোর্ডে তার করিতেছিলেন, কারণ তাঁহাকে বদলী করিবার কথা হইয়াছিল (একজিবিট ২৩৮ ও ২৩৯)। ১৯২১ সালে ২৭শে অক্টোবর তারিখে কালেক্টর মিঃ লিণ্ডসে বড়রাণীর নিকট একটি চিঠি লিখিলে, বড়রাণী তাঁহার নিকট দার্জ্জিলিংএ মেজকুমারের পীড়া

মাসে বাদীকে দেখিয়াই যে তিনি তাঁহাকে মেজকুমার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ আছে। সত্যবাবুও তাহা জানিতেন, সুতরাং তিনি বলিয়াছিলেন যে, মেজরাণী সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বেই জানাজানি হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি ছোটরাণীর দত্তক গ্রহণ সমর্থন করিবেন, সুতরাং এই সুযোগে হয়ত বড়রাণী সাধুকে মেজকুমার বলিয়া গ্রহণ করিয়া "এক ঢিলে দুই পাখী মারিবেন।" উহাতে ছোট রাণীকেও মারা হইল এবং মেজরাণীকেও মারা হইল। (ছোটরাণী দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মেজরাণী দত্তক গ্রহণ সমর্থন করিয়াছিলেন)। অবশ্যই বড়রাণীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব সম্বন্ধে সত্যবাবু নিজে কিছু জানিতেন না।

রাণীত্রয়ের মনোভাব

বড়রাণী ১৯২৪ সালে বাদীকে মেজকুমার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইহেতু সত্যবাবু বলিয়াছেন যে, দশবৎসর যাবৎ মেজরাণীর সঙ্গে বড়রাণীর মনোমালিন্য চলিতেছে। এই কথা সত্য নহে; কিন্তু পোষ্যদের মামলায় ছোটরাণীর পোষ্যগ্রহণে তাঁহার বিরোধিতার উপর একটি অভিসন্ধি আরোপের চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল, তখন ইহা ছাড়া বড়রাণীকে অপদস্থ করার অন্য কোন উপায় ছিল না। সেই মামলায় বড়রাণীর জেরার সময় বলা হয় নাই যে, মেজরাণীর সঙ্গে তাঁহারও মনোমালিন্য আছে। মেজরাণীও তাঁহার পূর্ব্বের সাক্ষ্যে তাহা বলেন নাই। তিনি অস্বীকার করেন নাই যে, তিনি কমিশনে সাক্ষ্য দিবার একমাস পূর্ব্বেও তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁহার হাত নাই বলিয়া, তিনি যদি তাঁহাকে দুর্ভাগিনী মনে না করিতেন, তবে ঐরূপ ব্যাপার বিস্ময়কর মনে হইত। আসল কথা যে, এই দুই রাণীর মধ্যে অসদ্ভাব ছিল না, যদিও বড়রাণী ১৯২৪ সালে বাদীকে মেজকুমার বলিয়া গ্রহণ করিবার পর হইতেই, বড়রাণী ও মেজরাণীর মধ্যে মতদ্বৈধ হইয়াছিল। এই মতদ্বৈধ, "কারণ" নহে—উহা 'ফল'। আমার মনে হয় না যে, ছোট রাণীর সম্পর্কে বা তাঁহার দত্তক গ্রহণ সম্পর্কে বড়রাণীর মনোভাব যাহাই হউক না কেন, তিনি মেজরাণীকে এইরূপ প্রচণ্ড আঘাত করিবার জন্য বাদীকে দেখা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। আগাগোড়া ইহা প্রমাণের জন্যই বড়রাণীকে জেরা করা হইয়াছে যে, তিনি ১৯২৪ সালে বাদীকে দেখেন নাই। দেখিলেও চিনিতে পারেন নাই, এবং ছোটরাণীর সহিত তাঁহার মনান্তর ছিল বলিয়াই—ছোটরাণীর দত্তকগ্রহণ তিনি সমর্থন

এষ্টেটের খরচ সম্পর্কে তিনি যে সকল আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারিত, ঠিক এইরূপেই, যে সকল উকীল ও প্রজা এই মামলায় সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বাদীকে মেজ কুমার বলিয়া চিনিয়াছেন, তাঁহারাও খাজনার মামলা এবং অন্যান্য মামলা ধরিয়া লইয়াছে যে, মেজকুমার মারা গিয়াছেন এবং মেজরাণীই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। কুমার জীবিত কি মৃত এই প্রশ্ন ঐ সকল নামমাত্র অনাবশ্য বলিয়া তাঁহারা ঐ প্রশ্ন ঐ সকল মামলায় উত্থাপন করেন নাই।

বড়রাণীর মনোভাব

এই মহিলা বলিয়াছেন যে, তিনি যে বাদীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহা মিঃ কে, সি, দে, মিঃ জে, এন, গুপ্ত, মিঃ সাকৃসি প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট জানাইয়াছিলেন। মিঃ গুপ্ত কমিশনে বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহাকে এই বিষয়ে কোন জেরা করা হয় নাই। মিঃ কে, সি, দে বলিয়াছেন যে, ১৯২৫ কি ১৯২৬ সালে কলিকাতায় এই মহিলা যে বাদীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহা মিঃ দে'কে জানাইয়াছিলেন। মিঃ দে বলিয়াছেন,—"এই মহিলা নিজ মুখে আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি বাদীকে চিনিতে পারিয়াছেন।" ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি মিঃ ড্রামণ্ডের কাছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসের পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিবাদী পক্ষ কর্ত্তৃক প্রমাণিত পূর্ব্বের কতকগুলি চিঠিপত্র হইতে জানা যায়। ১৯২৪ সালের ৮ই আগষ্ট কৃপাময়ী দেবীর উইল অনুযায়ী প্রাপ্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য কুমারের ভগ্নী ও ভাগীনেয়দের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা উঠিলে তিনি তাহাতে আপত্তি করেন। এই মামলায় সাধুকে দাঁড় করান হইতে পারে বলিয়া তিনি জানান। এজমালী সম্পত্তির আয় হইতে মামলার খরচা চালাইতে হইবে বলিয়া স্থির হইলেও তিনি আপত্তি করেন। ১৯২৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বিহারী সাহা নামে একব্যক্তি সাধুকে চিনিতে পারিয়াছে জানিয়া, তখন তাহাকে স্থান ত্যাগ করার নোটীশ দেওয়া হয়। তখনও তিনি মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাকে সমর্থন করেন। ঐ বৎসর ২৭শে সেপ্টেম্বর ফণীবাবুর এষ্টেটের ভার যাহাতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস হাতে না লয় তজ্জন্যও তিনি পীড়াপীড়ি করেন; কারণ তাহাতে সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত সাধুর পক্ষে ক্ষতিকারক হইবে। ১৯২৫

এই মহিলা কুমারকে চিনিতেন না, এইরূপ কোন কথা উঠে নাই। তাঁহার কথায় পরিচয়ের অর্থ প্রকাশ পায় না, ইহাও বলা হয় নাই। আগে মেজকুমার উত্তর পাড়ায় পাঁচ ছয়বার গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে মেজকুমারের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, একথাও সত্য। জেরার সময় প্রমাণ করিবাব চেষ্টা হইয়াছে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন। ইহার কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, তাঁহার স্বামী অর্থবান লোক নহেন এবং প্রথম পুত্র কৃষ্ণকুমারের অন্নপ্রাশনের সময়, এই ভদ্রলোককে প্রতাপনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে অপমান করা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, ঐ সময় মেজরাণীর পিতা তাঁহার স্বামীকে দারোয়ান দ্বারা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন কি না? মোটের উপর এই কথাই প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে যে, তিনি প্রতাপনারায়ণের পরিবারের পরিত্যক্তা কন্যা; সুতরাং এই জাতীয় মামলায় পিসতুতু বোনের বিরুদ্ধে তাঁহার দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ান সম্ভবপর! তাঁহার স্বামী কিছু জমিদারী আছে এবং তজ্জন্য একজন নায়েবও নিযুক্ত আছেন,—এইকথা জানা যায়। প্রতাপনারায়ণ বাবুর বিধবা স্ত্রী ঢাকায় আসিয়া বাদীপক্ষে আমার এজলাসে সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই যুক্তিতেও তাঁহার সাক্ষ্য ঠিক নহে; এইরূপ প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু উহা একেবারে কল্পনাপ্রসূত। আমার ধারণা এই মহিলা বাদীকে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন কিংবা চিনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

মেজোরাণীর মামী সরোজিনী দেবীর সাক্ষ্য

ইনি মেজরাণীর মাতুল প্রতাপনারায়ণের বিধবা স্ত্রী। মেজরাণীর বিবাহের সময় ইনি প্রতাপনারায়ণবাবুর সহিত জয়দেবপুরে আসিয়াছিলেন, ১৮৯৯ সালে প্রতাপবাবুর সহিত ইহার বিবাহ হয়, সতীন-কন্যা পূর্ণসুন্দরীর তৎপূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল। সরোজিনী দেবী স্বামী-গৃহে আসিয়া মেজরাণীর মাতা ফুলকুমারীকে পুত্র কন্যা সহ তথায়ই দেখিতে পান। মেজরাণীর মাতা তথায় আরও দুই বৎসর (সরোজিনী দেবীর বিবাহের পরে) ছিলেন। অতঃপর ফুলকুমারী তাঁহার আর এক ভ্রাতা রামনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে যান। ফুলকুমারী দেবী, সত্যবাবু ও অন্যান্য ছেলেমেয়েদের লইয়া রামনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। মেজরাণীর তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

এই মহিলা বিবাহের সময় জয়দেবপুরে আসিয়াছিলেন। এসময় তিনি মেজকুমারকে তথায় এবং উত্তরপাড়ায় দেখিয়াছেন। মেজকুমারকে উত্তরপাড়ায়

ফণীবাবুর মাসীমা কমলকামিনী দেবী বিবাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। শিবমোহিনী (কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন), কৃপাময়ী (বাদী পক্ষের ৯৬২ নং সাক্ষী), আশুতোষ গাঙ্গুলী (বাদী পক্ষের ৪৬৪নং সাক্ষী) প্রভৃতি দূর-সম্পর্কিত আত্মীয়গণকে আমি ধরি না, তবে অনন্তকুমারীর (কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন) কথা আলাদা। তিনি আত্মীয় অপেক্ষাও বেশী ; তাঁহার স্বামী কুমারদের ও তাঁহাদের পিতার আমলের কর্ম্মচারী এবং জ্ঞাতি। রাজ-বাড়ীতেই অনন্তকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল। যখন তাঁহার বিবাহ হয় সে সময় মেজ কুমারের বয়স মাত্র ছয়মাস ছিল। তিনি তাঁহাকে আজীবন চিনিতেন।

বিবাদীপক্ষীয় আত্মীয়-সাক্ষী

ফণীবাবু, তাঁহার ভগ্নী শৈবলিনী এবং এষ্টেটের কর্ম্মচারী, শৈবলিনীর জামাতা ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয়ই বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ১নং বিবাদিনীর উত্তরপাড়াস্থ অনেক আত্মীয়ও তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া বাদীকে প্রতারক প্রমাণ করিতে আসেন নাই। শুধু জ্ঞাতি ভগ্নী সুকুমারী দেবী সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় বাস করেন, তাঁহার অস্বীকৃতি এবং ভাবগতিক সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইবে। রামনারায়ণের বিধবা মা এখনও জীবিত আছেন, এবং উত্তরপাড়া পরিবারে এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা কুমারকে চিনিতেন। কোন পক্ষই তড়িন্ময়ীকে সাক্ষী মানে নাই। তিনি কেন সাক্ষ্য দিতে পারেন নাই, এবং বিবাদী পক্ষও এই প্রসঙ্গের উপর জোর দেন নাই, তৎসম্পর্কে ইতিমধ্যে বলা হইয়াছে। তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করিব, তবে বর্ত্তমানে তাঁহার সম্পর্কে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মিঃ লিণ্ডসের পত্র এবং সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, তিনি তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন (এক-জিবিট নং ৪৩৫ দ্রষ্টব্য)। তিনি সত্যভামা দেবীর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন ; শ্রাদ্ধের সময়ও ছিলেন ; ১৯২১ সালের মে মাসে তদন্তের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি ছিলেন।

সাক্ষী বিষয়ে অন্যান্য কথা

উপরে যে সকল আত্মীয়দের নাম করা হইয়াছে, তাঁহারা মেজকুমারকে যে চিনিতেন তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নই নাই। কুমারদের মামী সোনামণি এবং সুধাংশুবালা, বাদীর কলিকাতা অবস্থানকালে তাহাকে দেখিয়াছেন। বাদী

ঢাকা আসিলে পর ১৯২১ সালের জুন মাসে অখিলবাবু তাঁহাকে চিনিতে পারেন। অবশিষ্ট আত্মীয়গণ ১৯২১ সালের মে মাসে বাদীর জয়দেবপুর অবস্থানকালে বাদীকে চিনিতে পারেন। তাঁহারা সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, বাদীও তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন। প্রথমাবস্থায় যে সকল বড় বড় সভা হইয়াছে, ঐ গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা অসম্ভব। বহুলোক বলিয়াছে যে, বাদী তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। ইহার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি। বাদীর আলোচ্য বিষয়গুলি জানিবার বিষয়। বিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষী জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন যে, বাদী যাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদিগকে স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে চিনেন নাই বলিয়া বলিয়াছেন। বিবাদী পক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, বুদ্ধু বাদীর নিকটে ছিল, সেই পুরাতন ঘটনাগুলি বলাইতেছিল ; বাদী হিন্দী বলিতেছিলেন, বুদ্ধু উহার তর্জ্জমা করিতেছিল। বাদী হিন্দী বলিতেছিলেন, কি না, ইহাই বুদ্ধুর সাক্ষ্য হইতে জানিবার বিষয়। এই সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করিব।

আত্মীয়বর্গের মধ্যে সত্যভামার ভাগীনেয়গণ। বলিতে গেলে সারাজীবনই জয়দেবপুরে কাটাইয়াছে, এবং কৃপাময়ীর সপত্নী-পুত্র সুরেশও তাহাই করিয়াছে। তাহার আত্মীয় ভ্রাতা বসন্ত জয়দেবপুরে থাকিয়াই শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং পরে জয়দেবপুরেই চাকুরী করিয়াছে। এই দুইজনের মধ্যে সুরেশের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিতে হয়। এক পক্ষে সুরেশ এবং অন্যপক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী, তাঁহার ভগ্নী ও ভগ্নী পুত্রগণ—এই দুই পক্ষে কৃপাময়ীর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত মামলা চলিতেছিল, এবং এই অবস্থায় সুরেশ মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে সাহায্য করিবে, ইহা কতকটা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়।

জয়দেবপুরের অনন্তকুমারী, মোক্ষদা ও কুলদা—এই তিনজন বৃদ্ধা মহিলার দিকেও একটু বিশেষলক্ষ্য করিতে হইবে, এই তিনজন ছোট বেলায় বিবাহের পর হইতে সমস্ত জীবনই জয়দেবপুরে কাটাইয়াছেন। তাঁহারা রাণীর বন্ধু ছিলেন, এবং কুমারগণ ও কুমারদের পত্নিগণ তাঁহাদিগকে গুরুজনের ন্যায় মান্য করিতেন। মেজরাণী এবং ছোটরাণী ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা মেজকুমারকে তাঁহার জন্মকাল বা প্রায় ঐ সময় হইতেই দেখিয়া আসিয়াছেন। কুমার একজনের স্তন্যও পান করিয়াছেন। যদি ইহাদিগের

আদৌ সঙ্গত হইবে না যে, তাহাদের কেহ কুমারকে চিনিত না, অথবা কুমারের কথা তাহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল।

সনাক্তকারী সাক্ষীদিগের পরিচয় বিশ্লেষণ

বাদী পক্ষের ৬২নং সাক্ষী রেবতীমোহন ঘোষ। ঢাকার একজন প্রবীণ উকিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি রাজপরিবারের সকলকে জানেন। তিনি নলগোলার রাজবাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। সেখানে তাঁহার ভগ্নীপতি সপরিবারে থাকিতেন। সাক্ষীর উক্ত ভগ্নীপতি রাজ এষ্টেটের মোক্তার ছিলেন। ইনি ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত এই জয়দেবপুর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯০৫ সালে ইনি ঢাকায় ওকালতী আরম্ভ করেন। তখনও ইনি রাজ বাড়ীতেই থাকিতেন। রাজবাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকে ১৯০৯ সালে তাঁহার নিজের বাড়ী নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাক্ষী রাজ-সংসারেই ছিলেন। ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত সাক্ষী ভাওয়াল এষ্টেটের উকীল থাকেন। কুমারদিগের সহিত সাক্ষী ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন; সাক্ষী তাঁহাদিগকে বিশেষভাবেই চিনিতেন। দার্জ্জিলিং রওনা হইবার দশ দিন পূর্ব্বেও সাক্ষী মধ্যম কুমারকে দেখিয়াছেন। জয়দেবপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় সাক্ষী মধ্যম কুমারকে ইংরেজী শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা কালে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। কোনও সাক্ষীই সম্ভবতঃ বলিতে পারিবেন না যে, এই সাক্ষী কুমারদিগকে জানিতেন না এবং রাজপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ও সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। এই সাক্ষীর বিরুদ্ধে একমাত্র বলিবার বিষয় এই যে, একটী মামলার কোনও নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর স্বত্ব হস্তান্তরিত-করণ বিষয়ক প্রশ্ন বিচারকালে মুন্সীগঞ্জের জনৈক মুন্সেফ তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন, এই সাক্ষী ঐ মামলায় বিবাদী ছিলেন।

বাদীর ৬১নং সাক্ষী পরেশনাথ বিশ্বাস (বয়স ৭৭ বৎসর) ভাওয়ালের একজন সম্ভ্রান্ত তালুকদার। ইনি বখতিয়ারপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। রাজার সহিত সাক্ষীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাজার মৃত্যুর পর ইনি বিষয়কার্য্যে রাণীকে পরামর্শ দিতেন। রাণীর মৃত্যুর পরও রাজপরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, তখনও রাজবাড়ীতে তিনি যাতায়াত করিতেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই।

বাদীর ৬৩নং সাক্ষী, রাজকুমার মুখোটী (বয়স ৬৩ বৎসর) ময়মনসিংহের একজন মোক্তার। ১১নং একজিবিটে প্রদর্শিত ফটোতে কুমারের সহিত ইহাকে দেখা যায়, সাক্ষীর শ্বশুর রাজবাড়ীর পুরোহিত ছিলেন। সাক্ষীর

হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। ১৯২১ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয় তৎপর আর তিনি ব্যবসা করেন নাই, তিনি রিসিভার, তজ্জন্য এবং অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে অবশ্য তিনি প্রত্যহ হাইকোর্টে যান। তিনি বারদীর সুপ্রসিদ্ধ নাগ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয় আছে, তাঁহার আরও দুই ভাই আছে, তাঁহারা বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ১৯০৩ সালে ঢাকাতে তাঁহার সহিত মেজকুমারের পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা জ্ঞানবাবুর সহিত মেজকুমারের বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার যোগে মেজকুমারের সহিত তাঁহার খুব ভাব হয়। ১৯০৩ সাল হইতে ১৯০৪ সালের জানুয়ারীর মধ্যে তিনি প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন। তৎপর ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি সময় হইতে যে সময় তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কিত খবর বাহির হয়, সেই সময় পর্য্যন্ত খুব দেখাশুনা হইত। একদিন গভীর রাত্রে মেজকুমার তাঁহার বাড়ীতে আসেন এবং সাক্ষীর পিতার নিকট হইতে ঋণ লইয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে বলেন, তিনি ঠিকা গাড়ীতে আসিয়াছিলেন। গাড়ীতে আরো লোক ছিল। মদ্যপান করিয়াছিলেন। সঙ্গীয় স্ত্রীলোক'দের জন্যই তিনি টাকা চাহিয়াছিলেন। সাক্ষী জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐ রাত্রির আগমনটা একটা অস্বাভাবিক। তিনি কুমারের চরিত্র অবগত ছিলেন, তাহাও স্বীকার করেন। সাক্ষীকে দেখিতে খুব বিমর্ষ বলিয়া মনে হয়, যে লোককে তিনি প্রতারক বলিয়া মনে করিবেন, তাহার জন্য তিনি কখনই তাঁহার নিজের জীবনের একটা গোপনীয় অধ্যায় সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন বলিয়া আমি মনে করি না।

সাক্ষাতের বিবরণ

বাদীর সহিত তাঁহার প্রথম দিনের সাক্ষাৎটা একটা চমকপ্রদ ঘটনা। রাজা শ্রীনাথ রায়কে উপাধি দান উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা করিবার উদ্দেশ্যে একটা কমিটি গঠিত হয়। ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল মিঃ এস, আর, দাস উহার সেক্রেটারী এবং সাক্ষী উহার এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সাক্ষী এই উৎসব সম্পর্কিত সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত লোকদের তালিকার মধ্যে বাদীর নাম দেখিয়া তিনি আপত্তি করেন, এবং বলেন যে উক্ত লোককে প্রতারক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তাঁহাকে এই সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়, অতঃপর তিনি বলেন, আচ্ছা! তিনি কুমার কি না তাহা দেখিবার জন্য আমি যাইতেছি, যদি তিনি কুমার হন তবে নিশ্চয়ই আমাকে চিনিবেন। ইহা ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসের ঘটনা। ঐ সময় বাদী কলিকাতায় ছিলেন। সাক্ষী বাদীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া হরিশ

একজন বাঙ্গালী যিনি ১২ বৎসর যাবৎ হিন্দী ব্যতীত অন্য ভাষায় কথা বলেন নাই, সেই রকম বাঙ্গালীর বাঙ্গালা, তাহাই আলোচ্য বিষয়। এই সম্পর্কে বহু সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, অতঃপর এই সম্পর্কে আলোচনা করা যাইবে। এই সাক্ষী যৌবনে কুমার এবং তাঁহার স্ত্রীলোকদের সহিত মিলিয়াছেন, উহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না।

বাদী পক্ষের ৬৬৬নং সাক্ষী রমেশচন্দ্র চৌধুরী, জমিদার, বয়স ৫০ বৎসর, ঢাকার একজন ভূতপূর্ব্ব গভর্ণমেণ্ট উকীলের পুত্র। এই গভর্ণমেণ্ট উকীল ও রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ পরম বন্ধু ছিলেন। এই গভর্ণমেণ্ট উকীলের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে রাজা উপস্থিত ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর এই সাক্ষী কুমারদের নিকট বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়াছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই।

বাদীপক্ষের ৬৩১নং সাক্ষী সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর। ইনি রাজাকে ও কুমারদিগকে জানিতেন। চাকুরীর কর্ত্তব্যে তাঁহাকে জয়দেবপুরে যাইতে হইয়াছে। ইহার সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিবার নাই; কেবল তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে। এই ভ্রাতুস্পুত্রের নাম নগেন্দ্র, সে হইতেছে ডাঃ সূর্য্যকুমারের পুত্র। ছোট কুমারের ব্যক্তিগত একজন কেরাণীর সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুতা ছিল।

বাদীপক্ষের ৭৯২নং সাক্ষী রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, বয়স ৫৫ বৎসর। ঢাকার বিখ্যাত ব্যক্তি, রমানাথ দে'র পরিবারের লোক। কয়েকটি জেলায় তাঁহাদের যে জমিদারী আছে, তাহার খাজানার আয় বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা। ইনি আয়ের এক পঞ্চমাংশের মালিক। ইহার এবং ইহার ভ্রাতাদের ঢাকায় বাড়ী ও ভূসম্পত্তি আছে, ময়দার কল আছে, ঢাকা, পাটনা এবং অন্যান্য স্থানে মহাজনী কারবার আছে। তিনি ঢাকার একজন উচ্চপদস্থ লোক; জমিদার, মহাজন এবং ব্যাঙ্কার। তিনি দ্বিতীয় কুমারকে ভালরূপে চিনিতেন। দ্বিতীয় কুমার ও তাঁহার গণিকাদের সহিত তিনি নৌ-বিহারে গিয়াছিলেন; একথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই ভদ্রলোকটী যদি বাদীকে কুমার বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি আদালতে আসিতেন না, এবং যৌবনকালে তিনি কি করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতেন না।

তিনি ঢাকার একটি প্রাচীন বংশের লোক। ঐ সব জিলায় তাঁহার জমিদারী আছে, এবং জমিদারীর আয় প্রায় ১৭ হাজার টাকা হইবে। ঢাকায় তাঁহার অনেক বাড়ী আছে এবং সম্পত্তির কিয়দংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে। ঢাকা তাঁতিবাজারের যে বিখ্যাত মিছিল বাহির হয় তাহার সমস্ত

(২৯৪নং সাক্ষী); এই সাক্ষী কুমারের অঙ্গমর্দ্দন দ্বারা কুমারের পীড়ার সময় পরিচর্য্যা করিত; দেনগড়ি মণ্ডল (৬৮০নং সাক্ষী) আলো দিত; ভগবান কৈবর্ত্ত পাঙ্খাওয়ালা (৫৮নং সাক্ষী)। শেষোক্ত সাক্ষীর নিকট হইতে যে বিবৃতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারাই ইহার সাক্ষ্য মিথ্যা সপ্রমাণের প্রয়াস হইয়াছিল। উক্ত বিবৃতির গোড়ার কথা কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। ইহা রায় সাহেবের সেই 'মার্কামারা সাক্ষ্য'—যাহার জন্য রায় সাহেব নায়েবদের উপর কড়া হুকুম জারি করিয়াছিলেন এবং রায় সাহেব যাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিয়াছিলেন (বিবাদী পক্ষের ৪০৯নং সাক্ষী)।

মণিপুরী জকি চন্দ্রানন সিংহের নাম (বাদী পক্ষের ১৬২নং সাক্ষী) এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। জয়দেবপুরে পোলো খেলার প্রসঙ্গ যখন উত্থাপন করিব, সেই সময় এই ব্যক্তির সাক্ষ্য বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে।

কি প্রকারে কুমারের উপদংশ ব্যারাম আরম্ভ হয়, কুমারের নিজের চাকরদের মধ্যে কেবল প্রতাপ ও প্রভাত সে বিবরণ প্রদান করিয়াছে। কুমারের উপদংশ ব্যারাম সম্বন্ধে ইহাদের সাক্ষ্যই একমাত্র সাক্ষ্য। রাজবাড়ীর ডিস্পেন্সারীর কম্পাউণ্ডার উপেন্দ্র (বাদী পক্ষের ৭৪নং সাক্ষী) এ বিষয়ে কতক কতক সংবাদ দিয়াছে; কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ। কুমারের শরীরের দাগ-চিহ্ন সম্বন্ধে যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন এ সকল সাক্ষ্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের সাক্ষ্য

জয়দেবপুর রেল ষ্টেশনের অথবা জয়দেবপুর ও ঢাকার মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনসমূহের কর্ম্মচারিগণ কুমারদিগকে বহুবার যাতায়াত করিতে দেখিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ ঢাকার লোক না হইলেও, তাঁহারা সচ্চরিত্র ও সদ্ভাবাপন্ন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় (বাদী পক্ষের ৪৫, ৫৪. ৭৭, ২৩৭, ৩০৬, ৪৩৮, ৪৮৪, ৫৬৫, ৬০২, ৬২০, ৬৪৫, ৬৫২, ৭৩০, ৭৫৬, ৭৬৬, ৮২৫, ৮৫৪, ৯০৬, ও ৯৮২ নং সাক্ষী), মধ্যমকুমার অশ্বপৃষ্ঠে অথবা টমটমে বেড়াইতে বাহির হইয়া রেলষ্টেশনে যাইতেন। রেলষ্টেশনই তাঁহার বেড়াইবার প্রিয়স্থান ছিল। তিনি রেলষ্টেশনের আফিস গৃহে যাইয়া বাবুদের সহিত গল্প করিতেন, কেরাণীদের হুকা লইয়া তামাক খাইতেন এবং রেলের কর্ম্মচারীদিগকে নিতান্ত বিরক্ত করিতেন।

বাদীর পরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে 'বাদী অনেকটা মধ্যম কুমারের

মত'—ইহা বলা ছাড়া, বাদীর পরিচয় ও সনাক্ত করণ সম্বন্ধে রেলের এই সকল কর্ম্মচারীর কোনও নিশ্চয়তামূলক উক্তি করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু তাহা হইলেও, ঐ সকল সাক্ষীর মধ্যে এমন লোকও থাকা সম্ভব, যাঁহারা খুব সম্ভব কুমারকে ভুলিয়া যাইবেন না, অথবা তাঁহার সম্বন্ধে ভুল করিবেন না।

ঐ শ্রেণীর সাক্ষীর মধ্যে আশুতোষ ব্যানার্জ্জির নাম করা যাইতে পারে। সাক্ষী ১৯০১ সালের প্রথম হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত জয়দেবপুর ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার ছিলেন। আর একজনের নাম অতুল ঘোষ ১০০৬ সাল হইতে ১৯০৭ সালের অক্টোবর পর্যান্ত এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। পরে তিনি গার্ড হন, এবং ঐ লাইনেই চলাচল করেন। লর্ড কিচেনার যখন জয়দেবপুর আসেন এবং মধ্যমকুমার যখন দার্জ্জিলিং যান, তখন আশুবাবু ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। সে সময় কুমার তাঁহাকে বাংলায় বলিয়াছিলেন, "মাষ্টার গাড়ী কোথায়"? আশুবাবুর সে কথা বেশ স্মরণ আছে। এই ভদ্রলোকের লম্বা গোঁফদাড়ি ছিল।

সাক্ষী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাদীকে দেখিতে যান। সে ১৯২১ সালের ঘটনা। বৃদ্ধা বাদীকে মামা বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—"মামা, আপনি ইহাকে চেনেন?" বাদী সাক্ষীর দিকে তাকাইলেন এবং একটু ভাবিয়া বলিলেন,—'ইনি আশু বাবু।" পরে বাদী জিজ্ঞাসা করেন,—'আপনার গোঁফদাড়ি কোথায় গেল?'

সাবেক কর্ম্মচারীদের সাক্ষ্য

সাবেক কর্ম্মচারীদের মধ্যে নিম্নের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে:—

বাদীপক্ষের ১০নং সাক্ষী বিপিন বয়স ৬৪ বৎসর, ১৩০৮ হইতে ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত সদরে চীফ ম্যানেজারের অফিসে কেরাণী ছিলেন। বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষী সুরেন্দ্র অধিকারী ১৩০৪ হইতে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত সার্ভেয়ার ছিলেন। বাদীর ৬৬নং সাক্ষী রমেশচন্দ্র ঘোষ ১৩০১ হইতে ১৩২০ সাল পর্য্যন্ত নায়েব ছিলেন। বাদীর সাক্ষী হরনাথ ধরগুপ্ত ১২৮৯ হইতে ১৩০৬ সাল পর্য্যন্ত সদরে কেরাণী ছিলেন, বাদীর ৩৮৭নং সাক্ষী অরুণকান্ত নাগ ১৩০১ হইতে ১৩০৯ সাল পর্য্যন্ত নায়েব ছিলেন। বাদীর ৬৬৪নং সাক্ষী পূর্ণচন্দ্র দত্ত ১৩০৯ হইতে ১৩২০ সাল পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের কর্ম্মচারী ছিলেন। বাদী পক্ষের ৯০৭নং সাক্ষী রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়, ১৩০৯ সালে সহকারী দেওয়ান এবং

অবয়ববিশিষ্ট আর এক ব্যক্তিকে দেখিয়া ভুল করা সম্ভব; কিন্তু তাহার সহিত কুমারের তুলনা করা বৃথা।

নির্ভরযোগ্য সাক্ষী

দ্বিতীয়তঃ যে সকল সাক্ষীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোনও প্রশ্নের অবকাশ নাই,—কেবল দ্বিতীয়কুমারের কথা তাঁহাদের কতদূর স্মরণে, ইহাই কেবল জিজ্ঞাস্য। তাঁহাদের কথা ধরা যাউক :—

প্রথমেই আমি কলিকাতার সম্মানী ব্যক্তি এবং বাদীপক্ষের সাক্ষী শ্রীযুত সুবোধকৃষ্ণ বসুর নাম উল্লেখ করিব। সুবোধবাবুর জন্মস্থান কলিকাতা এবং তিনি কলিকাতায়ই লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত। তিনি কলিকাতার রাজা বিনয় কৃষ্ণের ভাগিনেয়। তিনি দ্বিতীয় কুমারকে ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালে এবং পুনরায় ১৯০৮ সালে দেখেন এইখানে দেখা যায়—১৯০৬ সালে কুমার যখন ধর্ম্মতলার বাড়ীতে বাস করিতেন, তখন সাক্ষী কুমারকে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি ১৯০৭ সালে কলিকাতা যান নাই।

ইহার পর বাদীর ৬০০নং সাক্ষী ময়মনসিংহ জেলার সেনবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন এবং বাদীর ৪৬১নং সাক্ষী কলিকাতার ইঞ্জিনিয়ার পি, সি, গুপ্তের কথা উল্লেখ করা যায়।

তিনি কুমারের একজন বন্ধু ছিলেন বলিলেও ক্ষতি হয় না। কুমারের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন; কিন্তু দ্বিতীয় কুমার যখন দার্জ্জিলিং যান তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর ছিল। তিনি কুমারের সহিত ঘোড়ায় চড়িতেন, রাজবাড়ী যাইতেন এবং মাঝে মাঝে ঢাকার বাড়ীতেও যাইতেন। ইহার পর কুমারেরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ১৯২৪ সালের অর্থাৎ ১৯০৯ সাল হইতে ১৭ বৎসর পর তিনি বাদীকে দেখেন।

বাদীর ৫৮নং সাক্ষী প্রিয়নাথ সাহা বণিক। ঢাকার একজন ধনী ব্যবসায়ী। তাঁহার ঢাকায় কয়েকখানি বাড়ী আছে এবং তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তবে তিনি কুমারকে রাস্তায় কিংবা অন্য কোথাও বাহিরে দেখিয়াছেন।

বাদীর ৮৯নং সাক্ষী মিঃ জি, সি, সেন ১৯০৫ সালে ইনি কুমারের জীবনবীমা করিবার সময় এজেণ্ট ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বাদীকে দেখিয়া ঠিক করেন যে, এই ব্যক্তিই কুমার। কিন্তু তথাপি তাহাকে পরীক্ষা

১৯০৯ সালে স্যার ল্যান্সলট হেয়ারের সম্মানার্থে ঢাকায় যে 'গার্ডেন পার্টি' হইয়াছিল, সাক্ষী সেখানেও মেজকুমারকে দেখিয়াছিলেন মেজকুমারের সহিত কখনও কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। বাদীর আত্মপরিচয় দানের চারি মাস পর অর্থাৎ ১৩২০ বাঙ্গালা ভাদ্র (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে তাঁহার বাড়ীতে তিনি বাদীকে দেখিয়াছেন। সাক্ষী বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এবং বাদীকে তাঁহার মা ঠাকুরমার নিকট লইয়া যান। অতঃপর কয়েকবারই বাদী তাঁহার বাড়ী আসিয়াছিলেন। সাক্ষীকে বাদী কোথায় দেখিয়াছেন, ১৯৩৪ সালে সাক্ষী বাদীকে উহা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে, মিঃ র‍্যাঙ্কিনের বিদায়োপলক্ষে যে পার্টি দেওয়া হইয়াছিল তথায় তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন। মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'মিঃ র‍্যাঙ্কিনের পার্টির কথা বলিয়াছেন বলিয়াই, আপনি বিশ্বাস করিয়াছেন যে, বাদীই মেজকুমার ?'

উত্তরে—হাঁ,—বিশ্বাস করিয়াছি।

এই উক্তি শুনিয়া মনে হয় যে, তিনি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। এই সাক্ষ্য হইতে নানা কথা আসে। মনে হয় একটা লোককে মেজকুমার বলিয়া চালাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে। আমি এই মামলার সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য শুনিয়াছি। এই সাক্ষীদের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোক ছিল। উহাদের বয়স চল্লিশের কম ছিল না, এবং পঞ্চাশের অধিকই ছিল। উহাদের মধ্যে বহু গাম্ভিয্যপূর্ণ ব্যক্তি এবং বয়স্ক লোক ছিল। ইহারা যে গাঁজাখুরী কথা বলিতে পারেন, তাহা কেহ বিশ্বাস করিবেন না। ইহাদের কথা শুনিলে এই মনে হয় যে, কেহ বুড়ীগঙ্গার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন না। আর সাক্ষীরা এখানে একটা নদী ছিল ইহাই বলিতেছেন।

আমি এই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করি নাই, শুধু তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি কারণ ইহাদের সাক্ষ্যের ভিতর কিছু মিথ্যা আছে বলিয়া মনে হয় না, শুধু বাদী আত্মপরিচয় সম্পর্কিত ঘটনা নহে, পারিবারিক ঘটনা সম্পর্কেও কোন কিছু মিথ্যা বলে নাই, আমার বিশ্বাস। বিবাদীপক্ষ বাদীও মেজকুমারের সাদৃশ্য সম্পর্কেও অনেক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। সাক্ষীর সাক্ষ্য দেখিবার নহে। কোর্টকে দেখিতে হইবে (ক) উভয় পক্ষ কি প্রকার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, সাক্ষীদের অবস্থা, মর্য্যাদা, শিক্ষা, লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা, কুমারের কথা তাহাদের কতদূর মনে পড়ে।

মিথ্যা বলিবার কোন কারণ আছে কি না, কুমারের শিক্ষা, পোষাক কোনও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কাহারো মিথ্যা বলিবার কারণ আছে কি না ?

(খ) এমন কোন অখণ্ডনীয় প্রমাণ আছে কিনা, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বাদীই মেজকুমার কি না তাহা হয় স্বীকৃত হইবে অথবা অস্বীকৃত হইবে, এই মামলায় বহু প্রমাণ আছে।

ক'তে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সাক্ষ্য সম্পর্কে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সকল সাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাহাদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, তাহাদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তাহারা নিশ্চয়ই কুমারকে চিনিতেন এবং তাঁহার সম্পর্কে ভুল করিবেন না। আমি উক্ত তালিকা সম্পর্কে উল্লেখ করিতেছি, কুমারের শিক্ষা এবং অন্য ভাবমূলক বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। এই সম্পর্কে আমি পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এই সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে আমি এখন কিছু বলিতেছি। অন্য বিষয় সম্পর্কেও আমি এখন কিছু বলিতেছি। অন্য বিষয় সম্পর্কেও বিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা যায় না। এখন আমি ঐ সকল সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করিব।

বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য

বিবাদী পক্ষে ৪৭৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কমিশনে ৪৪ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। তাহারা বাদীই উজলার 'মাল সিং' বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং যাহারা সনাক্ত করণ সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই, তাহাদিগকে বাদ দিলেও যাহারা এই বাদী 'মেজ-কুমার' নহে বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন, এই প্রকার সাক্ষীর সংখ্যা ৩৭৪ জন। ঐ সব সাক্ষীর মধ্যে ৫৬ জন ভদ্রলোক এষ্টেটের অধীনে চাকুরী করেন না। অবশ্য জয়দেবপুর রাজস্কুলে চাকুরী করেন। এমন কয়েকজন ঐসব সাক্ষীদের মধ্যে রহিয়াছেন। অবশিষ্ট সাক্ষী প্রজা অথবা এষ্টেটের চাকরবাকর অথবা কৃষক। মিঃ চৌধুরী প্রজাদের একখানি তালিকা আমাকে দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, প্রজাদের সংখ্যা ২১৯ জন কিন্তু ঐ তালিকায় অনেক নাম বাদ আছে। তিনি চাকরদের যে তালিকা দিয়াছেন। তাহাতে চাকরের সংখ্যা ২১ জন দেখা যায়। ইহার মধ্যে ১০ জন এষ্টেটের অধীনে কাজ করে, এবং একজন ভিন্ন অবশিষ্ট সকলেই আর সকল কাজ করে এবং কয়েকজন ভিন্ন অবশিষ্ট

(৫) ভাওয়ালের পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যানেজার মিঃ মেয়ার (কমিশন)

(৬) মিসেস মেয়ার (ঐ)

(৭) কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রলোক মিঃ শরদিন্দু মুখার্জ্জি (বিবাদী পক্ষের ১২০নং সাক্ষী)

(৮) লেঃ হোসেন—ময়মনসিংহের জমিদার (বিবাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষী) এই লেঃ হোসেনের উক্তি অনুসারে দেখা যায় যে, এখন তাঁহার সামান্য সম্পত্তিই আছে, অত্যন্ত ঋণ-জর্জ্জরিত। তাঁহার বিরুদ্ধে মোট ১,৬৩০০০ ডিক্রী আছে, তাহা কত টাকার জানা যায় নাই। তাহার জমিদারী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সাক্ষী কোন্ বৎসর এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। অবশেষে বহু চেষ্টার পর ১৯০৪ সালে ঐ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন বলিয়া বলেন। ইহাতে ১৯০৫ সালে তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেন ইহা বুঝা যায়। পরে ঢাকা কলেজে পড়িতে আসেন; কিন্তু কোন বৎসর ঢাকায় পড়িতে আসেন, তাহা বলেন না। অবশেষে বলেন যে, ১৯০৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত এক বৎসর ঢাকা কলেজে ছিলেন। ১৯০৮ সালের মে অথবা জুন মাসে কলেজে যোগদান করেন। ১৯০৬ অথবা ১৯০৭ সালে তিনি কুমারের সহিত শিকারে গিয়াছিলেন। (যখন তিনি আদৌ ঢাকায় ছিলেন না।)। এই উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হইবার তারিখ নির্দ্ধারিতভাবে বলিতে চাহেন না। সাক্ষী বলিতেছেন যে, তিনি ১৯০৪, ১৯০৫ এবং ১৯০৬ ও ১৯০৭ এবং ১৯০৮ সালে কুমারের সঙ্গে খানা খাইয়াছেন। সাক্ষী জানেন না যে, কুমারদের কলিকাতা গমন সম্পর্কে আদালতে গঠিত বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। কুমারদের সাহেবীখানা সম্পর্কে আলোচনা কালে আমি দেখাইব যে এই সাক্ষীর কুমারের সহিত খানা খাইবার কাহিনী 'শূন্যে' মিলাইয়া গিয়াছে।

---

(৯) বিবাদী পক্ষের ১৪নং সাক্ষী কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী রাণী বিলাসমণি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক। এই শিক্ষকটি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করেন। বাদীকে জেরায় যে সব প্রশ্ন করা হইয়াছিল, এই সাক্ষীও প্রায় সেই সব কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষ্য নিম্নে বিচার করা হইবে।

(১০) বিবাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষী যোগেন্দ্র সেন (৬৪) এষ্টেটের একজন পুরাতন কর্ম্মচারী এবং সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বিচারের সময় তাঁহার জামানতী, টাকা উঠাইয়া নেন। তিনি জামালপুরের তাঁহার এক

ফণীবাবু এবং তাঁহার ভগ্নি শৈবলিনী বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দেন। তাঁহারা মোক্ষদার পুত্রকন্যা। মোক্ষদা এখন পরলোকে।

স্বর্ণময়ীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকাংশ মীরাস পত্তনী, উহার খাজানার পরিমাণ দশ হাজার টাকা। ফণীবাবু সাক্ষ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, যে পাট্টামূলে উক্ত মৌরাসের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই দলিলের একটী সর্ত্ত এই যে, মেয়ের ছেলে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না। ফণীবাবু এবং তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র স্বর্ণময়ীর সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছিলেন, সেইজন্য স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর মীরাস অসিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯০৭ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস এক মামলা রুজু করেন। স্বর্ণময়ীর কন্যা কমলকামিনী তখনও জীবিত বলিয়া পুনরায় মামলা দায়ের করা সম্বন্ধে কোর্টের অনুমতিসহ কোর্ট অব ওয়ার্ডস এই মামলা উঠাইয়া লন। উক্ত সম্পত্তির একৃজিউটার ফণীবাবুর শ্বশুর অখিল পাকড়াশী মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে উক্ত মামলা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহা ১৯২৪ সালের ঘটনা। মামলা উঠাইয়া লওয়ার সময় কোর্ট অব ওয়ার্ডস ফণীবাবুকে কতকগুলি সুবিধা দিয়াছিলেন,—বাকী খাজানার সুদ বাবদ বহু টাকা ফণীবাবুর নিকট পাওনা হয়, সে সুদ মাপ করা হয়। সম্ভবতঃ সাধুর বিরুদ্ধে তাঁহার কার্য্যকলাপের পুরস্কার এই ভাবে দেওয়া হইয়াছিল। ফণীবাবু সে মামলার কথা স্বীকার করিয়াছেন; সুদ বাবদ ৬০০০৲ টাকা মাপ করা হইয়াছিল, তাহাও ফণীবাবু অস্বীকার করেন নাই। তবে তাহা যে সাধুর বিরোধী কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না। ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার মিঃ নীডহামের লিখিত এক পত্র বিবাদী পক্ষ আদালতে দাখিল করিয়াছেন (একজিবিট Z২০৪)। সেই পত্রের মধ্যে সুদের টাকা মাপের সর্ত্তাদির বিষয় উল্লিখিত আছে। যে কারণে ফণীবাবুকে সুদের টাকা মাপ দিয়া বাকী খাজানার আদায়ের কিস্তিবন্দী করা হইয়াছিল, সেই কারণ উক্ত পত্রে এই ভাব বিবৃত আছে,—এষ্টেটের বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থায় ফণীবাবু যেরূপ বিশ্বাসের কাজ করিয়াছেন এবং এষ্টেটের প্রতি তিনি যে প্রকার আনুগত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত সুবিধা দেওয়া গেল।

সাধুর উপস্থিতি ভিন্ন, এষ্টেটের সঙ্কট অবস্থায় আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু এ কথা সত্য যে, সম্পত্তি ভাওয়াল এষ্টেটে পুনগ্রহণ করিলে ফণীবাবু

সালে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের দুই বৎসর পরে ইনি শ্বশুরবাড়ী স্বামীর ঘর করিতে যান। এই সময় তিনি শেষবার মধ্যম কুমারকে দেখেন।

(২৯) বিবাদীর ২৮১ নং সাক্ষী প্রমথ চক্রবর্ত্তী, বয়স ৪৮ বৎসর। ইনি সাত টাকা বেতনের ব্রাঞ্চপোষ্টমাষ্টার। ইনি বলেন, ইহার বার্ষিক ৪৫০৲ টাকা আয়ের এক তালুক এবং কিছু জমি আছে। পূর্ব্ববর্ণিত সর্ব্বমোহন চক্রবর্ত্তী (কমিশনে জবানবন্দী হয়) এই সাক্ষীর ভগ্নিপতি।

(৩০) বিবাদী পক্ষের ২৮৩ নং সাক্ষী, কালীমোহন চক্রবর্ত্তী। ইহার এক পুত্র ভাওয়াল এষ্টেটে চাকুরী করে। সাক্ষী নিজকে রাজপরিবারের 'আশ্রিত' বলিয়া পরিচয় দেন। মধ্যমকুমারের শ্রাদ্ধের সময় কি হইয়াছিল, এই সাক্ষী তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য উপস্থিত হন। সাক্ষী বলেন,—এ, বি, রেলে তিনি টাঙ্গী হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে রেলভাড়া পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। যদিও সে সময় এ, বি, রেলের অস্তিত্বই ছিল না। তাহার অনেক পরে রেলপথ হয়। (টঙ্গী-ভৈরব রেল)

(৩১) বিবাদী পক্ষের ২৯২ নং সাক্ষী খাঁ সাহেব এ, এম, এ, হামিদ। বয়স ৪৫ বৎসর। মধ্যমকুমারকে এই সাক্ষী অনেক উপলক্ষে দেখিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন,—কুমারদের চেহারা আমার বেশ মনে আছে। বাদীকে সাক্ষী মধ্যমকুমার বলিয়া মনে করেন না। তবে একথা স্বীকার করেন যে, বাদীকে মধ্যমকুমার বলিয়া ভুল করা সম্ভব।

(৩২) বিবাদী পক্ষের ৩১০ সাক্ষী রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জি। ১৯০৪ সাল হইতে ইনি রাজ এষ্টেটে চাকুরি করিতেছেন। ইনি সেক্রেটারী নামে পরিচিত। ১৯৩৩ সালে ইনি বরখাস্ত হন। কিন্তু তখনও তিনি এষ্টেটের পক্ষে এই মামলার প্রধান তদ্বিরকারক। পুনর্নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য ইনি এক দরখাস্ত করিয়াছেন; কিন্তু পুনরায় বহাল হইতে পারিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন না। (পুত্র-পাপে)।

(৩৩) বিবাদী পক্ষের ৩৪৮ নং সাক্ষী রায় সাহেব উমেশ ধর। প্রায় ২০ বৎসর ইনি কালীগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইনি এখনও ইউনিয়ন কোর্টের সভাপতি এবং কালীগঞ্জ রাজেন্দ্রনারায়ণ স্কুলের সভ্য। এষ্টেট হইতে বিদ্যালয়ের সাহায্য দেওয়া হয়। ইহার এক ভ্রাতা কালীগঞ্জ স্কুলে নিযুক্ত, আর এক ভ্রাতা কালীগঞ্জ রাজ ডিস্পেন্সারীতে চাকুরী করেন, ঐ ডিস্পেন্সারীতে এই সাক্ষীর ভাগিনেয় ডাক্তার। যখন কমিশনে

ইহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তখন ইহার এক ভ্রাতা নায়েব ছিলেন। ইহারা পাঁচ ভ্রাতা। ইহাদের বাৎসরিক ২৫০০৲ টাকা আয়ের তালুক আছে।

সাধুকে প্রতারক বলিয়া ঘোষণার জন্য ১৯২১ সালে ফণীবাবু কর্ত্তৃক যে সভা আহূত হয়, ইনি সেই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। ঐ সভার বিবরণী হইতে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছিল যে, সাধুকে প্রতারক সাব্যস্ত করার পশ্চাতে জনমত আছে (২২৪নং একজিবিট)। সাক্ষীদের অন্য কেহ এই সভার কথা বলে নাই।

(৩৪) বিবাদী পক্ষের ৩৬৫ নং সাক্ষী ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত। ইনিও মেজকুমারের সহিত দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। (৩৫) বিবাদী পক্ষের ৪৬নং সাক্ষী অবনীকান্ত মুখুয্যে বয়স বাড়াইয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার বয়স তড়িন্ময়ী দেবীর মত। তড়িন্ময়ী ১৩০০ সন অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইলে ১৯০৯ সালে তাহার বয়স ১৫ বৎসরের মত ছিল। তাহার তালুক আছে বলিয়া বলিয়াছেন ; কিন্তু ঠিক মত বিবরণ দিতে পারেন নাই। ইনি বেকার জীবন যাপন করেন।

(৩৬) সৈয়দ আলি হোসেন, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার।

(৩৭) জয়কালী কাহিলী, উকিল, এষ্টেটের একজন কর্ম্মচারীর জামাতা।

(৩৮) মেজরাণী। (বিভাবতী দেবী)

(৪০) গৌর মজুমদার, কলিকাতাবাসী, মর্য্যাদা সম্পন্ন লোক নহে! সে বলিয়াছে যে, ১৯০৫ সাল, ১৯০৬, ১৯০৮ সালে কলিকাতা ও ১৯০৬ সালে জয়দেবপুরে সে কুমারদিগকে দেখিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কমিশনে ১৩জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। এই ১৩জন এবং মিঃ ও মিসেস মেয়ার, মিঃ জে এন গুপ্ত কমিশনে সাক্ষ্য দান কালে সনাক্তকরণ সম্পর্কে বলিয়াছেন।

এই ৫৩ জন সাক্ষীর মধ্যে আমি নিম্নোক্ত কয়েকজন সাক্ষীর সম্পর্কে বিশেষভাবে বলিতে চাই, অন্য সাক্ষীদের অস্বীকৃতির দ্বারা বিশেষ কিছু আসে যায় না। কমিশনে যাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কেও এই কথা বলা যাইতে পারে। আমি তাহাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। কুমারের শিক্ষা এবং বাদীর কথাবার্ত্তার সম্পর্কিত সাক্ষ্য সম্পর্কে এখন বিশদভাবে আলোচনা করিব না। আমি এখন এষ্টেটের কর্ম্মচারী এবং সাধারণ প্রজাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করিব। যে সকল সাক্ষী বাদীকে স্বীকার করেন নাই, তাহাদের সাক্ষ্য কোর্টের কত কাজে আসিতে পারে, তাহা দেখিতে হইবে, এবং যে সকল সাক্ষী কুমারকে দেখিয়াও

তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, তাঁহার সময় কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, কুমারদের একজন ইংরেজ শিক্ষক ছিলেন এবং তাহাদের কথা বলার ভঙ্গীটাও ইংরেজের মতই ছিল। ইহার পর তিনি বলেন যে, কুমারদের ইংরাজী বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের একজন ইংরেজ শিক্ষক ছিল, অথবা কোন ইংরেজী বিদ্যালয়ে তাহারা শিক্ষালাভ করিয়াছে। সাক্ষী জবানবন্দীর দিন এই কথা বলেন; কিন্তু পরদিনই আবার তিনি বলেন যে, প্রথম কুমার অপর দুই কুমারের তুলনায় ভাল ইংরাজী বলিতেন। তাঁহার ইংরেজীও অশুদ্ধ এবং উচ্চারণে ভুল ছিল; তবে বুঝিতে কষ্ট হইত না। ইহার পূর্ব্বদিন তিনি আদালতে অন্যরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

তৎসম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি হতভম্ব হইয়া যান। অবশেষে মিঃ চৌধুরী তাহার একটি উত্তর বলিয়া দিলে সাক্ষী তদনুসারে বলেন যে, ভারতের কোনও ইংরেজী বিদ্যালয়ের কথাই তিনি বলিয়াছেন। ইংরেজীর শিক্ষক বলিতে তিনি কোন ভারতীয় শিক্ষককে (যিনি ইংরেজী পড়ান) বুঝিয়াছিলেন কি না, এই প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, তাহা তিনি মনে করেন নাই। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, কুমারদের একজন ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন, এবং তাহা হইতেই তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, কুমারেরা নিশ্চয়ই কোন ইংরেজ শিক্ষকের নিকট ইংরেজী শিখিয়া থাকিবে। তাহাদের বলার ভঙ্গী দেখিয়াও তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। কুমারেরা যে ধরণের ইংরেজী বলিতেন সেই ধরণের ইংরাজী বলিয়া শুনান, কিন্তু সেইগুলি কুমারদের কথার অবিকল নকল নহে। তাহাদের কথার বিপরীত। লর্ড কিচেনারের শিকার, উহা ঘটিবার পূর্ব্বে কুমারের সহিত আলোচনা অথবা ইংরেজী কায়দায় কুমারদের বচনভঙ্গী সম্বন্ধে এই ভদ্রলোক আদালতে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি না। একজন উচ্চ শিক্ষিত এবং মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন অভিজাতের বর্ণনা দিতে যাহা প্রয়োজন, সেই সব কথাই তাঁহাকে বলা হইয়াছিল। তিনি একজন সরল বিশ্বাসী সাধারণ ইংরেজ সৈনিক মাত্র। এই সকল অপচেষ্টা তিনি ধরিতে পারেন নাই। ইহা স্পষ্ট-ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ২২শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে তিনি কোনও কুমারকেই দেখেন নাই। ঐ তারিখে কেবল বড় কুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই এপ্রিলের মধ্যে দ্বিতীয় কুমারের সহিত দার্জ্জিলিং যাইবার কালে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনার কথা বাদ দেওয়া না হইলেও, তৃতীয় কুমারকে দেখিয়া সে

সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে ; তবে তিনি স্মরণ করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের কথা বলিতে পারেন না।

তিনি বলেন,—বহুবারই সাধুর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে। প্রথমবারে ১৯২৪ সালে কলিকাতায় দেখা হয় এই সময় হেতমপুরের রাজা স্বয়ং এই সাধুকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন। অতঃপর কলিকাতার অনুষ্ঠানে এবং কলিকাতার রাজপথে সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সর্ব্বশেষে ১৯২৬ সালে কিম্বা ১৯২৭ সালেও দেখা হইয়াছে ; এই সময়ে বাদী নাকি কতকগুলি বিষয়ে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। মিঃ কে, সি, দে'-ই প্রস্তাব করেন যে, বাদী যদি কোন প্রকার তদন্ত অথবা অপর কিছু চাহেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে একটা দরখাস্ত করাই উচিত ; এই দরখাস্ত ৮-১২-২৬ ইং তারিখে উপস্থিত করা হয়। সাক্ষী তাহা শ্রবণ করেন, এবং ১৪-২-২৭ ইং তারিখে তিনি ইহা অগ্রাহ্য করেন। এই সময় সাক্ষী কারণ দেখান যে, এরূপ তদন্ত করিবার ক্ষমতা রেভিনিউ বোর্ডের নাই, এবং তাহা করিলেও যে ফল হইবে, সেই ফলাফল মানিয়া চলিতে কেহ বাধ্য হইবে না।

কুমারের মৃত্যু হইয়াছে এবং বাদী একজন পাঞ্জাবী—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সংগৃহীত সাক্ষ্যাদির দিক হইতে মিঃ কে, সি দে'র বক্তব্য অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তিনি যে সব দরখাস্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং কমিশনার যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং আদালতে প্রদত্ত মিঃ কে সি, দে'র সাক্ষ্য লক্ষ্য করিয়া ইহাই প্রতীয়মান হয়।

"রুপিয়া লেকে কিয়া করেঙ্গে"

বাদীর স্বীকারোক্তিতে বর্ণিত বলিয়া কথিত ১৯২৬ সালের সাক্ষাৎকারের কথা আমি এস্থলে উল্লেখ করিব। কারণ বাদীর সাদৃশ্য সম্পর্কে মিঃ দে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণে ইহার প্রয়োজন আছে। তবে এই সাক্ষাৎকারের কথা আমাকে অতি সংক্ষেপেই উল্লেখ করিতে হইবে। সাক্ষী বলেন, ১৯২৬ সাল কিম্বা ১৯২৭ সালের আগের মাসে বাদী ঢাকায় তাহার সহিত দেখা করেন। তিনি বলেন যে, একজন উকিলকে সঙ্গে করিয়া বাদী তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি আরও, বলেন, খুব সম্ভব জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্রের উত্তরেই বাদীর সহিত এই সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করা হইয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিকট লিখিত সাক্ষীর পত্র (একজিবিট নং ২০০) আমি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

সেই সাক্ষাৎকারের সময়েই বাদী বলিয়াছিলেন যে, তিনি একজন ফকির। ১৯২৬ সালে বাদী কলিকাতায় ছিলেন, এই তথ্যের সহিত সাক্ষীর উক্তির অসামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে না।

মিঃ দে নিজেই বলিয়াছেন যে, ১৯২৪ সালে সর্ব্বপ্রথম বাদীর সহিত কলিকাতায় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৯২১ সাল হইতে বাদী ঠিক বাবুর মত পোষাক পরিতে সুরু করিয়াছেন, ১৯২৫ সালে বাদী তাঁহার চুল খাটো করিয়া ছাঁটিয়াছেন এবং ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করাইবার জন্য বাদী মিঃ লিণ্ডসে মিঃ জে, এন, গুপ্ত ও সাক্ষীর (মিঃ দে) সহিত দেখা করিতেছিলেন। নানা প্রকার উপদেশ ও পরামর্শের পর এই চন্দ্রশেখর বাবুর নিকট প্রদত্ত সাক্ষীর উপদেশের (১৯২৩ সালের আগষ্ট) পর সাক্ষীর নিকট যখন বাদীর এক দরখাস্ত পেশ করা হয়, তখন তিনি একদিন বহু সময় ধরিয়া দরখাস্ত শ্রবণ করেন এবং স্থির করেন যে, তদন্ত দ্বারা কোন ফল হইবে না। মিঃ দে বলেন, ১৯২৪ সালে সর্ব্বপ্রথম বাদীকে কলিকাতায় দেখিবার পর তাঁহার ধারণা জন্মে যে, এই লোকটি প্রতারক, এবং তারপর ১৯২৬ সালের সাক্ষাৎকারে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। তথাপি তিনি উপদেশ দেন যে, একটা দরখাস্ত করা বাদীর উচিত। পাছে বাদী হটিয়া যান, এই আশঙ্কায়ই সাক্ষী এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন ; অর্থাৎ কোন প্রকারে একটা স্বাক্ষর আদায় করিয়া বাদীকে একটা মামলার মধ্যে জড়াইয়া ফেলাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বাদীকে প্রতারক বলিয়া মনে করেন, এবং একমাত্র এই কারণেই তিনি বাদীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিতে পারেন, ইহাতে সাক্ষীকে বাধা দেওয়ার কিছুই নাই। তবে আমি মনে করি, মিঃ দে তাঁহার নিজের প্রতিই ন্যায়বিচার করিতেছিলেন না। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯২৩ সালেই তিনি আবেদন পেশ করার প্রস্তাব দিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি নিজে বাদীকে দেখেন নাই। কারণ তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, ১৯২৪ সালে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় বাদীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তারপর ১৯২৬ সালে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় এবং দ্বিতীয় দফা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। তথা বিচারের দ্বারা ইহা অসম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হয়।

১৯২৩ সালের সহিত সাধুকে জড়িত করিয়া এবং পরে আবার ১৯২৬ সালে ঢাকায় সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহার পরিধানে গেরুয়া ছিল, মাথায় জটা ছিল—সন্ন্যাসীর এই সমস্ত উপকরণের কথা বলিয়া তিনি সমস্ত গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কারণ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মতভাবে-

নিযুক্ত করেন। মালিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং কালেক্টারের নিকট রিপোর্ট করার জন্য (যে রিপোর্টের অংশ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) তাঁহাকে ডিসমিস করা হয়। ১৯০৪ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক দখল নেওয়ার পূর্ব কাহিনী, এই উপলক্ষে মিঃ মেয়ার কি ভাবে রাণীর পতনের কথা বলেন, এবং রাণীকে দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়, তাহা আমি উল্লেখ করিয়াছি। এতদিন পরে মিঃ মেয়ারের মনের সেই তিক্তত। আর নাই, ইহাই মনে করা সঙ্গত ছিল; কিন্তু তাঁহার সাক্ষ্যে তিক্ততার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। আরও দুঃখের কথা এই যে, এই ব্যাপার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কোন কথাই তিনি স্বীকার করেন নাই—যদিও মিঃ র‍্যাঙ্কিন যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে পরিষ্কার দেখা যায় যে, রাণীর সহিত এই ঝগড়ায় প্রথম কুমার, মিঃ মেয়ার একদিকে এবং অপর দুই কুমার ও রাণী আর একদিকে ছিলেন। অনেক চেষ্টার পর মিঃ মেয়ারকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, দ্বিতীয়কুমার, ছোট কুমার ও রাণী তাঁহার চরিত্রের উপর বহু কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে, এই ঘটনার পর মিঃ মেয়ারের নাম ঐ পরিবারে অভিশাপের বস্তু ছিল। সত্যবাবু তাঁহার রোজ নামচায় (একজিবিট ৩৯৯) উল্লেখ করিয়াছেন যে, নীডহাম (যিনি ম্যানেজার হইয়া আসিতেছেন) মিঃ মেয়ারের আত্মীয়। ইহাতে পরিবারের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সুতরাং ১৯০৪ সালে রাণী ও দ্বিতীয়কুমার মিঃ মেয়ারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার দরুণ তাঁহার (দ্বিতীয় কুমারের) প্রতি কোমল ভাব পোষণ করা সম্ভব ছিল না। সে যাহা হউক, মিঃ মেয়ারের কুমারের প্রতি কিরূপ ভাব ছিল, তাহা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ যখন তিনি বলিয়াছেন যে, সাধু নিজেকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া প্রচার করিতেছে, শুনিয়া তিনি ব্যাকুল্যাণ্ড বাধে যান, এবং সাধুকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। সাধু যে একজন প্রতারক, সে সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। মিঃ মেয়ার যখন এই সব কথা বলেন, তখন তিনি সত্য কথা বলেন না। কারণ ইহার প্রায় ১৯ মাস পরে ১৯২২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার কোন সবজজের আদালতে তিনি এইরূপ সাক্ষ্য দেন (একজিবিট ২৯০)—

"আমি ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারকে চিনিতাম।

প্রশ্নঃ—যে সাধু এখানে আসিয়াছেন এবং যাহাকে লোকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া বলিতেছে, তাঁহাকে কি আপনি দেখিয়াছেন?

উঃ—হাঁ, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। আমি সাধুকে রাস্তায় দেখিয়াছি। আমি যতদূর তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাহাতে ঐ সাধু দ্বিতীয় কুমার কিনা, তৎসম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু বলিতে পারিনা। কিন্তু আমার ধারণা, সাধু দ্বিতীয়কুমার নহেন। কিন্তু আমি এই সরকারী উকীলকে এবং কোর্টের জজকে যে ভাবে দেখিতেছি, সেইভাবে ৫ মিনিটের জন্য যদি তাঁহাকে দেখিতে পারি এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিব। সাধু ঢাকায় আসার পর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই।"

আমার কোন সন্দেহ নাই যে, মিঃ মেয়ার দ্বিতীয় কুমারকে চিনিতেন। তিনি জজকে যেভাবে দেখিতেছিলেন, সেইভাবে যদি সাধুকে দেখিতেন এবং ৫ মিনিটকাল আলাপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বাদী মেজকুমার কিনা তাহা তিনি বলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা কখনও করেন নাই। সুতরাং বাদীকে সনাক্ত করা সম্পর্কে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের মত নহে এবং তাহা কোন কাজেই লাগিবে না।

উহা জবানবন্দীর নকল বলিয়া, তিনি তাহা নিজের জবানবন্দী বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

উপরোক্ত জবানবন্দীর পর বাদীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের আর একবার সুযোগ ঘটিয়াছিল এই কথা তিনি বলেন এবং তাহা অস্পষ্টভাবে বলেন— —যদিও বাদী ১৯২১ ও ১৯২২ সালে ঢাকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

(৫) মিসেস মায়ার (কমিশনে সাক্ষ্য দেন) মিঃ মায়ার যখন জয়দেবপুরে ছিলেন, তখন এই সাক্ষী নিশ্চয়ই মধ্যম কুমারকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ মায়ার জয়দেবপুরে থাকা কালেই সাক্ষী ইংলণ্ডে চলিয়া যান; ইহার পর আর কখনও তিনি জয়দেবপুরে যান নাই। ১৯০৪ সালে মিসেস মায়ার জয়দেবপুর পরিত্যাগ করেন।

এই সাক্ষী বলেন,—সাধু মধ্যম কুমার নহেন। সাক্ষী ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধের উপর সাধুকে দেখিয়াছিলেন। মধ্যম কুমারকে দেখিবার মনোভাব লইয়া সাক্ষী সাধুকে দেখিতে যান নাই, সাধুকে সাধু হিসাবে দেখিবার জন্যই সেখানে তাঁহার যাওয়া, বাঁধের উপর সাধুকে এই সাক্ষী বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে এত নিকটে কোনও সাধুকে পান নাই। মিঃ মায়ারের পক্ষে হয় তো অন্য কারণ থাকিতেও পারে।

বাঁধের উপর থাকিবার কালে কিম্বা তাহার পরেও সাধুকে কোন ব্যক্তিই

ধরা যায়। যখন হইতে সাক্ষী কুমারকে চিনিতেন বলিয়া বলেন, ঠিক তাহারও পূর্ব্ব হইতে যদি কুমারকে তিনি চিনিয়া থাকেন, আমি তাহার ঐ উত্তরকে সন্দেহ বলিয়া ধরিব না; কিন্তু তাহা যখন নহে, তখন কুমারকে সনাক্ত করণ সম্পর্কে এই সাক্ষীর সাক্ষ্যের কোনও মূল্য নাই।

বিরুদ্ধ সাক্ষী

এই শ্রেণীর কতকগুলি সাক্ষীর নাম করিব। ইহারা নিশ্চয়ই কুমারকে চিনিতেন। কিন্তু যদিও ইঁহারা বাদীকে কুমার বলিয়াই স্বীকার করেন নাই, তথাপি ইহাদের সাক্ষ্যের দ্বারা যাহারা বাদীকে স্পষ্টতঃ কুমার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের সাক্ষ্যের গুরুত্ব হ্রাস হইবে না।

(৭) শ্যামদাস ব্যানার্জ্জি (বয়স ৪৮ বৎসর) কমিশনে ইহার সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সত্যবাবুর মাতার আত্মীয়ের পুত্র। সাক্ষী উত্তর পাড়ায় বাস করেন। দ্বিতীয় কুমারের পীড়ার সময় এবং কাল্পনিক মৃত্যুকালে এই সাক্ষী দার্জ্জিলিং ছিলেন। সনাক্ত করণ সম্পর্কে ইহার সাক্ষ্যে গুরুত্ব আছে। তহবিল তছরুপের অভিযোগে এই সাক্ষী সরকারী চাকুরী হইতে ডিসমিস হন। সাক্ষী নিজের অনেক আয়ের কথা বলেন; কিন্তু ইনি কোনও আয়কর দেন নাই।

(৮) জগদীশ চৌধুরী, প্রেসিডেন্সী স্মল কজ কোর্টের উকিল। জয়দেবপুরের নিকটবর্ত্তী ধীরাশ্রম গ্রামে ইহাদের বাস। ইনি জয়দেবপুর স্কুলে পড়িতেন, স্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকিতেন। ইহাকে স্কুলের বেতন দিতে হইত না। বোর্ডিংয়ে থাকার ব্যয় লাগিত না। মধ্যম কুমার ইহার বোর্ডিংয়ের খরচা দিতেন; পড়িবার পুস্তকাদিও কিনিয়া দিতেন। মধ্যম কুমার যখন দার্জ্জিলিং যান, তখন সাক্ষীর বয়স ১৩ বৎসর।

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই সাক্ষী সাধুকে সমর্থন করিয়াছেন। সাক্ষী সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি সাধুর একজন গোঁড়া সমর্থক। সাধুর পক্ষে যে সমিতি চাঁদা তুলিতেছিলেন, এই সাক্ষী সেই সমিতির সভ্য ছিলেন। সাক্ষী বলেন, তিনি বিরক্ত হইয়া ঐ দল ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্যে বুঝা যায়, তিনি একজন তদ্বিরকারক। সাক্ষীর পূর্ব্ব জবানবন্দী এবং কার্য্যকলাপ, তাঁহার বর্ত্তমান মতবাদের বিরোধী।

(৯) দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস, (বয়স ৭৮) ইহার সাক্ষ্য কমিশনে গৃহীত হইয়াছে। ইনি পূবাইল জমিদারীর পেশকার বা ম্যানেজার ছিলেন; এবং ১৭৲ টাকা বেতনে অবসর গ্রহণ করেন। দুর্গাবাবু বাদীকে দেখিবার জন্য

ছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্য প্রমাণে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তিনি এখন বিশেষ দুরবস্থায় আছেন।

(১৪) শৈলবালা দেবী (কমিশনে সাক্ষ্য গৃহীত) ফণীবাবুর ভগ্নী) তাঁহার সাক্ষ্য সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাইবে।

(১৫) ডাঃ যতীন্দ্রমোহন সেন, ফণীবাবুর একজন বন্ধু। চট্টগ্রামের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন। আশু ডাক্তারের দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব।

(১৬) এণ্টনি মরেল। বয়স ৬৪ বৎসর। বেকার, দ্বিতীয় কুমারের সহিত দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যুর (তথাকথিত) পর পর্য্যন্ত তিনি ভাওয়াল এষ্টেটে চাকুরী করিতেন। ভাওয়ালবাসী এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ গোয়া বাসী। তাঁহার সাক্ষ্য পরে আলোচিত হইবে।

(১৭) হুগলী জেলার বালী নিবাসী রাজেন্দ্র শেঠ। অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট-ও বালী মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। পদস্থ ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। এই সাক্ষী সত্যবাবুর একজন বন্ধু, এবং দ্বিতীয় কুমার যখন দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দার্জ্জিলিংয়ের ঘটনা সম্পর্কে একজন প্রধান সাক্ষী। সনাক্ত করণে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে বলা যায় যে, রেভেনিউ বোর্ডের কাছে আবেদনে এই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাদীকে চিনিতে পারিয়াছেন, এবং বাদী তাহার আবেদনে এই ব্যক্তিকে একজন বন্ধু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। সাক্ষী বলিয়াছেন যে, দার্জ্জিলিংয়ের 'ষ্টেপ এসাইডে' দ্বিতীয় কুমার যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে তিনবার দেখিয়াছিলেন, এবং ৯ই মে প্রাতঃকালে কুমারের শবদাহ করিতে তিনি গিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় কুমারের শারীরিক বৈচিত্র্য ও তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে; তাঁহার কথানুসারে দেখা যায় যে, বাদী যখন কলিকাতা ছিলেন, তখন সাক্ষী তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। সনাক্তকরণ সম্পর্কে বিবাদী পক্ষ হইতে তাঁহার কোন সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই, কিন্তু জেরায় তাহা করা হইয়াছে। ইহার কারণ, বিবাদীপক্ষ এই ব্যাপারে সাক্ষীকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আমি এখানে বলিতে পারি যে, তিনি সনাক্তকরণ সম্পর্কেও বলিয়াছেন। তিনি অনুসন্ধিৎসু হইয়া শ্রীযুক্ত দ্বারিক চক্রবর্ত্তীর এক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাদীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণিত বিবরণ এইরূপ,—

"ঘরে ঢুকিয়াই কুমারের মত লালচুল ও 'কটা চোখ' বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া যাই। আমি তখন প্রশ্ন করিলাম

দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন, এবং গরম কাপড় ব্যবহার করিবার জন্য পরামর্শ দেন।

এই আলোচনার বিষয় কি সত্য অথবা কাল্পনিক, তাহা আমি এখন আলোচনা করিতে চাই না, তবে এই সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে দুইটা তথ্য জানা যায়। দার্জ্জিলিংএ কুমার রঙ্গিন লুঙ্গি পরিয়াছিলেন কি না, প্রত্যেকেই জানেন এবং সত্যবাবুও স্বীকার করিয়াছেন যে, সত্যবাবু সাহেবী পোষাক পরিতেন এবং কুমার সোনার কাজকরা টুপী ব্যবহার করিতেন। কোন লোক যদি রাজকুমার বা পদমর্য্যাদা সম্পন্ন লোক না হন ; তবে এই প্রকার টুপী ব্যবহার করেন না, কারণ উহা সাধারণ লোকে ব্যবহার করিলে হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। নিম্নে দেখান হইবে যে কুমারের সমবয়সী এই যুবক, সাহেবী পোষাকে দার্জ্জিলিংয়ে ঘুরাফেরা করিতেন। তাঁহার মাথায় সোনার কাজকরা টুপী ছিল, এবং তিনি ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলিতেন। এই পোষাক ও টুপী ছিল বলিয়াই দার্জ্জিলিংয়ের সাক্ষীরা বলিয়াছে যে তাহারা কুমারকে রাস্তায় ও হোটেলে, সুন্দর ইংরেজীতে কথা বলিতে দেখিয়াছে। নিম্নে দেখান হইবে যে মেজকুমার ভাল বা খারাপ কোন প্রকার ইংরেজীই বলিতে পারিতেন না। বাদীর সহিত যে কথাবার্ত্তা বলা হইয়াছে উহার ভাষা বলিবার ভঙ্গী সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান তথ্য এই সাক্ষ্য হইতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে হিন্দীর কোন কথাই নাই এবং উহার কোন কোন অংশ অদ্ভুত বাঙ্গালা ছিল, যেমন,—কি, কেমন, চিন্তি পারেন ? সাক্ষিগণ বলিয়াছেন যে, বাদী কলিকাতাতে বাঙ্গালা বলিতে পারেন নাই। হিন্দী বলিয়াই উহার সহিত একটু একটু বাঙ্গালা মিশান ছিল। বাদী ১৯২৫ সালে মিঃ ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মিঃ ঘোষালের সাক্ষ্য কমিশনে গৃহীত হইয়াছে। তিনি কলিকাতার একজন বিশিষ্ট লোক। তিনি বলিয়াছেন যে তখন বাদীর সহিত তাঁহার বাঙ্গলাতেই কথাবার্ত্তা হইয়াছে। এই ঘটনাটা অত্যন্ত বড, সেইজন্যই যথাস্থানে উহা আলোচিত হইবে।

মিঃ আর, এন, শেঠ বাদীকে দেখিবার পনর বৎসর পূর্ব্বে মেজকুমারকে দেখিয়াছেন, সনাক্তকরণ সম্পর্কে তাঁহার সাক্ষ্য প্রয়োজনীয়।

(১৮) ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, পি, ঘোষ (বর্ত্তমানে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের পুত্র। রাজা বাহাদুর রাজা কালীনারায়ণ রায়ের আমল হইতে ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ঢাকাতে রায় বাহাদুরের বাড়ী ছিল। কিন্তু

র‍্যাঙ্কিন কুমারদিগকে জানিতেন, তাঁহাদের বাড়ীঘরের কথা জানিতেন। কালেক্টররূপে সমস্ত বিষয় জানিবার সুযোগ তাঁহার ছিল, বিশেষ করিয়া এই মিঃ র‍্যাঙ্কিনই পুলিশের সহিত যাইয়া তখন কোর্ট অব ওয়ার্ডস'এর পক্ষ হইতে ভাওয়াল সম্পত্তির উপর দখল লইয়াছিলেন। সেই ঘটনার বর্ণনা আমি সম্পূর্ণরূপেই করিয়াছি। বাদী পক্ষ বলেন, অকস্মাৎ রাজ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া মিঃ র‍্যাঙ্কিন তাঁহাদের মাতাকে হুকুম দেন যে, ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে সরিয়া যাইতে হইবে; ইহাতে কুমারগণ ক্ষুন্ন হন। তাঁহাদের মনে হয় যে, তাঁহাদের মাতার অপমান করা হইয়াছে, অতএব এই ঘটনার পর হইতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুমার পারিতে, মিঃ র‍্যাঙ্কিনকে এড়াইয়া চলিতেন, তবে বিশেষ করিয়া এই কারণেই যে তাঁহারা মিঃ র‍্যাঙ্কিনকে চিনিতেন এবং মিঃ র‍্যাঙ্কিনও তাঁহাদিগকে চিনিতেন, ইহা অতিশয় পরিস্ফুট। মিঃ র‍্যাঙ্কিন গত ১৯০৭ সালেই সর্ব্বশেষ দ্বিতীয়কুমারকে দেখিয়া থাকিবেন। কারণ ১৯০৯ সালের শীতকালে কুমারগণ ১০ই ফেব্রুরারী পর্য্যন্ত ঢাকায় ছিলেন না। তবে তিনি যে ১৯০৯ সালেও কুমারকে দেখিয়া থাকিবেন, তাহাও একেবারে অসম্ভব নহে। ঐ বৎসর ডিসেম্বরে প্রথমভাগে তিনি চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে অথবা তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পরে দেখা হইয়া থাকিতে পারে। প্রায় ২৬ বৎসর পরে—এই সময়ের মধ্যে তাঁহার অবসর গ্রহণের পরবর্ত্তী ইংলণ্ড বাসের সময়ও আছে—মিঃ র‍্যাঙ্কিন আদালতে হাজির হইয়া বাদীকে দেখিতে পান। বিলাত বাসের অর্থ এই যে, ভারতের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ বিনষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার স্মৃতিও বিমলিন হইয়াছে। দ্বিতীয় কুমার বয়সে মিঃ র‍্যাঙ্কিন হইতে ১৪ বৎসরের ছোট, অতএব তিনি ঘনিষ্টভাবে কুমারের সহিত মিশিতেন না; সামাজিক প্রথা ও নিয়ম অনুসারে ইহা সত্য তবে আনুষ্ঠানিকভাবে মিঃ র‍্যাঙ্কিন ঢাকায় কুমারদের বাড়ীতে যাইতেন। বাদী বলেন, সাধারণতঃ মিঃ র‍্যাঙ্কিন বড় কুমারের কাছেই যাইতেন এবং তিনি যে একটা বিশিষ্ট ব্যক্তি, এমনই ভাব দেখাইতেন। মিঃ র‍্যাঙ্কিন বলেন, ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় তিনি কুমারকে সাহায্য করিতেই যাইতেন। জয়দেবপুরে গেলে এতটা বাহ্যিক শিষ্টাচার প্রয়োজন ছিল না, ইহাই হয়ত অনেকে মনে করিতেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মিঃ র‍্যাঙ্কিন সর্ব্বদাই সাহেবী পোষাক পরিহিত কুমারের সহিত দেখা করিতেন, ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, মেলামেশার মধ্যেও যথেষ্ট ব্যবধান ছিল।

২৬ বৎসর পরে আদালতে দণ্ডায়মান বাদীকে দেখাইয়া যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, ইনিই দ্বিতীয় কুমার কি না, তখন মিঃ র‍্যাঙ্কিন ধীরভাবে বলেন,—

অথবা জয়দেবপুর লইয়া যান নাই বলিয়াছেন যে, বাদী অদ্ভুত রকমের কঠিন হিন্দী বলিতেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বাদী জয়দেবপুরে তাঁহার নাম সুন্দরদাস বলিয়া বলিয়াছেন ; যদিও ২৭শে জুলাইর পাঞ্জাব রিপোর্টে প্রথম ঐ নামের উল্লেখ দেখা যায়। নিম্নে তাঁহার সাক্ষ্যের আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করা হইবে, যাহাতে তাঁহাকে একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে হইবে।

দুই রাণী ও সত্যবাবু ভিন্ন ইহাই সমস্ত সাক্ষী। অবশ্য নায়েব এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী (যাহাদের উপর আদেশ ছিল যে, কেহ যেন বাদীপক্ষে সাক্ষ্য না দেয়) এবং প্রজা সাক্ষীদিগকে (নায়েবমহাশয়গণ যাহাদিগকে রায়-সাহেবের 'নমুনা সাক্ষ্যে' পুনরাবৃত্তি করিবার জন্য সঙ্গে লোক দিয়া পাঠাইয়াছিলেন) ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। ফণীবাবু, তাঁহার ভগ্নী এবং ভগ্নীর জামাতা (যিনি এষ্টেটে চাকুরী করেন) ভিন্ন আর কোন আত্মীয় বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দেন নাই। মেজরাণীর নিজের লোকের মধ্যে একমাত্র তাঁহার এক আত্মীয়া, যিনি তাঁহার ১৬ বৎসর বয়সে মেজকুমারকে শেষবার দেখেন, এবং যাঁহার অস্বীকৃতি প্রায় স্বীকারোক্তির কাছাকাছি আসিয়াছিল এবং এক ব্যক্তি, যিনি তহবিল তছরুপের অপরাধে সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন,—এই দুইজন সাক্ষী ভিন্ন উত্তর-পাড়া হইতে আর কেহ সাক্ষ্য দেন নাই। সূর্য্যবাবু ও রামবাবুর বিধবা পত্নীদ্বয় (মেজরাণীর মামীমা) এখনও জীবিত। একমাত্র মিঃ এস, পি, ঘোষ ভিন্ন এমন একজনও নিরপেক্ষ পদস্থ লোক নাই, যিনি কুমারকে চিনিতেন, ও তখনও কুমারের কথা স্মরণ ছিল এবং তাঁহার সম্পর্কে কোন ভুল হইত না। অপরপক্ষে কুমারের ভগ্নীর সাক্ষ্য, তাঁহার বিশ্বাসের সততা শুধু তাঁহার উক্তির নির্ভর করে নাই। ৪ঠা ও ৫ই মে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, যাহার ইঙ্গিত নীডহামের রিপোর্টে রহিয়াছে এবং সাক্ষ্য প্রমাণে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে,—সেই পরিস্থিতির উপরও নির্ভর করে। এতদ্ভিন্ন বহু লোকের আচরণ, নিরপেক্ষ বহু স্ত্রীপুরুষের হলপযুক্ত জবানবন্দী—এমন কি রাণীর নিজের একজন আত্মীয় ও মামীমার সাক্ষ্যও যাঁহাদের সততা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নাই, এবং যাঁহাদের কুমারকে ভুল করিবার সম্ভাবনা—ইহা সমর্থন করে। প্রত্যেকেই কুমারের ভগ্নী নহেন। অবশ্য বিবাদী পক্ষের সাক্ষিগণ বাদীর চেহারার সহিত কুমারের চেহারার সাদৃশ্য নাই, একথা বলিয়াছেন। রাণী ও তাঁহার ভাই সাদৃশ্যের কথা

গ্রহণ করেন নাই, এবং তাঁহার স্বামী ব্রজবাবু বাদীকে একজন প্রতারক বলিয়া নোটিশ জারী করিয়াছেন। কোন পক্ষই তাঁহাকে ডাকেন নাই এবং কৌঁসুলী তাঁহার সওয়ালে তড়িন্ময়ী অথবা তাঁহার স্বামীর কথা উল্লেখ করেন নাই। কোর্টের বাহিরে ইঁহাদের উক্তির কোন মূল্য নাই কিন্তু এই ভগ্নী বাদীকে অস্বীকার করিয়াছেন ইহা একটি অদ্ভুত কথা। কারণ ৪নং বিবাদিনী তাঁহার বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, ভগ্নিগণ তাহাকে (বাদীকে) কুমার বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। ৩৭১ নং একজিবিটে এই মহিলাটী সাধুর জন্য ভগ্নীদিগকে দোষ দিয়াছেন; মিঃ চৌধুরী ইহাও লক্ষ্য করেন নাই যে, নথীতে শুধু এই চিঠি ও এই বর্ণনাই নাই। মিঃ লিণ্ডসের ১৯২১ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখের একখানা চিঠিও রহিয়াছে ঐ চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন— ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরলোকগত দ্বিতীয় কুমারের ভগ্নিগণ এবং বাবু আনন্দ চন্দ্র রায় সাধুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন (একজিবিট ৪৩৫নং। বাদী কর্ত্তৃক সত্যভামা দেবীর শবদাহের সময় তড়িন্ময়ী দেবী গিয়াছিলেন। বাদীকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সত্যভামা দেবীর শ্রাদ্ধে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন আমি ইহা বিশ্বাস করি—তদন্তের দরখাস্তে তিনি স্বাক্ষর করেন এই সম্পর্কেও কোন তর্ক নাই। ১৯২১ সালের মে মাসে তিনি জয়দেবপুর যাইয়া বাদীকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। বাদী যখন ঢাকায় ছিলেন তখন তিনি তথায় যাইতেন এবং তাহার পাতের ভুক্তাবশিষ্ট খাইতেন। তিনি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। তিনি ভাই ফোঁটা ও ভাই ছাতুতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর উক্তির উপরই, শুধু ইহা নির্ভর করে না। তড়িন্ময়ী দেবীকে ঢাকায় সারদা গাঙ্গুলীর বাড়ীতে কোন বিবাহ উপলক্ষে বাদীর সহিত একা বদ্ধ ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। (বাদী পক্ষের ১০০৪—১০০৫—৯১৩নং সাক্ষী)।

সত্যভামা দেবীর মৃত্যুর পর তৃতীয় বিবাদী (দত্তক পুত্র) প্রপৌত্র হিসাবে তাহার ত্রিরাত্র শ্রাদ্ধ করেন। ঐ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনজন ভদ্রলোককে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাঁহারা তড়িন্ময়ী দেবীকে বাড়ীর ছাদে বাদীর পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। তাহারা শ্রাদ্ধ দেখিতেছিলেন (বাদীপক্ষের ১০০৪, ১০০৮, উভয়েই এই আদালতের উকীল)। এই মহিলাটী বাদীকে অস্বীকার করিবেন, এইরূপ মনে করা বৃথা। তিনি এই মামলায় সাক্ষ্য দিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার স্বামী ১৯২৫ সালে দত্তক নাকচ করিয়া দিবার জন্য এক মামলা আনিয়াছিলেন। তিনি কেন এই মামলা আনেন, তাহার কারণ সম্পর্কে গবেষণা করার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে,

কুমারের আকৃতি সম্পর্কে বাদীপক্ষ রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষেরও একখানা এভিডেভিট দাখিল করিয়াছেন; মিঃ চৌধুরী প্রথমে বলিয়াছেন, তিনি ঐ এভিডেভিট মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু পরে তাহারা ঐ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

কুমার যে সকল পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, বাদীপক্ষ তাহার উপরও নির্ভর করিয়াছেন। বাদীপক্ষ যে পুরাতন জুতা ও পোষাক আদালতে দাখিল করিয়াছেন তাহা যে কুমারের—সেই সম্পর্কে কোনও বিতর্ক নাই। পরে আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করিব। দর্জ্জি, জুতাপ্রস্তুতকারক প্রভৃতিদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছিল, বিবাদী পক্ষ তাহার প্রায় কোনওটির যে প্রমাণ করিতে চাহেন নাই তাহাও সত্য। ঐ সকল তথ্যের মধ্যে শুধু একটি বিষয়, অর্থাৎ কুমারের পায়ে ৬ নম্বর জুতা লাগিত—শুধু এই বিষয়টি তাঁহারা প্রমাণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা গেল বাদীর পায়েও ৬ নম্বরের জুতাই লাগে। বিবাদী পক্ষের কৌসুলী বলিয়াছেন, বাদীর পা দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, বাদীর পা বড়। তাই তাঁহারা ঐ সম্পর্কে বাদীকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই, মিঃ গোয়ালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বিধবা স্ত্রীলোকেরা স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ তাহাদের স্বামীর জুতা, কোট ইত্যাদি যাহা রক্ষা করে, বিবাদী পক্ষ তাহার কিছুই আদালতে দাখিল করেন নাই। রাজবাড়ীর এক প্রকোষ্ঠে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের জিনিষপত্র এখনও রাখা হইয়াছে। কুমারদের স্ত্রীরা তাহা দেখিয়াছেন, সুতরাং মনুষ্যসুলভ মমত্ববোধে না হউক অন্ততঃ তাহা দেখিয়াও তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীদের জিনিষপত্র ঐরূপে রক্ষা করিতে পারিতেন।

ইনসিওরেন্সের কাগজপত্রের কথা আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া আমি এখন ফটোগ্রাফ ও মৌখিক সাক্ষ্য আলোচনা করিব। ফটোগ্রাফের বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমি চেহারা সম্পর্কে উভয় পক্ষের বক্তব্য বিষয়গুলি বর্ণনা করিব; তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, ফটোগ্রাফে কোন কোন বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এই বর্ণনা দিয়াছেন :—

তাঁহার নিজের সম্পর্কে বর্ণ—গৌর, চক্ষু—কটা, বিশেষ বিবরণ বলিতে পারেন না, চুল—কটা, ফিকে বাদামী। মেজকুমারের বর্ণ—গৌর, লালচে ও হলদে আভা আছে; বর্ণ ফর্সা, গোলাপী আভা আছে; চক্ষু—কটা, ফিকে, নীল, চুল—কটা, ফিকে, বাদামী।

বুদ্ধু—বর্ণ,—মেজকুমারের মতই ফর্সা, তবে তাহার ন্যায় লালচে আভা নাই; চক্ষু—কটা, নীল, চুল—কটা, মেজকুমারের নাক ছোটকুমার অপেক্ষা কালো। এক কথায় বলিতে গেলে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর মতে মেজকুমারের শরীরের বর্ণ, চক্ষু ও চুল বাদীর ন্যায়। তাঁহার মতে মেজকুমার ও বাদী একই ব্যক্তি, সুতরাং তিনি শুধু যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন তাহা নয়, তিনি বাদীকে মেজকুমার বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আরও বলেন, এখন বাদী একটু ময়লা হইয়াছেন, কিন্তু ১৯২১ সালে তাঁহার রং আরও ফর্সা ছিল, তিনি বলেন, নাকও ঠিক মেজকুমারের নাকের ন্যায়, যদিও কেহ কেহ বলে বাদীর নাক মেজকুমারের নাকের চেয়ে চ্যাপ্টা। তাহার মতে বাদীর নাক চ্যাপ্টা নয়; তবে বাদী এখন মোটা হইয়াছেন, তাই নাকও মোটা হইয়াছে।

আকৃতি বিচারে তাঁহার সাক্ষ্য মূল্যহীন, কারণ তিনি বাদীকে কুমার বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে অন্য দুই জনের চেহারার তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা কাজে আসিবে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, তাঁহার, মেজকুমারের ও ছোটকুমারের গায়ের রং একরূপ—উহা সাহেবী, অর্থাৎ ইংরাজদের গায়ের রং যেরূপ, তাঁহাদের গায়ের রংও সেইরূপ। তাহাদের চুল বাদামী রংও সেইরূপ। তাঁহাদের চুল বাদামী রং-এর এবং চক্ষু কটা—বাঙ্গালীদের মত কালো নয়।

চক্ষু ও চুল বিশ্লেষণ

মামলার বিচারকালে এক সময়ে মিঃ চৌধুরী 'কটা' শব্দের অর্থ লইয়া তর্ক তুলিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার নিজের পক্ষের সাক্ষীই বাদীর চক্ষু এবং মধ্যমকুমারের চক্ষু একই রকমের 'কটা' বলিয়া বর্ণনা করে এবং তারপর যখন ইনসিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্টে দেখা যায় যে, মধ্যমকুমারের চক্ষু সেখানে 'ধূসর' বলিয়া লেখা আছে, তখনই বাদী পক্ষ কর্ত্তৃক কুমারের চক্ষুকে নীলবর্ণ বলিয়া সপ্রমাণ করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বিবাদী পক্ষের মামলা সেখানেই শেষ হইয়া যায়। এ বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই।

বিবাদী পক্ষের সাক্ষী মিঃ এস, পি, ঘোষ (কমিশনে গৃহীত সাক্ষী), ১৯৩০ সালে সাক্ষ্যদানকালে মধ্যমকুমারের, তাঁহার ভগ্নীর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর, ছোটকুমারের এবং বুদ্ধুর চক্ষু 'কটা' রকমের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। চুলের এবং চক্ষুর সমালোচনাকালে আমি পুনরায় এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। সেই সমালোচনা হইতে বেশ বুঝা যাইবে,—চক্ষুর সম্বন্ধে বলিতে হইলে 'কটা' শব্দ

মধ্যম কুমারের নাক—পাতলা এবং চোখা; কিন্তু বাদীর নাক চ্যাপ্টা, মোটা।

মধ্যমকুমারের চুল বাদামী রঙের, কিন্তু বাদীর চুল কালো।

মধ্যম কুমারের চক্ষু বড, টানা, ঈষৎ নীলাভ—সাহেবদের মত, কিন্তু বাদীর চক্ষু ছোট, গোল এবং ফ্যাকাসে।

মধ্যমকুমারের গায়ের রং লাল্‌চে—সাহেবদের গায়ের রঙ্গের মত; কিন্তু বাদীর গায়ের রং সাদা।

মধ্যমকুমারের ঠোঁট পাতলা; কিন্তু বাদীর ঠোঁট মোটা ও ভারী।

মধ্যমকুমারের গোঁফ মোটা, বাদামী রং, এবং কাষ্ঠিবন্ধক আটার মত সামগ্রীর দ্বারা একস্থানে আটা থাকিত; কিন্তু বাদীর গোঁফ পাতলা।

মধ্যমকুমার হেলিয়া দুলিয়া চলিতেন, কিন্তু বাদীর গমনভঙ্গী সাধারণ মানুষের ন্যায়। বাদী মধ্যমকুমারের অপেক্ষা বেশী লম্বা।

মধ্যমকুমারের বুকে চুল ছিল না; কিন্তু বাদীর বুক চুলে ভরা।

মধ্যমকুমারের কপাল সমতল ছিল, কিন্তু বাদীর কপাল উঁচু।

মধ্যমকুমারের চোখের ভ্রূ দুইটী মোটা—দেখিতে যেন তুলিতে আঁকা। কিন্তু বাদীর ভ্রূ পাতলা এবং চুল শূন্য।

১৯৩৩ সালের ৮ই মার্চ্চ উক্ত বর্ণনা দেওয়া হয়। এক মিঃ এস, পি, ঘোষ ছাড়া বাদীকে সনাক্ত করিবার মত আর কোনও সাক্ষীর সাক্ষ্য ইহার পূর্ব্বে গ্রহণ করা হয় নাই। অতুলবাবুর অপেক্ষা অথবা অতুলবাবুর মতই সনাক্ত করণ বিষয়ে মিঃ ঘোষের যোগ্যতা থাকিলেও বিবাদীগণ তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কোনও বিষয় প্রমাণ করিবার প্রয়াস পান নাই।

কমিশনে আর আর যে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাঁহারা মধ্যম কুমারের চেহারার কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে শৈবলিনী দেবী জেরার মুখের পার্থক্য সম্বন্ধে বলেন সামান্য কিছু বলিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশিত পার্থক্যের বিষয় এই—দ্বিতীয় কুমারের চক্ষু নীলাভ, বুদ্ধুর চক্ষুও নীলাভ, বাদীর চক্ষুর রং সাদা, দ্বিতীয় কুমারের গায়ের রং পীত, বুদ্ধুর রং খুব ফরসা, বাদীর রং রক্তাভ। দ্বিতীয় কুমারের চুল কটা, সুন্দর, পাট করা এবং মসৃণ, বুদ্ধুর চুল কটা, বাদীর চুল অপেক্ষাকৃত কম লাল, মোটা, খাড়াখাড়া এবং রুক্ষ।

লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল পুলী তাঁহার সাক্ষ্যে বড় কুমারের বর্ণনায় বলিয়াছেন—

বড়কুমারের মুখাবয়ব ছিল উল্লেখযোগ্য। একদিকে মোচড়ান, সাক্ষীর মনে হয়, ডান দিকেই মোচড়ান ছিল। চক্ষু দুইটি ছিল অদ্ভুত, একটু টেরা,

একটা জ্ঞাতব্য বিষয়। এই দেশে একজন লোক ২৫ বৎসব পর্য্যন্ত এবং ২০।২১ বৎসর বয়সে ৫ ফুট লম্বা হয় ও ২৫ বৎসর বয়সে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা হইতে পারে। উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি হইতে সোয়া ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়িতে পারে। শরীরের কয়েকটা হাড় পূর্ণ হইলেই বাড়িবার সীমা স্থির হইয়া যায়। উরুতে অস্থির তিনটি কেন্দ্র আছে, ঐগুলি হাড়ে পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকে, উহা প্রসারিত হইলেই বাড়্তি বন্ধ হইয়া যায়। ইহা বলা হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে ২০ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত এক চতুর্থাংশ ইঞ্চি উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন রকম বাড়ে। উচ্চতা সম্পর্কে র‍্যাডলফ মার্টিনের একখানি বই আছে।

ডাঃ ব্রাডলে বি-এ, এম-ডি, বি-এইচ-এম (ক্যানাডা)—ইনি পি, এণ্ড ও এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টীম-নেভিগেশন কোম্পানীর চীফ মেডিক্যাল অফিসার ও রয়েল সোসাইটি অব-ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ফেলো। তিনি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ১২ হইতে ২৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উচ্চতা খুব বাড়ে এবং ২২ অথবা ২৩ বৎসর বয়সে উহা বন্ধ হইয়া যায়। তবে ইহার ব্যাতিক্রমও আছে ইংলণ্ড। আয়র্লণ্ড, স্কটল্যাণ্ডের লোক অন্যস্থানে যাইলে তাহারা ২০।২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ে তিনি বলিয়াছেন যে, ১২ হইতে ২১ পর্য্যন্ত খুব বাড়ে, তবে নৃ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে লোক ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বাড়ে। সাক্ষী মনে করেন যে সচরাচর ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লোক বাড়ে না, ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লম্বা হাড় বাড়ে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে কুমার শিকার করিত, ঘোড়া দৌড়াইত, গাড়ী চালাইত, তাহার শ্রেণীর লোক ২১ হইতে ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়তে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার ছেলের ২০ বৎসর বয়সের সময় পুত্র অপেক্ষা তিনি লম্বা ছিলেন। বর্ত্তমান সময় তাঁহার পুত্রের বয়স ২৫ বৎসর। বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র তাঁহার অপেক্ষা আধ ইঞ্চি বেশী লম্বা, তাহার ওজনও তাঁহার অপেক্ষা বেশী। তাঁহার সাক্ষ্য দেওয়ার তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পুত্রের ওজন লইয়াছিলেন। সাক্ষী ইনসিওরেন্স ডাক্তার হিসাবে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তিনি ম্যানুফেকচার্স লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর চেকারীর কাজ করিয়াছেন। ওজন সম্পর্কেও তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কারণ ইনসিওরেন্স ডাক্তারদের রেকর্ড তাহাকে দেখিতে হইয়াছে। তাহাকে পুনরায় বীমা করা সম্পর্কিত কাগজপত্র এবং পুরাণ আবেদনের সহিত নূতন আবেদন মিলাইয়া দেখিতে হইয়াছিল।

শরীরের উচ্চতা বিষয়ক প্রশ্ন

দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন,—ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডাক্তারেরা যে প্রকার মাপ লন, তাহা বিজ্ঞানসম্মত অর্থাৎ সঠিক, হওয়া উচিত। কিন্তু তিনি দেখিয়াছেন যে, সে সকল মাপ সব সময় ঠিক হয় না। কেননা অনেক ডাক্তার আছেন, যাঁহাদের মাপ গ্রহণাদির সুযোগ সুবিধা নাই। সে ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে সেই আদিম প্রথারই আশ্রয় লইতে হয়; যেমন দেওয়ালের নিকট দাঁড় করাইয়া, মাথার উপরকার দেওয়ালে দাগ দেওয়া, দেওয়াল সকল ক্ষেত্রে ঠিক সমান্তরাল নাও হইতে পারে এই প্রকারে মাপ গ্রহণের কথা, বিবাদী পক্ষের কৌশুলী আর দাস নামক জনৈক ইনসিওরেন্স এজেণ্টের মুখ দিয়া বলাইয়া লইয়াছিলেন (বাদীর ৯৭৫নং সাক্ষী) অন্য যে সকল ক্ষেত্রে উচ্চতার বাড়্তি লক্ষিত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন (২৬৭, ২৫০, ২৭০ হইতে ২৭২নং একজিবিট); আমি সে সকল দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিতেছি না।

এই বিষয় সম্পর্কে আমি দুইজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতেছি তাঁহাদের উক্তি বহুদর্শিতামূলক; সে সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। মিঃ চৌধুরী আমাকে লায়নের মেডিকেল জুরিস প্রুডেন্স গ্রন্থের (১৯২১, সপ্তম সংস্করণ) ৪৬ পৃষ্ঠায় উচ্চতা ও ওজন সম্পর্কিত এক তালিকা দেখান। তাহাতে উচ্চতা, ওজন এবং বয়স প্রভৃতির আনুপাতিক পরিমাণ এবং গড়া হিসাবে তাঁহাদের ক্রমের একটা ধারা ইংরেজী প্রথা মতে দেওয়া আছে। যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা চলিয়াছে, তদালোচনা সম্পর্কে এই তালিকার কোনও প্রয়োজন নাই কারণ, উক্ত গ্রন্থের নবম সংস্করণে (১৯৩৫, ৯ম সংস্করণ) পূর্ব্বোক্ত তালিকা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রকারে ইহা খুবই সম্ভব এবং সত্য বলিয়া মনে হয় যে, কুমারের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার দেহের উচ্চতা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। কেন না, বাদীর উচ্চতা যদি ঠিকই ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি হইত, তাহা হইলে উক্ত ঘটনাকে বাদীর বিরুদ্ধ বলিয়া সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস দেখা যাইত, কিন্তু এ প্রকারের সম্ভাবনা ছাড়াও এই প্রসঙ্গে আরও দুইটী বিবেচনার বিষয় আছে তাহার একটা এই,—কয়েকজন ছাড়া, বিবাদীপক্ষের কোনও সাক্ষীই এ কথা বলেন নাই যে, ১৯২১ সালে তাঁহারা যখন বাদীকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের চোখে বাদীকে একটু লম্বা দেখাইতেছিল। অতুলবাবু (কমিশনে সাক্ষ্য দেন) বলেন,—সম্ভবতঃ বাদী অপেক্ষাকৃত লম্বা; তিনি

সে সম্পর্কে এক লম্বা তালিকা দিয়াছেন। ফণীবাবুও বলিয়াছেন,—বাদী অপেক্ষাকৃত লম্বা, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

এখন দেখা যাউক, অন্যান্য সাক্ষী বাদীর উচ্চতা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের ১৪০নং সাক্ষী বলিয়াছেন,—"বাদী সামান্য একটু লম্বা। কিন্তু আমি বলিতেছি না যে, কেবল এই একই বিষয়ে বাদীর সহিত কুমারের স্বাতন্ত্র্য।" বিবাদী পক্ষের ১৫নং সাক্ষী বলেন,—"আমার অনুমান হয়, বাদী যেন সামান্য একটু লম্বা। কিন্তু পার্থক্য এমন বেশী কিছু নয় যে, দুইজনকে এক বলিয়া বুঝা যায় না।" বিবাদী পক্ষের ৬১নং সাক্ষী একজন মাহুত। সে কুমারের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিত। উক্ত মাহুত সাক্ষী বিশেষভাবে বলে,—"কেবল উচ্চতায় সামান্য তারতম্য দেখিয়া কাহারও বলিবার সাধ্য নেই যে, বাদী মধ্যম কুমার নয়।" ডাক্তার আশুতোষ এবং রায় সাহেব যোগেন্ বাবু এই বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই। সত্যেন্দ্রবাবু (যিনি ১৯৩৫ সালে আদালতে বাদীকে দেখিয়াছিলেন) বলেন,—"আমি বাদীকে অপেক্ষাকৃত লম্বা বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম কিন্তু আকৃতির পার্থক্যই বড় কথা নয়।" সত্যবাবু এতদ্বারা বুঝাইতে চান যে, পার্থক্য যে ছিল, সে কথাও নিশ্চয় বলা যায় না।

কর্ণেল পুলী মনে করেন যে, বাদীর এবং কুমারের দেহের উচ্চতা একই প্রকারের, তিনি উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কোনও নির্দ্দেশ দেন না। ১৯০৯ সালে কুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যদি আদৌ কুমারকে তিনি দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮ই এপ্রিলের মধ্যে কুমারের সহিত তাঁহার দেখা হওয়া সম্ভব। মিঃ র‍্যাঙ্কিনের ধারণা, বাদীর এবং কুমারের দেহের উচ্চতা প্রায় একই প্রকারের। এ সম্বন্ধে বিবাদী পক্ষের জনৈক সাক্ষীর উক্তি বিশেষ কৌতুহলপ্রদ। সেই সাক্ষী বলে,—বাদী সামান্য একটু লম্বা; কি করিয়া বাদী বেশী লম্বা হইবে? বিবাদী পক্ষের আর এক সাক্ষী বলে,—বাদী তিন চারি ইঞ্চি বেশী লম্বা। বাদী এত লম্বা যে, দেখিলেই বুঝা যায়, বাদী সে লোক নয়। এই দুই সাক্ষীর উক্তি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। অতুলবাবুও —'হয় তো', 'সম্ভবত' বাদ দিয়া আর বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। ১৯০৫ সালের ২রা এপ্রিল তারিখের বয়সের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ ঐ সময় পর্য্যন্তও কুমারের দেহের 'বড়' হওয়া বন্ধ হয় নাই। মিঃ র‍্যাঙ্কিনের সাক্ষ্য, এবং কুমারকে যাঁহারা ভালভাবে জানিতেন—এই বিষয়ে প্রশ্নে তাঁহাদের নিরুত্তর এবং আলোচ্য

কাটিয়া ছাটিয়া অদলবদল করা হইয়াছিল, বিবাদীপক্ষের এ অনুমানও পরে প্রত্যাহৃত হইয়াছিল। ফটোতে যে কোটের এবং পোষাকের ছবি দেখিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে ১৮নং একজিবিটের দরবার পোষাকের সহিত ট্রাউজারের যে ছবি দেখা যায়, তাহাতে দেখিতে পাই, পায়ের গোড়ালীর নিকটস্থ ট্রাউজারের অংশ কতকটা গুটাইয়া আছে। মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন, উহা ঠিক মানায় নাই। উহা 'মিস্‌ফিট' হইয়াছে। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, বাদী কুমার হইতে দীর্ঘাকৃতি নহে; বরং তাহার 'পা-জামা'র প্রতি লক্ষ্য করিলে আপনি তাহাকে একটু খাটোই বলিতে পারেন।

এইরূপ পোষাকের বেলায় পাজামা একটু বেশী লম্বাই করা হয় এবং তাহা একেবারে জুতার তলা পর্য্যন্ত পৌঁছে। পাজামার মধ্যে আটিয়া রাখার উপায় স্বরূপ বন্ধনী আছে; তবে যখন ফটো লওয়া হইয়াছিল তখন পাজামা এই সমস্ত বন্ধনী দ্বারা আটা ছিল না। আমি মনে করি যে দ্বিতীয় কুমার বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই এখন বাদীর সমান দীর্ঘদেহ হইতে পারিতেন। বাদীর দেহের এই দীর্ঘতা দ্বারা কুমারের সহিত তাহার সাদৃশ্য বিনষ্ট হয় না। বিবাদী পক্ষ কুমারের দেহের দীর্ঘতা সম্পর্কে যে সকল পরিমাপ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সহিত বাদীর শারীরিক উচ্চতার কোন বিরোধ নাই, ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে।

বাদী ও মেজকুমারের তুলনার কথা

এই মুখবন্ধে বিবাদী পক্ষের সুবিজ্ঞ কৌঁসুলী উল্লেখ করেন যে, ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারকে বেশ ভদ্রলোকের মত দেখাইত; আর এই বাদীকে যেন "এক বিশালকায় পালোয়ানের" মত দেখায়। সংক্ষেপে বাদীকে বেশ মোটা বলিতে পারা যায়। উভয়ের মধ্যে বৈষম্য প্রদর্শন করিতে গিয়া বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী ইহাও বলিতে পারেন যে, কুমারের বয়স ছিল ২৫ বৎসর; আর এই লোকটির বয়স ৫২ বৎসর।

বাদীর শরীরের বর্ণ সম্পর্কে বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। বাদী দেখিতে অতিশয় ফরসা। এই ফরসা রং বায়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটু খানি রক্তিম আভা রহিয়া গিয়াছে। বাদী ও কুমারের মধ্যে আকৃতিগত বৈষম্য দেখাইতে গিয়া বিবাদী পক্ষের সাক্ষিগণ কেবলই এই রক্তিমাভার উপর জোর দিতে ছিলেন। এই রক্তিমাভা এবং তাহার রং যে ইতিমধ্যে অনেকটা ময়লা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই কথা উঠিয়াছে যে, দ্বিতীয় কুমারের শরীরের রং ছিল পীতাভ; কিন্তু এই বাদীর রং কেবল যে লাল তাহা নহে, কিঞ্চিৎ ময়লা।

ফর্সার মধ্যেও একটু রকমারি আছে। এই বাদী শ্বেতবর্ণ; কিন্তু কুমার ছিলেন লাল; কুমারের বর্ণের মধ্যে একটা পীতাভা ছিল; কিন্তু এই বাদীর তাহা নাই।

১৯২১ সালে এবং তৎপরে বাদীর শরীরের রং কিরূপ ছিল, তৎ-সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা বিবাদীপক্ষের সাক্ষীগণের নিম্ন-লিখিত উক্তিগুলি পাই :—

"অতি সুন্দর পরিষ্কার চামড়া"—মিঃ লিণ্ডসে।

"স্বাস্থ্যের পরিচায়ক শ্বেতবর্ণ"—মিঃ গুপ্ত (বিবাদী পক্ষের ২৫নং সাক্ষী)

"অতি সুন্দর ফর্সা লোক"—কমিশনে গৃহীত মিঃ দেবব্রত মুখুয্যের সাক্ষ্য।

প্রশ্ন :—বাদীর রং কি কুমারের রং হইতে ভিন্ন রকমের? উত্তর :—না, সম্পূর্ণ পৃথক রকমের নহে। বাদীও ফর্সা, তবে একটা রক্তিমাভা আছে।

প্রশ্ন :—যদি কেহ বলে যে, দ্বিতীয় কুমারের মুখ লালচে রকমের ছিল, তাহা কি সত্য হইবে? উত্তর :—কতকটা লাল্‌চে ছিল। দ্বিতীয় কুমারের মুখ ফর্সা ও লাল্‌চে ছিল। লালচে এই কথায় আমার সম্মতি আছে। রোদে পোড়া ছিল বলিয়া আমি বলিয়াছি যে কিছু লাল্‌চে। বাদীর মুখের রংটাও লালচে বটে; তবে সাহেবের মুখে যেরূপ লালচে দেখা যায় ইহা হইতেছে সেইরূপ লালচে; ইহাকে রোদে পোড়া বলিয়া মনে হয় না।

বিবাদীপক্ষের ১৪নং সাক্ষী শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীও এইরূপ বলেন। ইনি জয়পুরে থাকিয়া কোন স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন এবং চাকুরী সম্পূর্ণরূপে ভাওয়াল এষ্টেটের দয়ার উপরই নির্ভর করিত। এই সাক্ষী কুমারের অক্ষর বিষয়ক জ্ঞান প্রমাণের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কথা নিম্নে আলোচনা করিতে হইবে।

যামিনী প্রসন্ন গাঙ্গুলীর সাক্ষ্য

শ্রীযুক্ত যামিনী গাঙ্গুলী পরম খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী; তাঁহার মর্য্যাদাও খুব উচ্চ। এই সাক্ষীর গুণাগুণ ও ব্যক্তিগত মর্য্যাদার কথা নিম্নে উল্লেখ করিব। ইনি লেডী হার্ডিঞ্জ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তৈলচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি নিজেও খুব ফর্সা লোক। অতএব বর্ণ সম্পর্কে তাঁহার কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বলেন,—ইহা বলা যাইতে পারে যে, কোনও জিনিষের রং বিচার করিবার উত্তমরূপ ক্ষমতা আমার আছে। আমি মনে করি যে, বাদী বর্ত্তমানে আমার নিজের অপেক্ষাও সামান্য একটু খানি বেশী ফর্সা। উষ্ণ মণ্ডলের একজন ইউরোপীয়ানের গায়ের যেরূপ

বিষয়েই সাদৃশ্য নাই। মাত্র সেদিন তিনি বাদীকে দেখিয়াছেন, বুদ্ধুকেও দেখিয়াছেন। একই সময়ে এবং একই স্থানে দেখা হইয়াছে। এই ব্যক্তি আরও বলেন যে বাদী ও দ্বিতীয় কুমার অন্যান্য দিক দিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক একথা বলিলে ভুল বলা হইবে।

কাহার রং কেমন

এক্ষণে প্রশ্ন বুদ্ধুর গায়ের রং কিরূপ ছিল? জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, ছোটকুমার, মেজকুমার এবং তাঁহার নিজের মতই ইহা সাহেবী রং ছিল। তবে এইটুকু পার্থক্য ছিল যে, বুদ্ধুর রং দ্বিতীয় কুমারের মত এতটা লাল্‌চে ছিল না। তবে ছোটকুমার অত্যন্ত ফর্সা ছিলেন এবং কতকটা রক্তিমাভাও ছিল। শৈবলিনী বলেন যে, ছোটকুমার "অত্যন্ত ফর্সা" ছিলেন। মিঃ র‍্যাঙ্কিন বলেন যে, "ছোটকুমারের রং ছিল দ্বিতীয় কুমারের তুলনায় কিঞ্চিৎ ময়লা"; কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল পুলি (তিনি কুমারকে ভাল করিয়াই জানিতেন); কেননা তিনি কুমারের সঙ্গে সকল সময়েই পলো খেলিয়াছেন এবং কুমারের নিকট একটা ঘোড়া বিক্রয় করিয়াছেন"। বলেন—"ছোটকুমার দ্বিতায় কুমারের সমান ফর্সা ছিলেন। বিবাদী পক্ষের ৮৭নং সাক্ষী সৌভাগ্যচাঁদ বলেন যে, ছোটকুমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফর্সা ছিলেন।

বাদীর গায়ের বর্ণের কথা

বাদী পক্ষের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, বাদী এবং মেজকুমারের গায়ের রং একই। খান সাহেব আবদুল হামিদও বলিয়াছেন যে মেজকুমারের গায়ের রং পীতাভ। বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ ইহা মোটেই স্বীকার করেন নাই, তাহারা লালচে বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, শৈবলিনী বলিয়াছেন যে, মেজকুমারের গায়ের রং পীতাভ এবং মুখ লাল নহে, কর্ণেল পুলি মেজো-কুমার খুব সুন্দর পুরুষ বলিয়াছেন, কিন্তু গায়ের রং গোলাপী বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের গায়ের রং মলিন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মেজকুমারের গায়ের রং বাদীর গায়ের মত হল্‌দে ও লালে মিশান। কয়েকদিন এই সাক্ষীকে আমি দেখিয়াছি, তাহার রং প্রায় সাদা ইউরোপীয়দেরই মত। তবে উহাকে মলিন দেখা যাইতেছিল।

মেজরাণীর গায়ের রং হলদে তবে উহা বাদীর রং হইতে আলাদা। যে সকল সাক্ষী মেজ কুমারের রং সাহেবী বলিয়াছেন, মিঃ চৌধুরী তাহাদিগকে জেরা করিয়াছেন এবং কোন বাঙ্গালীর রং সাহেবী হইতে পারে না। উহা

১৯২১ সনে আত্মপরিচয়ের পরে প্রথম গৃহীত ফটো।

দারজিলিং যাইবার পূর্বে গৃহীত ফটো।

চুলের রং

সাধারণতঃ বাঙ্গালীর চুল, কাল। একজন শ্বেতাঙ্গ সাক্ষী বলিয়াছেন যে, কখনো কখনো চুল লালচে বা লাল অর্থাৎ কটা হয়। বাদী তাঁহার চুলকে 'কটা' বলিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর চুল এখন পিঙ্গল বর্ণ। তিনিও উহাকে 'কটা' বলিয়াছেন। এই অঞ্চলে পিঙ্গল শব্দটা প্রচলিত; কিন্তু ভাওয়ালের সাক্ষী ও সুকুমারী দেবী 'কটা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা যে রংকে লালচে বলিয়াছেন, চুল সম্পর্কে সেখানে কটা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার অর্থ ই ঠিক হইয়াছে, তবে চক্ষু সম্পর্কে যখন শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন উহার অর্থ কাল ব্যতীত অন্য কিছু বুঝায়।

বাদী পক্ষের সাক্ষিগণ মেজকুমারের চুলকে পিঙ্গল বলিয়া বলিয়াছেন।

বাদিগণ পিঙ্গল কথাটি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মামলার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি না। মিঃ চৌধুরী বাদী পক্ষের ৩১৪নং সাক্ষীকে এই শব্দটি সৃষ্টি করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বাদী পক্ষের ৮২নং সাক্ষীকে কতদিন ধরিয়া এই শব্দটি জানিতেন বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন। মেজকুমারের দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে এই শব্দটা জানিতেন কি না বাদী পক্ষের ৩১৪নং সাক্ষিকেও উহা জিজ্ঞাসা করা হয়। সাক্ষীগণ মেজকুমারের চুলের রংটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শব্দের অভাবে তাঁহারা উহা পরিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না। বাদী পক্ষের ৩৫৫নং সাক্ষী বলিয়াছেন যে, চুলের রং উজ্জ্বল লাল। বাদী পক্ষের ১৩৩নং সাক্ষী বলিয়াছেন, গাঢ় কাল। বাদী পক্ষের ৩১৪নং সাক্ষী বলিয়াছেন, উহা কৃষ্ণাভ লাল। বাদীপক্ষের ২৬৩নং সাক্ষী বলিয়াছেন উহা লালচে বাদীপক্ষের ১০১ নং সাক্ষী বলিয়াছেন উহা নূতন পয়সার রংও নহে। বাদীপক্ষের ২১০ সাক্ষী বলিয়াছেন উহা তাম্রাভ। বাদীপক্ষের ১৩৫ নং সাক্ষী বলিয়াছেন পুরাতন তামার রং, উহা পূজার তাম্রপাত্রের রং বলিয়া বাদীপক্ষের ৩৫৫ নং সাক্ষী বলিয়াছেন বাদীপক্ষের ৮৯নং সাক্ষী বলিয়াছেন উহা তামাটে। বাদীপক্ষের ১২নং সাক্ষী বলিয়াছেন যে উহা সাক্ষীর কাটগড়ার রেলিংএর রংএর মত।

সংক্ষেপে মিঃ চৌধুরী বলিতে চাহিয়াছেন উহা তামাটে। বিবাদীপক্ষ এই প্রকার বর্ণনাই দিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের ১৯, ২৭, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৫৮, ৭০, ৭৬, ১৪০, ১৫৯, ২৯০, ৩১০, ৩২৫, ৩৯৭, ৩৪৮ নং সাক্ষীগণ উহাকে পিঙ্গল বা লাল বা লালচে বলিয়াছেন, বিবাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষী

সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—'নীল রং ধুইয়া ফেলিলে যেমন একটা নীলের ফিকে আভা রহিয়া যায়, মধ্যম কুমারের চোখের রং সেইরূপ ছিল।' কর্ণেল পুলি বলিয়াছেন এবং সাক্ষ্যপ্রমাণেও দেখা গিয়াছে যে, কর্ণেল পুলি একজন চিত্রশিল্পী বটেন; কিন্তু উহাই তাঁহার উপজীবিকা নহে। বালক, বৃদ্ধ হইলে দেখিতে কিরূপ হয়, তাহা তিনি হুবহু আঁকিয়া দিবার ক্ষমতা রাখেন—মিঃ পুলির এ দাবী প্রলাপের মত মনে হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, রং এর খুটিনাটি সম্বন্ধে তাঁহার বেশ নজর আছে। ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে তিনি প্রখরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি কুমারের চক্ষু ধূসর বর্ণ বলেন এবং ভঙ্গী প্রভৃতি ব্যাপারে কর্ণেল পুলি ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়াছিলেন। লড কিচেনারের শিকারের সময়ের বন্দোবস্ত সম্পর্কেও তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তিতে নিঃসন্দেহে ইহা সপ্রমাণ হইতেছে যে, ঐ সকল ব্যাপার সম্পর্কে আদৌ তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না, অপিচ ছোট কুমারের চক্ষের রং নীলাভাযুক্ত বলিতে তিনি উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া ইহা অবশ্যই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, মধ্যম কুমারের চক্ষু ফিকে নীল রঙের ছিল বলিয়া তিনি যে উক্তি করিয়াছেন, তাঁহার সেই উক্তি এবং রাজ কুমারদের উচ্চারণ-ভঙ্গী লর্ড কিচেনারের শিকার ব্যবস্থার ন্যায় অপরের উপদেশ অনুসারে করা হইয়াছিল কিনা;—অথবা ছোট কুমারের সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতি যেটুকু ছিল, তাঁহার সেই স্মৃতি হইতেই ঐ সকল বিষয় বলিয়াছিলেন কিনা তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কর্ণেল পুলি বলিয়াছেন,—বাদা এবং মধ্যম কুমার একই রকমের মোটা। কর্ণেল পুলি উভয়কে একই রকম স্থূলকাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছে যে, মধ্যম কুমারের দেহ পেশীবহুল ও সুগঠিত ছিল। ছোট কুমার কিছু মোটা ছিলেন (ফটো দ্রষ্টব্য XC VIII, EX IV, EXa 17) বড় কুমারের সঙ্গে ভুল হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কেননা, তাঁহার শরীরের রং কালো ছিল, তাঁহার গোঁফ দাড়ি ছিল না। তাঁহার মুখশ্রী একটু মোচড়ান গোছের ছিল।

কুমারের চক্ষু নীলবর্ণ কিনা

এক্ষণে এই শ্রেণীর সাক্ষ্য প্রমাণের সমালোচনা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখা যাউক। কমিশনে অতুলবাবুর সাক্ষ্য গ্রহণের সময় হইতেই, প্রথম মধ্যম কুমারের চক্ষু নীলবর্ণ ছিল বলিয়া একটা কাহিনীর সৃষ্টি হয়। পার্থক্যের

বিড়াল চোখ কিম্বা কটা চোখ বলিলে সাধারণ বাঙ্গালীদের কালো চোখ বুঝায় না। বাঙ্গালীদের অধিকাংশের চোখই কালো।

উভয়পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণের এই কথা প্রকাশ পাইয়াছে শ্রীযুক্ত এস, পি, ঘোষ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তিনি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনিও বলিয়াছেন, কটা এবং নীলাভ একই শ্রেণীভুক্ত। উকিল জগদীশ বাবুও এই কথাই বলিয়াছেন এবং বিবাদীপক্ষের আরও বহু সংখ্যক সাক্ষী এই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কটা বলিতে যদি একটি নির্দ্দিষ্ট রংকেই বুঝাইত, তবে এই প্রশ্ন লইয়া এত মাথা ঘামাইতে হইত না। বিবাদী পক্ষের অনেক সাক্ষীই এই কথা বলিয়াছেন যে, বাদী এবং দ্বিতীয় কুমারের চোখের রং এক রকম অর্থাৎ কটা। তাহার অর্থই হইল কালো নহে। কাজেই কেহ যদি বলেন যে, দ্বিতীয় কুমারের চক্ষু কটা ছিল তবে তিনি কোন বিশেষ রংয়ের কথা মনে করিয়া বলেন নাই। তিনি এই কথাই মনে করিয়া বলিয়া থাকিবেন যে, সাধারণ কালো চোখের মত নহে। এই বিষয়ে বিবাদীপক্ষের যে সকল সাক্ষীকে জেরা করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা নিম্নে দেওয়া গেল :—

বিবাদী পক্ষের ৩, ২১ এবং ১৪০ নং—সাক্ষী বলিয়াছেন, যাহা কালো নয়,—তাহাই কটা। বিবাদী পক্ষের ২১নং সাক্ষী বলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবং দ্বিতীয় কুমারের চোখ কটা। ৩২, ৫৮, ৩৭১, ৫৯ এবং ১২২নং সাক্ষী বলেন,—বাদী এবং দ্বিতীয় কুমার উভয়েরই চোখ কটা।

১২২ নং সাক্ষী রমানাথ বলে,—বাদী এবং কুমারের চোখ ও চুল কটা ; এতদ্ব্যতীত উভয়ের মধ্যে চেহারার কোন সাদৃশ্য নাই। ৫৯নং সাক্ষী জব্বর খাঁ বলে,—চোখের রং একই রকম, কেবল চাষীরাই যে কালো চোখ না হইলে কটা বলে এমন নয়, প্রত্যেকেই ইহা বলিয়া থাকে।

কেহ কেহ, বিশেষ করিয়া মুসলমানগণ কটার পরিবর্ত্তে করঞ্জা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং এই কারণেই ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ৩২৩, ৩৮, ৬৪, ৬৯, ৩৩৭,৩ ৫৪নং সাক্ষী এবং রমানাথ (কমিশনে গৃহীত) করঞ্জ শব্দ ব্যবহার করিয়াছে।

বিড়াল চোখও এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে চোখ কালো নহে, তাহাকেই বিড়াল চোখ বলা হয়। ইহাতে বিশেষ কোন রং নির্দ্দিষ্ট হয় না, কেবল ইহাই বুঝা যায় যে, চোখ কালো নহে। বিবাদী পক্ষের সাক্ষী (কমিশনে গৃহীত) জগদীশ বাবু বলেন, জ্যোতি, মেজকুমার এবং বুদ্ধুর বিড়াল চোখ ছিল। ৫৭নং সাক্ষী দুর্গাদাস পাল বলেন যে. যে চোখ

সাধারণ কালো চোখের মত নহে, তাহাকেই বিড়াল চোখ বলা হয়, আবার কটাও বলা হয়। তিনি আরও বলেন যে, আশুতোষ ডাক্তার কোথাও বলিয়াছিলেন যে দ্বিতীয় কুমারের বিড়াল চোখ ছিল এবং তিনি বিড়াল চোখ বলিতে বাদামী রং বলিয়া ভুল করিয়াছেন। পাঞ্জাবেও দেখা যায় যে, রং অনুসারে চক্ষুকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। একটি হইল মামুলী অর্থাৎ সাধারণ কালো রংয়ের এবং অপরটী হইল 'বিল্লি" অর্থাৎ যাহা কালো নহে। পাঞ্জাবের একজন বিশিষ্ট শিখ ভদ্রলোক এবং বিবাদীপক্ষের ৩৫৫নং সাক্ষী লেফটেন্যাণ্ট রঘুবীরের নিকট এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মালসিংহের কাহিনী বলিবার সময় তাঁহার কথা স্থানান্তরে উল্লেখ করা হইবে।

কটা চক্ষু সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সকল কটা চোখকে একই শ্রেণীভুক্ত করা হইলেও রং নিশ্চয়ই আছে এবং এই রংয়ের তারতম্য আছে; কিন্তু এদেশে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা কিংবা পাঞ্জাবে কেহই রং লইয়া বড় একটা মাথা ঘামায় না; অতএব কটা চোখের রং ফ্যাকাসে নীল, জলের মত নীল না ফিকে নীল ধূসর; নীলাভ ধূসর না ইস্পাতের ন্যায় ধূসর, বাদামী, না বেগুনী, কমলা না সবুজে কটা হইবে, কেহই কিছু বলেন না। অবশ্য এদেশে এই জাতীয় কয়েকটি রংয়ের আভা পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণতঃ কটা বলিতে বদ্‌রঙের কথাই এদেশে বুঝা যায়। কাজেই এদেশে কটা চুলের মত কটা চোখও লোকে পছন্দ করে না। বিবাদী পক্ষের ২৮০নং সাক্ষী সুকুমারী দেবী নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকারান্তরে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তাঁহাকে যদি কোন পাত্রী পছন্দ করিতে বলা হয়, তবে অন্যান্য দিক হইতে পাত্রী সুশ্রী হইলে, কটা চক্ষুতে তাঁহার কোন আপত্তি হইবে না।

কটা চোখের রং বড় কেহ একটা লক্ষ্য করিয়া দেখে না। সাধারণ সকলে চুল কিংবা চোখ কটা বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। একমাত্র নিকট আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠভাবে যাহারা মিশে, তাহাদের নিকটই কটা চোখের রং ধরা পড়ে। শ্রীযুত এস, পি, ঘোষ দ্বিতীয় কুমারকে শৈশব হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত জানিতেন। তাহার পরেও তিনি কুমারকে দেখিয়াছেন এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকেও তিনি বিশেষ ভালভাবেই জানিতেন। এখন এইরূপ সমস্ত চোখকে যিনি কটা শ্রেণীতে ফেলিতে অভ্যস্ত এবং যিনি কখনও ঐ শব্দটীর অনুবাদ করিয়াছেন, তিনি 'গ্রে' (ধূসর) কথাটী ব্যবহার করিবেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাদী বলিয়াছেন যে, তাহার চোখ কটা। আমি ঐ শব্দটীই লিখিয়া লই, কিন্তু ব্র্যাকেটে তাহার প্রতিশব্দ 'গ্রে' লিখি। অবশ্য, ইহা ভুল, কিন্তু আমার মনে

মিঃ র‍্যাঙ্কিন সাক্ষ্য দিতে আসিবার পূর্ব্বে প্রায় ২৭ বৎসর কাল দ্বিতীয় কুমারকে দেখেন নাই। তিনি জবানবন্দীতে বলেন, দ্বিতীয় কুমারের চোখের রং ছিল পাতলা রকমের। তিনি প্রকৃত রংটা কি, তাহা বলেন নাই। আমি তাঁহাকে একটা প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তদুত্তরে সাক্ষী বলেন যে, পাতলা রংএর—এই কথা দ্বারা তিনি নীল অথবা ধূসর বুঝাইতে চাহেন। জবানবন্দীর সময় বিবাদীপক্ষ তাঁহার নিকট হইতে এই কথাটি আদায় করিয়াছেন যে, সাক্ষীর নিজের চোখগুলিকে ধূসর কিম্বা নীল বলা যাইতে পারে। তিনি স্বীকার করেন যে, ধূসর ও নীল চক্ষু সম্বন্ধে তাঁহাকে একটা প্রশ্ন করা হইয়াছে। বীমা করিবার সময় ডাঃ যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহার কতকটা প্রস্তাব এই সাক্ষ্যের উপর দেখিতে পাওয়া যায়।

বীমার ডাক্তারের রিপোর্ট

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ কোন এফিডেভিটে বলিয়াছেন কিনা (প্রকৃত পক্ষে তিনি এরূপ বলিয়াছেন) যে, দ্বিতীয় কুমারের চক্ষুগুলি বাদামী আভাযুক্ত ছিল? সাক্ষীকে এইরূপ প্রশ্ন করা হইলে বিবাদী পক্ষের কৌসুলী মিঃ চৌধুরী বাধা দেন, এবং বলেন যে, এইরূপভাবে প্রশ্ন করিলে সাক্ষীর প্রতি সুবিচার করা হইবে না; কারণ এই বিষয়ে আরও কয়েকটি উক্তি রহিয়াছে। এস্থলে সাক্ষী কোন প্রকারেই বিচারক ছিলেন না; অতএব তাঁহার সম্মুখে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা যাইত না। বাদী পক্ষ হইতে কৌসুলী মিঃ চাটুয্যে যাহা'বলাইতে চাহিতেছিলেন, তাহা হইতেছে এই যে, এই "ধূসর অথবা নীল রং"—মূলতঃ যাহা সন্দেহ জনক স্মৃতির কথা মাত্র—তাহা প্রকৃতপক্ষে সাক্ষীর স্মরণ আছে কি না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে, এই সাক্ষী তৃতীয় কুমারের চক্ষের রং কিরূপ ছিল, তাহা স্মরণ করিতে পারেন না। অথচ তিনি এই ছোট কুমারের সঙ্গে প্রায় সমানভাবেই—এমন কি দ্বিতীয় কুমারেব সঙ্গে অপেক্ষা অনেক বেশী সময় মিশিবার অবসর পাইয়াছেন! কারণ তৃতীয় কুমার ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, জবানবন্দীর সময় মিঃ র‍্যাঙ্কিনের স্মৃতিবেখা, পাতলা রকমের, এর বেশী আর কিছুই স্মরণে আনিতে পারে নাই। আমি এস্থলে সাক্ষীর একটি উক্তি স্মরণ করিতেছি। এই উক্তিতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ বলে যে, বাদীকে অনেকটা দ্বিতীয় কুমারেরই মত দেখায়, তাহা হইলে সে সত্য কথা বলিতেছে বলিয়াই মনে হয়।

যে, প্রকৃতপক্ষে মিঃ জি, সি, সেনই কুমারের জীবন বীমার এজেন্ট ছিলেন। বাদী পক্ষ উক্ত মেডিক্যাল রিপোর্টের মর্ম্ম অবগত হইবার পূর্ব্বেই এই সাক্ষী (মিঃ জি, সি, সেন) ঘটনা সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন আমি তাহার বর্ণনাটা একটু সংক্ষেপে করিলাম ; তবে কোন কিছুই বাদ দিলাম না।

ইন্সিওরেন্স ডাক্তারের নিকট

বেলা অপরাহ্ন ২টা ও ৩টার মধ্যে সাক্ষী কুমারকে ডাঃ কেডির নিকট লইয়া যান এবং জয়দেবপুরের 'মহারাজ কুমার' বলিয়া ডাঃ কেডির সহিত পরিচয় করিয়া দেন। ডাক্তার কেডি কুমারকে এই প্রকারে হাত চিৎ করিয়া কপালে স্পর্শ করিয়া সেলাম করেন। কুমার মাথা নাড়িয়া সেলাম গ্রহণ করেন। (মাথা কিঞ্চিৎ নীচু করিয়া)। ডাঃ কেডি কুমারের ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করেন। কুমারের ওজন লন, জোরে নিঃশ্বাস লইবার পর বুকের ছাতির মাপ গ্রহণ করেন ; আবার নিঃশ্বাস ত্যাগের পর আর একবার বুকের ছাতির মাপ লন। তারপর মূত্রের নমুনা লইয়া তাহা পরীক্ষা করেন এবং উচ্চতার মাপ লন। অবশেষে ডাক্তার তাঁহার আসনে উপবেশন করিয়া, ডাক্তারের রিপোর্টের ঐ নির্দ্দিষ্ট ফরমে অংশ লিখিতে আরম্ভ করেন। তারপর, কুমারের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস সংগ্রহের জন্য ডাক্তার কুমারকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন।

ডাক্তার ইংরেজীতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐ প্রশ্ন বাঙ্গালায় তরজমা হইলে পর কুমারকে তাহার উত্তর দিতে বলা হয়। কুমার বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর করেন ; এবং আমি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ডাক্তারকে বলিয়া দেই। রিপোর্ট লেখা হইবার পর মধ্যমকুমারকে ঐ রিপোর্টে প্রশ্নোত্তরের তলায় স্বাক্ষর করিতে বলা হয়। মধ্যম কুমারের গায়ের রঙ্গের মত রং, চক্ষু এবং চুল বিশিষ্ট অপর কাহাকেও ডাক্তারের নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল কিনা. সাক্ষীর তাহা স্মরণ নাই—

চক্ষুর রং বিশ্লেষণ

রিপোর্টের নির্দ্দিষ্ট স্থানে মধ্যমকুমার স্বাক্ষর করিলে পর, ডাক্তার আমাকে কুমারকে সনাক্ত করিবার উপযুক্ত কতকগুলি চিহ্ন নির্দ্দেশ দিতে বলেন। তদুত্তরে আমি বলি—'রং সাদা, চক্ষু ধূসর বর্ণ, চুল বাদামী রং'এর—সনাক্ত করিবার পক্ষে এই সকল লক্ষণ যথেষ্ট ; কারণ বাঙ্গালীর মধ্যে সচরাচর এরূপ দেখা যায় না।

"প্রঃ—কিরূপ ধরণের কটা ?"

"উঃ—তাহা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব না। বিড়ালের চক্ষুর মতও নয়, কারণ, তাহারও ইতরবিশেষ হয়। কোনও প্রকারের বিড়াল চক্ষুর সঙ্গেই কুমারের চক্ষুর তুলনা করা যায় না। মধ্যম কুমারের চোখ কালোও ছিল না, সাদাও ছিল না। অন্য কোনও জিনিষের সঙ্গে তুলনা করিলে হয় তো কিছু সাদা রংএর মত দেখাইতে পারে। কিন্তু তাহাকে 'একটু সাদা' বলা যায় না। তুলনার হিসাবে অন্য কোনও সামগ্রীর উল্লেখ না কবিলে, অথবা অন্য কিছুর সঙ্গে না দেখাইলে, একটু সাদা বলিলে কিছুই বুঝা যায় না। মধ্যম কুমারের চোখ লাল্‌চে রংএর ছিল না। কেহ কেহ হয়তো পিঙ্গলা বলিলেও বলিতে পারেন, কিন্তু লাল্‌চে নহে।"

সাক্ষীকে পুনরায় প্রশ্ন করা হইলে সাক্ষী বলেন,—

প্রঃ—আপনি বলিয়াছেন মধ্যম কুমারেব চোখের রং লাল্‌চে নয়—পিঙ্গলা। সেটা কি রং ?

উঃ—ঈষৎ নীলাভ।

আদালতকে লক্ষ্য করিয়া—নীলাভ বলিলেই পিঙ্গলা বুঝায়।

ইহা একটী প্রহসন মাত্র। শ্রীপুরের মামলায় এই সাক্ষী বলিয়াছিলেন,—"চোখের তারার চারিদিকে যে গোলাকার অংশ আছে, মধ্যমকুমারের চোখের সেই অংশ কালোও নহে, বিড়ালের চোখের মতও নহে; তবে একটু সাদার আভাযুক্ত। বিড়ালের চোখের ঐ অংশের নীল রংএর তুলনায় তাহা সাদা—সাক্ষী তাহাই মনে করেন। বাদী পক্ষের সাক্ষিগণের যাহারা মধ্যম কুমারের চক্ষুর রং পিঙ্গলা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের কেহ কেহ 'সাদার আভাযুক্ত' কথাও বলিয়াছেন; তাহাদের একজন সাক্ষী মধ্যম কুমারের চক্ষুকে 'নারিকেল চক্ষু' বলিয়াছেন (বাদী পক্ষের ২৫০ নং সাক্ষী) তাহাতে, নারিকেলের রংএর মত—এই কথাই তাঁহার বক্তব্য বলিয়া মনে হয়।

রায় সাহেব বলিয়াছেন,—তিনি ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে বাদীর চক্ষুর বর্ণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি তখন বাদীর চোখে বাদামী রং দেখিয়াছিলেন, তারপর এই সন্ন্যাসী পুনরায় জয়দেবপুরে যান এবং আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন। ভগ্নী তাঁহাকে কুমার বলিয়া গ্রহণ করেন। সাক্ষী তাঁহাকে (বিবাদীর ভগ্নীকে) সচ্চরিত্রা বলিয়া জানিতেন।

আমার মত এই যে, বাদীর চোখের রংএর ন্যায় মধ্যম কুমারের চোখের

ফটোগ্রাফের নকল

একজিবিট—এ (২) ও এক্স (৩২)

৩। ধূতি পরা এবং ব্যাঘ্রসহ গৃহীত ফটো—একজিবিট (৫০)

নকল—

৮৯ (বাষ্ট—বক্ষ পর্য্যন্ত)—মুদ্রিত, লাহোরের পি /৬নং।

৪। পাঞ্জাবীসার্ট গায়ে বাষ্ট ফটো—একজিবিট (৯০) পি /৭নং। লাহোরে সংগৃহীত।

৫। থ্রিকোয়ার্টার ফ্রক্ কোট পরিহিত (একজিবিট নং ১৮)।

৬। থ্রি কোয়ার্টার ফ্রক্ কোট পরিহিত (একজিবিট নং ১৫)।

৭। মুখুটির সহিত ফটো—দণ্ডায়মান।

৮। বিবাহের পূর্ব্বের ফটো।

ফটো গুলির মধ্যে ২নং ফটো মেজকুমারের দার্জ্জিলিং যাইবার সময়ের অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে শিকারের পর ধুতিপরিহিত অবস্থায় বাঘ সহ এই ফটো গৃহীত হইয়াছে। ১৯০২ সালের বিবাহের পূর্ব্বে যে ফটো গৃহীত হইয়াছে, উহাকে বিবাহকালীন ফটো বলিয়া ধরা যাইতে পারে, ইহা অনেক আগেকার ফটো। মেজকুমারের ১৪ বৎসর বয়সে মুখুটির সহিত যে ফটো গৃহীত হইয়াছে, উহাই অতি আগেকার ফটো, বাণী এই ফটোখানি চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু মিঃ র‍্যাঙ্কিন ও শরদিন্দু মুখুয্যে ও উহাকে চিনিতে পারিলেন।

নানা বেশে বাদীর ফটো

এই ফটোর কোনটা কোন সময়ে গৃহীত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যায় না. তবে ক্রমে ক্রমে পোষাকের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লুঙ্গি ছাড়িয়া বাঙ্গালীর মত ধুতি ধরিয়াছেন, মেজকুমারের পোষাক পরিহিত ফটো সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৯২৪ সালে বাদী ঢাকা ছাড়িয়া কলিকাতা যাইলে তখন তথায় উক্ত ফটো গৃহীত হয়।

১। কৌপীন পরিহিত বাদী—একজিবিট নং এ (১৯)—এক্স্ (২৮৩)।

উহার কপি :—

এ (৫২)—একস (৩১৫)—'বি' কমিশনার গাঙ্গুলী।

২। গোটিলা ফটো—একজিবিট (১২) একস (৩৭)।

বামদিকের কোণটি অপরটির তুলনায় অধিক উর্দ্ধে উঠিবে। সংক্ষেপে বলা যায়, ছবি দেখিয়া মুখের গড়ন বিচারের ইহাই ফলাফল।

এই মামলায় এই বিষয়টি লইয়া যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কুমারের ইনসেট ফটোতে দেখা যায় যে, বামচক্ষুর বাহির দিকের কোণা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদিকে, অথচ বাদীর ঠিক সেই চক্ষুর সেই কোণ সোজা বা সামান্য নীচু দিকে হেলান। বিবাদী পক্ষ ইহাকেও একটি পার্থক্য বলিয়া ধরেন, এবং মিঃ চৌধুরী বাদীপক্ষের ৫৪৪নং সাক্ষী মিঃ গাঙ্গুলীকে বলেন যে, কুমারের চোখ টেরা ছিল। ফটো গ্রহণের সময় কুমার কি অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য মিঃ চৌধুরী ইন্‌সেট্ ফটো হইতে বর্দ্ধিতাকারে প্রস্তুত একটি আবক্ষমূর্ত্তি সাক্ষীর নিকট উপস্থিত করেন। মিঃ গাঙ্গুলী স্বীকার করেন যে, বাম চক্ষুর বাহির কোণ উর্দ্ধদিকে আছে এবং মিঃ পার্শি ব্রাউন ইহাকে একটি পার্থক্য ধরিয়া লইয়া বলেন যে, কুমারের চোখ টেরা ছিল। পূর্ণাঙ্গের ইনসেট ফটোতে দেখা যায় যে, কুমার তাঁহার ডানদিকে একটি টেবিলে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন; কাজেই তাঁহার বামচক্ষুর বাহির কোণ উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। মিঃ চৌধুরী কেবল বামচক্ষুর উর্দ্ধগমনের কথাই বলিয়াছেন, ডান চোখের কথা কিছু উল্লেখ করেন নাই, কাজেই এই ফলাফলের কথা ধরা পড়িয়াছে এবং উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মিঃ পার্শি ব্রাউন একথা স্বীকার করিয়াছেন যে (১৫এ) নং ফটোতে এই বৈশিষ্ট্য নাই। বিবাদী পক্ষের ৫৬নং সাক্ষী মিঃ মুসলী হোয়াইট মিঃ পার্শি ব্রাউনের পরে সাক্ষ্য দিলেও এই পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন নাই।

বাদীপক্ষ হইতে মিঃ চাটার্জ্জী 'সখের শিল্পী' কর্ণেল পুলীর সাক্ষ্য হইতে এই কথা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, কুমারের ইনসেট ফটো এবং বাদীর উপবিষ্ট অবস্থায় গৃহীত ফটো—উভয় ফটোতেই দেখা যায়, কাণ চোখের লেভেলের নীচে; কাজেই ইহা একটি সাদৃশ্যের চিহ্ন; কারণ সচরাচর ইহা দৃষ্ট হয় না। লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল পুলী বলিয়াছেন, উহা বিরল নহে, মুখ রাখিবার ভঙ্গীতেই উহা হইয়াছে, ইহা কোন বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা সাদৃশ্য প্রমাণের কোন চিহ্ন নহে।

(৫) মাংসপেশী, অথবা সিল্কের কাপড় অথবা জটা, অথবা চুলের কুঞ্চন—এইভাবই আলোছায়ায় প্রতিফলিত হয়, ইহাদ্বারা ঘনত্বই বুঝা যায়। মিঃ পার্শি ব্রাউন (একজি ৪৯) ও (একজি ৪৮) নং ফটো পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, বাদীর চুল সোজা এবং কুমারের চুল ঢেউ খেলান। কার্য্যতঃ আমি দেখি যে বাদীর চুল ঢেউ খেলান।

স্যার উইলিয়ম মরিস এবং এইরূপ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির ছবি আঁকিয়াছেন। তিনি এক একখানি প্রতিকৃতি আঁকিবার জন্য ২৫০০৲ এবং পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি আঁকিবার জন্য ৭ হাজার টাকা করিয়া পারিশ্রমিক নিয়া থাকেন। তাঁহার জমিদারীর আয়ও বার্ষিক ৪০ হাজার হইতে ৬০ হাজার টাকার মধ্যে হইবে। তিনি যে স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মিঃ পার্শি ব্রাউন সেই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন; এবং মিঃ গাঙ্গুলীও দুই বৎসরের জন্য ঐ স্কুলের স্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন। সাক্ষী ফটোগ্রাফার নহেন, কিন্তু তাঁহারই কথায় বলা যায় যে, তিনি ফটোগ্রাফী লইয়াও নাড়াচাড়া করেন।

তিনি বলেন যে, ১৯৩৪ সালের ৩০শে মে তাঁহার সাক্ষ্য গৃহীত হয়। মনোহন রায় নামে বাদীর একজন লোক তাঁহার হাতে আনিয়া দুইখানি ফটো দেয়। এবং উহার সাদৃশ্য সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করে। ইহার পর বাদী আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন এবং বলেন যে, আদালতে তাঁহার সাদৃশ্য প্রমাণের চেষ্টা চলিয়াছে। সাক্ষী দুইখানি ফটো তুলনা করিয়া দেখিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হন। তাঁহাকে কোনরূপ ফী দেওয়া হয় নাই, কেবল যাতায়াতের খরচ দেওয়া হয়। সাক্ষী বলেন যে, বাদীর অবস্থা স্বচ্ছল নয়।

মিঃ গাঙ্গুলীর মতামতের যাহাই মূল্য থাকুক না কেন, তাঁহার সততা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তিনি যখন আসিয়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন তখন বাস্তবিকই আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজস্ব মত এবং তিনি এমন ভাব কখনও দেখান নাই যে, তাঁহার মতামতই মানিয়া লইতে হইবে; যদিও মিঃ চৌধুরী তাঁহার উপর এই দোষারোপ করিয়াছেন।

সাক্ষী তুলনা করিয়াছেন:—মিঃ উন্টারটন ১৯৩৪ সালে বাদীর যে দুইখানা ফটো তোলেন, তাহার ডি এবং ই ফটো।

ধুতি পরিহিত, উপবিষ্ট অবস্থায় তোলা ফটো হইতে 'এনলার্জ' করা বাদীর আবক্ষ ফটো। যে এটো তোলা হয় তাহা ৩নং একজিবিট।

৩নং একজিবিট হইতে তোলা একখানি ফটো।

এক কথায় তিনি বাদীর বর্ত্তমান ফটো, অনুমান ১৯২৫ সালে কলিকাতায় যে ফটো তোলা হয় তাহা, এবং কুমারের ২৪ বৎসর বয়সের (অথবা কিছু কম হইবে) ইন্‌সেট করা ফটো তুলনা করিয়াছেন; ১৯২৫ সালে বাদীরও এই বয়স ছিল বলিয়া তিনি বলিয়াছেন।

১৮ বৎসর প্রিন্সিপাল ছিলেন। ভারতীয় কলা বিষয়ে তিনি অনেক বই লিখিয়াছেন, চারু-শিল্প প্রদর্শনীর তিনি জজ ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য কোন সাধারণ স্থানে তাহার তৈরী কোন মূর্ত্তি নাই।

মিঃ মস্‌লি হোয়াইট কলিকাতায় মেসার্স বোর্ণ এণ্ড সেফার্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং পার্টনার—লণ্ডনে ফটোগ্রাফি শিখিয়াছেন। তিনি একজন ব্যবসাদার ফটোগ্রাফার।

মিঃ পার্শি ব্রাউন দ্বিতীয় কুমারের ইনসেট ফটো (মিঃ গাঙ্গুলীর 'এ' ফটো) এবং এনলার্জ্জ করা আবক্ষফটো, বাদীর ১৯২৫ সালের তোলা ফটো এবং সর্ব্বশেষে বাদীর যে ফটো তোলা হয় তাহা তুলনা করিয়াছেন অর্থাৎ মিঃ গাঙ্গুলী যে তিনখানা ফটো তুলনা করিয়াছেন। তিনিও তাহাই তুলনা করিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় কুমারের ইনসেট করা যে ফটো আবক্ষ এনলার্জ্জ করা হইয়াছে এবং ১৯২৫ সালে বাদীর যে ফটো আবক্ষ এনলার্জ্জ করা তৎসম্পর্কে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই দুইখানি ফটোর উপরেই মিঃ গাঙ্গুলীকে জেরা করা হইয়াছে। সুতরাং এই দুইজন বিশেষজ্ঞের একই মাল মসলা ছিল,—একথা বলা যাইতে পারে।

মিঃ পার্শি ব্রাউন ও মিঃ মসলি হোয়াইট বাদী ও কুমারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে পার্থক্য দেখাইতেছেন তাহার তালিকা দিয়াছেন যে, কুমারের ইন্‌সেট ফটোতে একজন মার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন লোকের চেহারা দেখা যায়। কিন্তু বাদীর ফটোতে তাহাকে অমার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন লোকের চেহারা বলিয়া মনে হয়। তিনি বাদীর নিম্নের ওষ্ঠের দক্ষিণ দিকে একটু বাঁক দেখিয়াছেন। কিন্তু কুমারের তাহা নাই বলিয়াছেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বিশেষজ্ঞগণ বাদীর তিনখানা ফটো এবং কুমারের একখানা ফটোর উপর তাঁহাদের মতামত গঠন করিয়াছেন। কুমারের ফটোখানা ইনসেট করা ফটো। এই ফটোখানা তাহার শেষ ফটো এবং খুব ভাল ফটো। ইহা এত ভাল হইয়াছে যে, তাঁহার পূর্ব্বের ফ্রক কোট পরা দুইখানি ফটো দেখিয়া মনে হয় না যে দুইখানি একই ব্যক্তির ফটো।

উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে, আমি ফটোগুলি দেখিয়াছি, তারপর বিশেষজ্ঞদের অভিমত বিবেচনা করিয়াছি। আমি বিশেষজ্ঞ মিঃ ব্রাউনের সহিত একমত হইয়া বলিতেছি যে,ফটো ম্যাপ নহে। সমস্ত ফটো একই স্কেলে হয় না। যে দুইখানা এনলার্জ্জ করা ফটো (একজিবিট ৪৯ এবং ৪৮) সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক একই স্কেলে তোলা হয় নাই ; ৪৮নং একজিবিটে বাদী সোজা ক্যামেরার দিকে চাহিয়াছেন ; ইন্‌সেট ফটোতে মুখ

সেইভাবে নাই। মিঃ উইণ্টারটনের এই শক্তি সম্পর্কে কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। মিঃ পার্শি ব্রাউন বলিয়াছেন যে, ৪৮নং একজিবিটে কুমার অপারেটরেব দিকে চাহিয়াছিলেন। চোখের দৃষ্টি দিয়া যাহা মনে হয় তদনুসারেই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। অবশ্য অভিজ্ঞ লোকের চোখে যাহা দেখা যায়—দেখাইয়া দিলে অনভিজ্ঞ লোকেও তাহা দেখিতে পারে।

ঠোঁটের বৈশিষ্ট্য কথা

পূর্ব্বোক্ত বিষয় ও অবস্থাসমূহ বিবেচনা করিয়া আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি ; যথা—

কুমারের এবং বাদীর ঠোঁট—এক্স (৫৯) নং একজিবিটে কুমারের ফটোর মধ্যে পার্শি ব্রাউন এ চিহ্ন দেখিয়াছেন ; কিন্তু বাদীরও কুমারের নীচের ঠোঁটে তিনি ইহা দেখিতে পান নাই এক্স (৪৯) নং একজিবিটে কুমারের ফটোতে পার্শি ব্রাউন ইহা যেরূপ দেখেন, এক্স (৪৮) নং একজিবিটে বাদীর ফটোগ্রাফে তিনি ইহা দেখিতে পান না। মিঃ গাঙ্গুলী দেখাইয়া দিবার পর মাজল হোয়াইট। বাদীর ফটোতে ইহা দেখিয়াছিলেন। যে কোনও সাধারণ লোককে দেখাইলে তাহা দেখিতে পাইবে। রায় সাহেব (বিবাদী পক্ষের ৩১০নং সাক্ষী), এ (১৫) নং একজিবিটে কুমারের ফটোতে নীচের ঠোঁটে ইহা দেখিতে পান না। তিনি তিনি বলেন,—ফটোগ্রাফের দোষে ঐরূপ হইয়াছে। বাদী ফটোতে ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। কুমারের ফটোতে ইহা বর্ত্তমান দেখিতে পাই। ফটোগ্রাফে ঐ চিহ্ন যে দৈবক্রমে আসিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। মিঃ ব্রাউন সমেত তিন জন বিশেষ 'ইনসে' ফটোতেই যে কেবল এই চিহ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা নহে ; পরন্তু মিঃ উইণ্টারটন এ (১) নং একজিবিটের ফটোতেও ইহা পাইয়াছেন। ১৯২৫ সালে বাদীর যে ফটো গ্রহণ করা হয় (এক্স ৪৯) ঐ ফটোতে মুখের বাঁ দিকে কালো ছায়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে নীচের ঠোঁটের বাঁ দিক অস্পষ্ট থাকায়, ঠোঁঠের ডান দিকের কোঁকড়ান ভাঁজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ঠোঁটের উক্ত প্রকারের ভঙ্গী হইতে মিষ্টার চৌধুরী, মিষ্টার গাঙ্গুলীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, ঠোঁট যেন ঝুলিতেছে ; এমনভাবে ঝুলিতেছে যে, ছায়ার অন্তরালস্থিত বাঁ দিকের অংশ যেন একেবারেই নাই।' ইনসেট ফটোর ছবিতে মুখের বাঁ পাশে আলো পড়িয়াছে ; সে দিকটা আলোতে পূর্ণ ; কিন্তু ডান দিক কালো ছায়াতে আচ্ছন্ন। এই ফটো দেখিয়া সে সময়

না হইয়া বরং উহা যে সম্পূর্ণ মিল সপ্রমাণ করিতেছে—এ বিষয়ে আমি মিঃ গাঙ্গুলী এবং মিঃ উইণ্টারটনের সহিত একমত।

কান দুইটি বিশেষ বৈশিষ্টব্যঞ্জক। মিঃ গাঙ্গুলী বলেন, তাহার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি সে প্রকারের কান কখনও দেখেন নাই। কান দুইটী অপেক্ষাকৃত বড়। কর্ণলতা মুখমণ্ডল স্পর্শ করে নাই অর্থাৎ কানের লতি মুখ-ঘেষা না—পরন্তু ঝুলান। অর্থাৎ গালের ও কানের লতির মধ্যে ফাঁক আছে। তাহা ছাড়া কানের সম্মুখ ভাগের বহিরাংশে যে বলয়াকৃতি চক্র আছে—যাহাকে কুণ্ডলী বলে,—তাহা বক্রভাবে কানের লতি পর্য্যন্ত কুণ্ডলাকৃতিতে না পৌঁছাইয়া, লতির সহিত সংযুক্ত হইবার সময় একটি কোণ গঠন করিয়াছে সে কোণ একটী চোখাল কোণ। কাণের লতি চিবুক স্পর্শ করে নাই। কানের লতি দুইটি ভারি দেখায়। আমি বাদীর কানের লতিও ভারি দেখিলাম। ১নং এবং ১ (২) নং একজিবিটের ফটোতে যে প্রকারের কানের লতি দেখিয়াছি, বাদীর কানের লতিও দেখিতে সেইরূপ। বাদীকে আমার খুব কাছে দাঁড় করাইয়া, বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের আইন ব্যবসায়ী দিগের সাক্ষাতে আমি এই বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। (২৭.৪, ৩৬ তারিখের কাগজপত্র দ্রষ্টব্য)। কানের লতির উপরের অংশও ভারি; কুণ্ডলার মধ্যস্থল সংলগ্ন অংশের নিকট যাইয়া ইহা একটী কোণ গঠন করিয়াছে। কানের মধ্যভাগের এই কোণ অল্প বিস্তর প্রত্যেকেরই আছে। বিবাদী পক্ষের উকীল আমাকে তাহা দেখিবার জন্য অনুরোধ করেন। এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় নাই; এবং ফটোর প্রসঙ্গে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় না। কাণের বহিরাংশের গঠন প্রণালীর অতি অল্প পরিমাণই ফটোর ঐ অংশের সহিত তুলনা করা যায়; কেননা, কুণ্ডলীর ধার ফটোতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় না, কিন্তু কাণের বহিরাংশ সকল ফটোতেই স্পষ্ট হয়।

ইহা স্বীকৃত যে, উভয়েরই কাণের লতি মুখমণ্ডল স্পর্শ করে নাই; পক্ষান্তরে লতি দুইটী ঝুলান এবং মুখ হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু তৎসত্বেও বলা হইয়াছে যে, বাদীর কানের লতি বাড়ান এবং গণ্ডদেশ হইতে কিঞ্চিৎ সরান। এতদ্ভিন্ন, কুমারেরকানের সম্মুখের বহির্ভাগে কুণ্ডলী ছিল না।

১৯৩৪ সালে বাদীর যে ফটো লওয়া হয়, সেই ফটোতে এবং কুমারের ইনসেট ফটোর মধ্যে বাঁ দিকের কানে আলোর ভাগ বেশী পড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত দুইটীই একই প্রকারের কুণ্ডলীর উপরে এবং নীচে কোণাকার এবং কুণ্ডলী আঁকাইয়া বাঁকাইয়া নীচের দিকে নামিয়াছে। আমি দুইজনের কানের

ওষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্তি

মিঃ পার্শী ব্রাউন কুমারের ওষ্ঠ মোচড়ান দেখিয়াছেন; কিন্তু বাদীর তাহা দেখেন নাই। আবার মিঃ মার্শেল হোয়াইট দেখিয়াছেন ঠিক ইহার বিপরীত।

উভয়ের নিম্নওষ্ঠের মধ্যে তিনি এই একমাত্র পার্থক্য দেখিতে পান যে, কুমারের নিম্নওষ্ঠের মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ পুরু। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মেজরাণী আসিয়া মিঃ ব্রাউনের সমক্ষেই সাক্ষ্য দিলেন যে, কুমারের ওষ্ঠ পাতলা ছিল এবং বহু সাক্ষী বলিয়াছে যে, বাদীর ওষ্ঠ অপেক্ষাকৃত পুরু; কার্য্যতঃ উভয়ের ওষ্ঠ একই প্রকার।

চোখের ভ্রূ

মেজরাণী বলিলেন, ধনুকের মত; আবার মিঃ পার্শী ব্রাউন বলিলেন সোজা টানা। তাহাকে সোজাসুজি এ (১৫) নং ফটো দেখান হইলে তিনি স্বীকার করেন যে, ফণীবাবু কুমারের যে ফটো আদালতে দাখিল করিয়াছেন তাহাতে কুমারের চোখের ভ্রূ ঠিক উঠিয়াছে।

চক্ষু সম্পর্কে যুক্তি

চক্ষু সম্বন্ধে মিঃ মার্শেল হোয়াইট বলেন যে, কুমারের ইনসেট ফটোতে চোখ দুইটি অপেক্ষাকৃত বড় ও উজ্জ্বল। এই ফটোতে কুমারের যেমন চোখ দেখা যায়, তেমন আর কোন ফটোতে দেখা যায় না; এবং 'বাঘ' ফটোতে কুমারের চোখ সর্ব্বাপেক্ষা কদর্য্য দেখা যায়। উহাতে চোখ দুইটি ছোট এবং কোটরগত দেখা যায়। তাহার কারণ খুব সম্ভব ঐ ফটো খোলা যায়গায় গৃহীত হইয়াছিল এবং তাহাতেই চক্ষু দুইটি বিকৃত হইয়াছে। ফটোগ্রাফে চক্ষু এমন উঠে। আমি বলিয়াছি যে, ইনসেট ফটোতে যেমন চক্ষু দুইটি পরিষ্কার উঠিয়াছে, এমন আর কোনটিতে উঠে নাই। অন্যান্য ফটোতে চক্ষু বিভিন্ন রকম উঠিয়াছে।

বাদীর চোখের উপর পাতার স্থূলতা সম্বন্ধে মিঃ ব্রাউন স্বীকার করিয়াছেন যে, বয়সের দরুণ উহা হইতে পারে। চোখের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে বলা যায় যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আর চোখের উজ্জ্বলতা থাকে না। চোখের পাতার স্থূলতা এবং উহার নীচে যে কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়াছে, তাহাতে কিছু পার্থক্য প্রমাণ হয় না। বয়স হইয়াছে, তা ছাড়া স্থূলকায়ও হইয়াছে, এই অবস্থায় চোখের যে অবস্থা হওয়া উচিত সে সকল কথা বিবেচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, চক্ষু সম্বন্ধে কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ—রায়ের পরে গৃহীত (১৯৩৬)

Aparajita Press

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ—১৯৩০ সনে গৃহীত ফটো

এবং আরও বহু লোক আছে। ভাওয়ালে বুকের লোম কামান একটা কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

যোগেশ (বাদীর ৮৯২নং সাক্ষী) জয়দেবপুর স্কুলে ছিল। সে ফণীবাবুর বাড়ীতে প্রায় থাকিত। সে বলিয়াছে যে, রসিক রায়, ফণীবাবু এবং দ্বিতীয় কুমার, তাঁহাদের বুক কামাইতেন। ফণীবাবুর সম্বন্ধে সাক্ষী বলে যে, তিনি কুস্তি করিতেন বলিয়াই বুক কামাইতেন। ঐ অঞ্চলবাসী উকিল শান্তিবাবুও তাঁহার বুকের লোম কাটিয়া ফেলেন। বিল্লু এমন অনেক লোকের নাম বলিয়াছে যাহারা বুকের লোম কামাইত। সে বলিয়াছে যে ফণীবাবু তাঁহার হাতের লোমও চাঁচিয়া ফেলেন। ফণীবাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যায়াম করিবার জন্য তিনি বুকের লোম চাঁচিয়া ফেলিতেন। সাক্ষ্য প্রমাণে আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, এইরূপ অভ্যাস থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমার বিবেচনায় কুমারের বক্ষ লোমাবৃত ছিল কি না তাহা স্বীকার করার কোন প্রয়োজন ছিল না, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য যদি না দেওয়ান হইত তবে ইহা লইয়া এত বিশদ আলোচনা করারও দরকার হইত না। অবশেষে আমি বলি যে, কুমারের বক্ষ লোমাবৃত ছিল।

মুখমণ্ডল :—ইহা বলা হইয়াছে যে, মেজকুমারের মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, কিন্তু বাদীর মুখ গোলাকৃতি। ১৯২১ সাল হইতে বাদীর যে সকল ফটো গৃহীত হইয়াছে। ঐ গুলি দেখিলে মনে হয় যে, বাদী ক্রমে ক্রমে মোটা হইতেছেন, তাঁহার শরীর যতই ফুলিতেছিল, ততই মুখ লম্বা কম দেখাইতেছিল। যদি অনেক আগেকার ফটো (এক্জিবিট ৫৭নং) দেখা যায় এবং খোলা গায়ের ফটো (একজিবিট ৪০নং, অনেক পরে গৃহীত) হইতে দেখা যায়; তাহার মুখ লম্বা। আর মেজরাণী এবং মিঃ পার্শী ব্রাউন কথাগুলির মধ্যে যে পার্থক্য দেখিয়াছেন, এবং যে সকল সাক্ষী তাঁহাদের কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন. আমি তাহাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে আর আলোচনা করিতে চাই না, মেজরাণী ও মিঃ পার্শী ব্রাউনের সাক্ষ্যের মধ্যে অনেক স্থান পরস্পর বিরোধী হইয়াছে।

পদদ্বয়—কুমার ও বাদীর পায়ের কোন তুলনা চলে না, কারণ এমন কোন ফটো নাই, যে ফটোতে কুমার খালি পায়ে আছেন। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাদী ৬নং জুতা ব্যবহার করেন, বাদী যে জুতা পায় দিয়া কোর্টে উপস্থিত হইয়াছিলেন একজন চীনা জুতা প্রস্তুতকারক উহার মাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছে। এই লোকটির সাক্ষ্য সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে নাই। কুমারের জুতাও ৬ নম্বর ছিল বলিয়া বলা হইয়াছে। ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত বলিয়াছেন যে, বাদীর জুতার ভিতরের দিকটা বাঁকা। বাদীর ফটো

প্রঃ—আমি আপনাকে বলিতেছি যে, আপনি উপদংশ জনিত চিহ্ন বলিয়া যেসব চিহ্ন দেখাইয়াছেন তাহা আদৌ উপদংশজনিত চিহ্ন নহে ?"

বাদীর উপদংশ থাকা দূরের কথা, উপদংশ সম্পর্কে তাঁহার কোন জ্ঞানই নাই—এই সমস্ত বাদীকে জেরা করা হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যখন তাঁহার জবানবন্দীতে উপদংশজনিত চিহ্ন অথবা টিকার চিহ্ন অথবা জিহ্বার নীচের থলেরমত চিহ্ন ভিন্ন অন্যান্য সকল চিহ্নের কথা উল্লেখ করেন, তখনও তাঁহাকে একই রকমের জেরা করা হয়।

ইহা ১৯৩৪ সালের জুন মাসের কথা। বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই ছিল যে বাদীর শরীরের কোন চিহ্নই কুমারের শরীরে ছিল না। ৪ঠা মে অথবা তাহার কাছাকাছি কোন সময়ে ঐ সব চিহ্ন আবিষ্কার হয় এবং মিথ্যা করিয়া কুমারের শরীরে ঐসব চিহ্ন আরোপ করা হইয়াছে। এক কথায় ভগ্নী, বাদীর শরীরের ঐসব চিহ্ন দেখিয়াছেন এবং কুমারের শরীরের তাহা আরোপ করেন। 'কোন চিহ্ন সৃষ্টি করা হইয়াছে' বিবাদীপক্ষের তাহা মামলার বিষয় ছিল না আমি এখন চিহ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিব।

বাম পায়ের বাহির দিকের গোড়ালীর উপরকার অসমান ক্ষত চিহ্ন—১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বাদী আদালতে এই চিহ্ন দেখান এবং বলেন যে, গাড়ীর চাকা পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় এই চিহ্ন হইয়াছে।

এই চিহ্ন মিথ্যা করিয়া দ্বিতীয় কুমারের শরীরে আরোপ করা হইয়াছে, বলিয়া বাদীকে জেরা করা হইয়াছে। এবং যে সব সাক্ষী এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে অথবা ১৯০৪ সালে ছোট কুমারের বিবাহের সময় দ্বিতীয় কুমারকে লাঠিতে ভর করিয়া খোঁড়াইয়া হাটিতে দেখা গিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, জেরাতে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বাদী বলিয়াছেন যে, তৃতীয় কুমারের বিবাহের ৬।৭ দিন পূর্ব্বে একখানি ফিটন গাড়ী তাঁহার বাঁ পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং বিবাহের দিন তিনি লাঠিতে ভর করিয়া ঘুরাফিরা করিতেছিলেন; জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখেন নাই ; কিন্তু তিনি জখম দেখিয়া ছিলেন। ঐ ব রারিয়ার ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ডাক্তার ও নিশি ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করেন। ঐ ঘা শুকাইতে কতদিন লাগিয়াছিল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তবে কয়েকদিন লাগিয়াছিল, এইরূপ ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন। তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছেন ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেরা করা হইয়াছে। ইহা ইনস্যুরেন্স ডাক্তারের রিপোর্ট আসিবার পূর্ব্বের কথা।

ইহার পূর্ব্বে বাদী এইরূপ প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত করেন যে, বিবাদী

স্কটল্যাণ্ড হইতে অথবা স্থানীয় ব্র্যাঞ্চ আপিস হইতে তলব করা হউক। (ডি সংখ্যক ফাইলের ২৩৪০ দলিল)

২৯।১১।৩৪—তারিখে কলিকাতাস্থ ব্র্যাঞ্চ আপিসের ম্যানেজার লেখেন যে, মেডিকেল রিপোর্ট তাঁহাদের এডিনবরার হেড আপিসে আছে।

১৫।১২।৩৩—তারিখে মূল প্রস্তাবপত্র (প্রপোজ্যাল ফরম) সমেত মেডিকেল রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছে।

বাদীর পায়ের ক্ষত চিহ্ন

এই দলিলে ইনসিওরেন্স প্রার্থী কুমারের ব্যক্তিগত বিষয় ও শারীরিক নানা খুঁটি-নাটি বিষয়ে উল্লেখ আছে। ঐ সকল খুটিনাটি বিষয়ের মধ্যে ডাঃ আর্ণল্ড কেডির স্বাক্ষরযুক্ত একখানি মুদ্রিত ফরমের ৫নং ফরমে সনাক্ত করিবার অর্থাৎ চিনিবার উপযোগী চিহ্নসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটী কথা দৃষ্ট হয়—

"বাঁ পায়ের গোড়ালীর উপর দিকে কতকগুলি অসমান ক্ষত চিহ্ন আছে।"

বিবাদীপক্ষে, ডাঃ ডেন্‌হাম হোয়াইট সাক্ষ্যদানকালে বলেন,—যে ক্ষতচিহ্ন সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইতেছে, সেই ক্ষতচিহ্ন বর্ণনা করা হইতেছে, সেই ক্ষতচিহ্ন বর্ণনা করিবার সময় তিনি তাহাকে 'বাঁ পায়ের গোড়ালীর কিঞ্চিৎ উপরে অসমান ক্ষতচিহ্ন' বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি তাঁহার নোটে লিখিয়াছিলেন,—"বাঁ পায়ের গোড়ালীর কিছু উপরে অসমান ক্ষতচিহ্ন। ঐ ক্ষতচিহ্ন উপরের দিকে ১॥ সেন্টীমিটার চওড়া, নীচের দিকে উহা ৯ মিলিমিটার চওড়া উহা ২ সেন্টীমিটার উঁচু। গোড়ালীর সর্ব্বনিম্ন বিন্দু পর্য্যন্ত উহা ৬ সেণ্টমিটার। বিবাদী পক্ষের সুবিধার জন্য মেজর টমাস যে নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ ক্ষতচিহ্নের রূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের।"

মিঃ ডেনহাম হোয়াইট জবানবন্দীতে বলিয়াছেন,—আমাকে যদি ঐ ক্ষতচিহ্ন বর্ণনা করিতে বলা হয়, আমি আদালতে যেরূপ বলিতেছি ঐ প্রকারেই সে ক্ষতের বর্ণনা করিব। একখানি প্রয়োজনীয় ছবিতে ঐ সব চিহ্নের নির্দ্দেশ আছে। ঐ চিহ্নে সর্ব্বকার চিহ্ন এবং তাহাদের অবস্থান বেশ স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (এক্‌জিবিট এ ৪০ এবং এ ৪০ এ দ্রষ্টব্য)।

ইনসিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্টে উল্লিখিত বর্ণনা—বাঁ পায়ের গোড়ালীর কিছু উপরে অসমান ক্ষতচিহ্ন বাদীর দেহস্থিত ঐ ক্ষতচিহ্নের সহিত বেশ মিলিয়া যায়। বাদীর এবং কুমারের মিলের এই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, উহা শুকনা ক্ষতের চিহ্ন, সাধারণ কোনও দাগ নহে। ডাঃ ডেনহাম তাঁহার নোটে সাধারণ দাগের এবং

জানুয়ারী ছোট কুমারের বিবাহ হইয়াছে (ছোটরাণীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) কোন চিকিৎসকই উহাকে অসমান দাগ বলিবেন না।

আমি বাদীর বাম পায়ের গোঁড়ালীর উপর একটা অসমান ক্ষত চিহ্নের দাগ দেখিতেছি। ইনসিওবেন্স ডাক্তারও এই দাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

একজন চিকিৎসক বলিয়াছেন, বাদীর পায়ের গোঁড়ালির পেছনের দিকেও একটা দাগ আছে। বাদী এই দাগ সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। চিকিৎসকগণ এই দাগের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করেন না।

বাদীর চর্ম্ম কেমন

বাদীর উভয় পায়ের গোড়ালির উপর চামড়ার একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

বিবাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী লেঃ কর্ণেল পুলি একজন চিকিৎসক নহেন। তিনি কোর্টে বাদীর পায়েব চামড়া খস্‌খসে বলিয়া দেখিয়াছেন। লেঃ কর্ণেল ম্যাকগিলক্রাইষ্ট একজন অবসরপ্রাপ্ত আই, এম এস, তিনি সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; তিনি বাদীর চামড়া সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, বাদীর চামড়া খসখসে এবং চিক্কণ—উহাকে মাছের চামড়া বলা যাইতে পারে, উহা বংশগত বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের সাক্ষী কর্ণেল ডানহ্যাম হোয়াইটও উহা দেখিয়াছেন, তিনি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, বাদীর পায়ের গোড়ালির উপর যে চামড়া আছে, উহা কতকটা অদ্ভূত ধরণের, উহা কি জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, উহা চামড়াব উপর একপ্রকার দাগ। উহাব যে নামই দেওয়া হউক না, আমি মনে করি কর্ণেল ডানহ্যাম হোয়াইট অনুমানের উপরই উহা বলিয়াছেন। বাদী বলিয়াছেন যে, ছোট কুমার, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, কৃপাময়ী দেবী, বুদ্ধ, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কন্যা মণি এবং তাঁহার এই প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে। যাহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের পায়ে এইপ্রকার দাগ আছে। বাদী পক্ষ হইতে তাঁহাকে এই সম্পর্কে জেরা করা হয় নাই। সেই পক্ষের একজন সাক্ষীও স্বীকার করিয়াছে এবং অন্য সাক্ষিগণও উহা অস্বীকার করেন নাই। একজন সাক্ষী মামলার পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু পরে অস্বীকার করিয়াছেন। আমি এই দুইজন সম্পর্কে বলিব মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কমিশনে ফণীবাবুর ভগ্নীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, তিনি উহা অস্বীকাব করিয়াছেন, কিন্তু বিচারের সময় ফণীবাবুও তাহা অস্বীকার করেন নাই।

দ্বিতীয় কুমারের খসখসে পা সম্পর্কে বহু সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছেন। বিশেষতঃ

"আমি আপনাকে বলিতেছি যে, আপনারা তিনজন ডাক্তারে যাহা দেখিয়া একমত হইয়াছেন তাহাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

উঃ—না। সামান্য মতভেদ ছিল এবং এইজন্য আমরা মিলিত হইতে চাহিয়াছিলাম।

প্রঃ—আমি আপনাকে বলিতেছি যে, যাহা বলিয়া দেওয়া হইতেছিল তৎ-সম্পর্কে আপনি কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই?

উঃ—ইহা সত্য নহে।

প্রঃ—আমি আপনাকে বলিতেছি যে, নোট নিবার পূর্ব্বেই সমস্ত আলোচনা হইয়া গিয়াছিল।

উঃ—হাঁ, আমার মতানৈক্যের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি আমার মতানৈক্যের কথা লিখিয়া রাখিতেছি এবং কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটকে তাহা স্থানে স্থানে দেখাইয়াছি।

প্রঃ—আমি বলিতেছি যে, আপনি কখনও তাহা করেন নাই।

উঃ—তাহা মিথ্যা কথা।

ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, কর্ণেল চাটার্জ্জি তাঁহার নোটে তখন তখনই অতিরিক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং তাহা তুলনা করিতে চাহেন। কিন্তু কোর্টের আদেশের ঐরূপ ভাব থাকিলেও বিবাদীপক্ষের উকীল তাহাতে বাধা দেন। যেখানে বিশেষজ্ঞদের অভিমত প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে চলিয়াছে এবং আলোচনা করিয়াও যেখানে কোন অভিমত প্রকাশ করা যায় সেই ক্ষেত্রে কর্ণেল চাটার্জ্জি তাঁহার নিজের মতকে প্রামাণ্য মত বলিয়া অপর দুইজন ডাক্তারকেও নিজের মতে টানিয়া আনিবেন, এইরূপ আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। আর যদি তিনি তাঁহার যুক্তি দ্বারা ঐরূপ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও অভিযোগ করিবার কিছু থাকিবে না।

যেসব চিহ্ন সম্পর্কে বিতর্ক আছে এবং যে সব সম্পর্কে কর্ণেল চাটার্জ্জি নিজের মন্তব্য যোগ করেন, তাহা এই—নাকের উপকার অর্ব্বুদ 'উপদংশ জনিত ক্ষত চিহ্ন' চামড়ার উপরে এইরূপ ৬টি চিহ্ন আছে আর একটী অর্ব্বুদ চিহ্ন সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে।

উপদংশ সম্বন্ধে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ

বিশেষজ্ঞগণের সাক্ষ্য প্রমাণের মূল্যাবধারণ করিতে হইলে যে সকল বিষয়ে কোনও মতবিরোধ নাই, তাহার কতকগুলি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। তাহা ছাড়া উপদংশ ব্যাধি সম্বন্ধে যে সাতজন ডাক্তার সাক্ষ্য দিয়াছেন,

ব্যারামের 'স্যালভার্সন' নামক ঔষধ আবিষ্কার করেন। ১৯১০ সালে ঐ ঔষধ বাজারে বিক্রয়ের জন্য বাহির করা হয় (ডেভিড লেসের গ্রন্থ, ১৫৫ পৃঃ, ১৯৩১ সালের সংস্করণ)। মধ্যমকুমার এই ঔষধের কোনও সুবিধাই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। উপদংশের যদি রীতিমত চিকিৎসা হয়, তাহা হইলে অর্ব্বুদ প্রায়ই হয় না। মধ্যমকুমারের যখন পীড়া হয়, তখনও প্রতিষেধক ঔষধ ছিল—যেমন পারদ। পারদ ব্যবহার করিলে অর্ব্বুদ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তৎসত্ত্বেও মধ্যমকুমারের যখন উপদংশজনিত অর্ব্বুদ হইয়াছিল, তখন বেশ বুঝা যায় যে, মধ্যমকুমারের চিকিৎসার রীতিমত ব্যবস্থা হয় নাই। ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মধ্যমকুমারের কনুইতে এবং তাঁহার পায়ে উপদংশজ অর্ব্বুদ প্রকাশ পাইয়াছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, বাদীর শরীরের যে অর্ব্বুদ চিহ্ন আছে, তাহা উপদংশজনিত কি না, এবং ঐ অর্ব্বুদচিহ্ন উপদংশের স্মারক-চিহ্ন কি না। আর একটী প্রশ্ন হইতেছে এই যে, বাদীর উপদংশ রোগ ছিল অথবা ছিল না? এ প্রশ্ন ডাক্তারদের মনে জাগিয়াছিল বটে; কিন্তু এই সাধারণ প্রশ্ন ঠিক খোলাখুলিভাবে উত্থাপন করা হয় নাই। মেজর টমাস বলিয়াছেন,—দরখাস্তের লিখিত চিহ্নগুলির বিশ্লেষণ এবং উপদংশ সম্পর্কিত বিষয় প্রমাণ করা, অথবা তাহা উড়াইয়া দেওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ, আমাদের সাক্ষ্যের বিষয় ছিল।

উপদংশ ব্যাধি দুই প্রকারে সংক্রামিত হয়; এক সংসর্গজ, আর জন্মসহজাত। সংসর্গজ উপদংশে, উপদংশের বীজাণু পরস্পর সংসর্গের ফলে এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়। সংক্রমণের আদি ক্ষেত্রই হইতেছে জননেন্দ্রিয়। লোন্ছা হইতে প্রথমে ব্যাধির সূচনা হয়। ক্রমশঃ সেই লোন্ছা দুষ্ট ব্রণে পরিণত হইয়া ক্ষত সৃষ্টি করে। সে ক্ষত বেদনাহীন, অবসাদযুক্ত এবং ক্ষয়শীল। এই প্রকারের ক্ষত উপদংশজনিত ক্ষত বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার ফলে সচরাচর নিকটবর্ত্তী লসিগ্রাহী গ্রন্থি স্ফীত ও শক্ত হইয়া উঠে। এই সকল এবং কুচকির মাংসপিণ্ড (ইনকুইন্যাল গ্ল্যাণ্ড) রবারের বলের মত নিম্নগামী হইয়া ঝুলিতে থাকে, ইহাকেই উপদংশজ বাগী বলে। অন্য কোনও বীজাণু সংক্রামিত না হইলে ইহাতে পূঁয হয় না। তবে পূঁয হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

উপদংশের বীজ রক্তের সহিত মিশ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত, ব্যাধি প্রাথমিক অবস্থায় থাকে। বীজাণু রক্তের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিলেই দ্বিতীয় স্তরের অবস্থা সূচিত হয়। এই প্রাথমিক অবস্থার অব্যবহিত পরেই প্রায় যে সকল বহিঃ-চিহ্ন প্রকাশ আরম্ভ হয়, তাহার মধ্যে স্ফোটকাদি উদ্ভেদ, ব্রণ, কণ্ডু প্রভৃতি প্রধান। এইগুলি ক্রমশঃ মিলাইয়া যায় না, মিলাইলে শেষ অবস্থায় তাহা

অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'নাসিকা সেতু'র ডানদিকে হাড়ের যে বাড়্তি, যাহা একটু উপরে অবস্থিত, এবং যাহাকে সম্মুখ মণ্ডল সম্পর্কিত একটা স্তর বলা যাইতে পারে, তাহাকে গুল্ম বলা চলে না। ডাক্তারেরা (কর্ণেল চাটার্জ্জি) 'নাসিকা-সেতু'র বাম দিকে সেরূপ কোনও হাড় বাড়্তি দেখেন নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, 'নাসিকা সেতুর' ডানদিকের 'হাড়-বাড়্তি' যাহা সকলেরই স্বীকৃত, সেটি কি? লেঃ কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট এবং মেজর টমাস বলেন, উহা উপদংশজ নহে। ইহা ছাড়া তাঁহারা অন্যমত প্রকাশ করেন নাই। প্রথম জবানবন্দীতে ডাঃ ডেনহাম হোয়াইট বলেন,—এইরূপ গুল্ম কোনও আঘাতের ফলে অথবা ঘুষি মারিলে হইতে পারে। জেরার উত্তরে তিনি বলেন, উহা কতদিনের তাহা তিনি বলিতে পারেন না; তবে এইরূপ চিহ্ন যে অল্প দিনের নয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে, খুব জোরে আঘাত করা হইয়াছিল। ঐস্থানে কোনও দাগ নাই। তাঁহার মতে উহা জন্মসহজাত হইতে পারে। কিন্তু তিনি আবার বলেন, সেরূপ নাও হইতে পারে। শেষে তিনি বলেন যে, ঐরূপ চিহ্ন যে কোনও কারণে হইতে পারে। হাড় ভাঙ্গা সে সকল কারণ হইতে বাদ পড়ে না। নাকের মধ্যে হাড় বাড়িয়া গেলেও ঐরূপ গুল্ম চিহ্ন হইতে পারে; ফলতঃ সাক্ষী জন্মগত কারণ একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন; তিনি বলেন, সে কারণ সম্ভব নাও হইতে পারে।

মেজর টমাস বলেন যে, ইহা ঠিক কিনা তাহা বলা কঠিন; হয় ইহা নাসিকার অস্থিতে একটা অস্বাভাবিক কিছু, নতুবা নাসিকার অস্থিতে আঘাত লাগিবার পর উহা তাহার অবশিষ্টাংশ বা উহা অস্থির অস্বাভাবিক পরিবর্দ্ধনও হইতে পারে। লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইটের মনেও ঠিক এই রকম ধারণাই হইয়াছিল। তিনি এই অস্থির পরিবর্দ্ধনে যে সকল কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হাড় ভাঙ্গার কথাও বাদ যায় নাই। অবশ্য তিনিও উপদংশের কথা বলিয়াছেন; কারণ তাঁহার মতে বাদীর যদি উপদংশ কখনও হইয়া থাকে, তবে অবস্থাটা অদ্ভুত রকমের হইলেও এই দুইটি কথা একসঙ্গে মনে হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

কর্ণেল চাটার্জ্জির স্থির বিশ্বাস যে, ইহা উপদংশ জনিত অর্ব্বুদ; একজন বিশেষজ্ঞও এই কথা বলিয়াছেন। অপরদিকে উপদংশের কথা উড়াইয়া দিবার জন্য কেবল নীতিবাচক ও যুক্তিহীন উত্তর। কর্ণেল লেফটেনাণ্ট ডেনহ্যাম উপদংশের কথা এই বলিয়া বাতিল করিয়া দিতে চান যে, উপদংশ হইলে ইহা ক্রমশঃই বাড়িত, এবং যে অবস্থা দেখা যায়, তাহা অস্বাভাবিক। কেহই জানেনা যে, ইহা বাড়িতেছে কি না। স্থান সম্পর্কে কর্ণেল চাটার্জ্জি বলেন যে,

পুরুষাঙ্গে উপদংশ জনিত কোন ক্ষত আছে কি না, তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী বলিয়াছেন যে, বাদী বেশ জোরে শ্বাস টানেন, এবং উহাতে শব্দ হয়, কর্ণেল চ্যাটার্জ্জীর এই কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। নাসারন্ধ্রে শ্লেষ্মা জমিয়া আছে কি না তাহা দেখিবার জন্য মেজর টমাস টর্চ্চ লাইট ফেলিয়া লক্ষ্য করেন। বাদীর শ্বাস-প্রশ্বাস যে অদ্ভুত ধরণের, এই কথা মেজর টমাস স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি পায়ে এবং হৃদ্‌পিণ্ডে শোথের কথা উল্লেখ করেন। ইহা কিন্তু পরীক্ষা করা হয় নাই। বাদীর শ্বাস-প্রশ্বাস কেবল জোরেই বহে এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে শব্দও হয় এবং তাহাতে মনে হয় যে, নাসিকা পথে কোথাও বাধা পাইতেছে। কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী নাকের মধ্যে সাদা সাদা দাগ দেখিতে পান এবং ইহাও লক্ষ্য করেন যে, নাসারন্ধ্র ব্যবধায়ক ঝিল্লী কিঞ্চিৎ স্ফীত। তিনি বলেন যে, উপদংশ থাকিলে এরূপ অবস্থা হয়। ইহার সহিত আরও বলা যাইতে পারে যে, বাদীর অণ্ডকোষে তিনবার টিপিবার পর সে ব্যথায় সঙ্কুচিত হয়। কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী বলেন যে, সাধারণ লোক হইলে ইহাতে চীৎকার করিবার কথা।

কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী বলেন যে, বাদীর জিভের মাঝখানটা যে কাটা, তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। আমি আদালতে বাদীর জিভ দেখিয়াছি, উহা কাটা বলিয়া মনে হয়। কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী নাকে, জিহ্বায় এবং পায়ের আঙ্গুলে যে সকল লক্ষণ দেখিয়াছেন, তাহা উপদংশ জনিত বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত বাদীর অণ্ডকোষে যে তেমন স্পর্শানুভূতি নাই, ইহা দ্বারাও বাদীর উপদংশ থাকা প্রমাণিত হয়। ডেভিড লীজ ৮৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, উপদংশ জনিত অর্ব্বুদ সাধারণতঃ জিভেই প্রথমে দেখা যায়। খাদ্য বস্তুর সহিত ক্রমাগত ঘর্ষণ লাগার দরুণ ইহা বৃদ্ধি পায়; ফলে জিভে ফাঁক দেখা দেয়; বিশেষভাবে আক্রান্ত হইলে পরে ক্ষত হয়।

বাদী বহু পূর্ব্বেই উপদংশ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া দেখা যায়। তাহার 'নাসিকা সেতু'র ডান দিকে ৭/১৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি হাড় বাড়িয়াছে এবং বাঁ দিকের হাড় সামান্য মোটা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সেপ্টাম সামান্য ফুলিয়াছে এবং নাসারন্ধ্র ব্যবধায়ক বা ঝিল্লী স্ফীত হইয়াছে। এই সকলের দরুণ এবং অর্ব্বুদ থাকায় নাকের গড়ন পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য। এতদ্ব্যতীত চেহারায় আর কোন বৈসাদৃশ্য নাই; একমাত্র বলা যায়। বাদীর চুল পাকিয়াছে। ডি (২) চামড়ায় উপদংশ জনিত ক্ষত চিহ্ন ডেনহাম হোয়াইটের নোটের মধ্যে উল্লেখ আছে, তথায় ছয়টি চিহ্নের কথা আছে, সেইগুলি এই :—

(১) বাম বাহুতে গোলাকৃতি অসমান চিহ্ন।

দুর্ঘটনার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিলেন, ঐ সময় তাহার ভাইয়ের হাতী দেখিয়া তাঁহার ঘোড়া ভড়কাইয়া যায়, ফলে তিনি পড়িয়া যান, এবং তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়, তিনি সময়ের কথা বলেন নাই। এই বিষয়ে তাঁহাকে জেরা করা হয় নাই। এই তারিখ উল্লেখ না করা আমি খুব বিসদৃশ বলিয়া মনে করি না। কিন্তু বিবাদী পক্ষে বলা হইয়াছে যে, বাদীর চিহ্নসমূহ কুমারের উপর আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং এই সম্পর্কে জেরা হয় নাই, এইরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া আমি এই বিষয়ে আলোচনা করিব না। কিন্তু আমি পুরাতন কর্ম্মচারীদের উক্তি অবিশ্বাস করিবার মত কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। (বাদী পক্ষের ৪৮নং সাক্ষী প্রতাপ নারায়ণ, ৪৯নং প্রভাত দে, ৮নং গঙ্গাবাবু—পুরাতন নাজীর, ৮০৬নং সাক্ষী নগেন) ইহারা কেহই দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখেন নাই। অব্যবহিত পর তথায় গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কুমারের রক্ষিতা এলোকেশী ইহা ছোট কুমারের বিবাহের কাছাকাছি কোন সময়ে দেখিয়াছিল। কিন্তু সেও সময় বলিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে রাণী ইহা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং অপরাপর এমন কোন ঘটনার কথা শুনেন নাই। অনেকের পক্ষে তাহা জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়, ফণীবাবু ইহা শুনিয়া থাকিবেন। আমি সাব্যস্ত করিতেছি যে, বাদীর ন্যায় দ্বিতীয় কুমারের ভাঙ্গা দাঁত ছিল।

ঠিক এই চিহ্নটী দ্বারা নহে, অপর ভাবে প্রমাণিত চিহ্নের উপর ভিত্তি সাদৃশ্য সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে হইবে।

(ছ) মস্তকে স্ফোটক চিহ্ন।

(জ) পৃষ্ঠদেশে স্ফোটক চিহ্ন।

(ঝ) দক্ষিণ বাহুতে ব্যাঘ্র নখ চিহ্ন।

(ঞ) পুরুষাঙ্গের উপর তিল চিহ্ন।

এই চিহ্নগুলি সম্বন্ধে মাত্র বাদী ও জ্যোতির্ম্ময়ীই বলিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়াছেন শৈশবে মেজকুমারের গায়ে বহু ফোড়া হয়, মাথায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় ফোড়াটির দাগ রহিয়াছে। ৯ বৎসর বয়সে চূড়াকরণের সময় এবং পরে পিতার ও মাতার মৃত্যুর পর যখন মাথা মুড়ান হয়, তখন তিনি এই দাগ দেখেন। ইহা অসম্ভব নহে। অন্য বিষয়ে বাদীতে ও মধ্যম কুমারের মিল আছে; এই দাগ কুমারের অঙ্গে ছিল, তাহা মানিয়া লইতে হইবে। পিঠের ফোড়ার দাগ সম্বন্ধেও ঐ কথা।

বাদী বলেন যে, রাজার মৃত্যুর কিছু দিন পর চিড়িয়াখানায় প্রায় ৬ মাস

বয়স্ক এক ব্যাঘ্র শাবক মেজকুমারের হাতে 'থাবলা' দেয়। এই থাবার চিহ্ন জ্যোতির্ম্ময়ী লক্ষ্য করেন নাই দেখিয়া, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বিবাদী পক্ষ হইতে তাঁহাকে খুব জেরা করা হয়। এই দাগ সত্যসত্যই বাঘের থাবার কি না এ সম্বন্ধে মত দিবার জন্য ডাক্তারদের বলা হয়। কিন্তু ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমার সিদ্ধান্ত এই যে এই সম্পর্কে যে, প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, অন্য বিষয় বাদীর সহিত কুমারের অমিল প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

পুরুষাঙ্গের উপরিস্থিত তিল চিহ্ন সম্বন্ধে কুমারের পুরাতন ভৃত্য ও কুমারের রক্ষিতা এলোকেশী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

মেজ কুমারের বীমার মেডিকাল রিপোর্টের উল্লিখিত টীকার দাগের সহিত বাদীর টীকার দাগের মিল আছে। বিবাদী পক্ষ বলিতেছেন যে, মেডিকাল রিপোর্টে প্রতি হস্তে দুইটি করিয়া দাগের কথা লিখা আছে। বাদীর একটি হাতে দুইটি দাগ আছে, অন্য হাতে আছে মাত্র একটি, এই দাগগুলিও অত্যন্ত অস্পষ্ট। কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট বলিয়াছেন যে, যে স্থানে টীকা দিতে হয় বাদীর অঙ্গে দাগগুলি সেই স্থানে নাই। মেজর টমাস কিন্তু বলেন যে, দাগগুলি টীকারই। ৩১ বৎসরের একটি দাগ মলিন হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

পারিবারিক বিশিষ্টতার কথা

এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে পারিবারিক কতকগুলি বিশিষ্ট চিহ্নের কথা বলিব। ইহাই সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, চুলের বর্ণ, চুলের গঠন, ওষ্ঠ, নাসিকা, ও কর্ণের গঠন পিতৃপুরুষ হইতে সন্তান প্রাপ্ত হয়। ভাওয়াল রাজার তিন সন্তান, মেজকুমার, ছোটকুমার ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, তাঁহার প্রথম দুই সন্তান বড়কুমার, ইন্দুময়ীদেবী হইতে অন্যরূপ দেখিতে। ইন্দুময়ী ও বড়কুমারের গায়ের রং ময়লা ছিল, তাঁহাদের গায়ে লোম ছিল না। মেজকুমার, ছোটকুমার ও জ্যোতির্ম্ময়ীর গায়ের রং ও চুলের রং রাজা কালীনারায়ণের মত। মেজ-কুমারের মত রাজা কালীনারায়ণের বাম হাতের দুইটি অঙ্গুলী প্রায় সমান শঙ্কযুক্ত। পদও পারিবারিক বৈশিষ্ট্য, গণ্ড হইতে ছিন্নলতি বিশেষ আকৃতির কর্ণ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণেরও ছিল।

চলিবার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর

উভয় ব্যক্তির চলিবার ভঙ্গীর মিল সম্বন্ধে প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। বৃদ্ধা মোক্ষদা দেবী (১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সাক্ষ্য গৃহীত) জন্ম হইতে কুমারদের

উচ্চতার অনুপাতে উচ্চতা বর্ত্তমানে যাহা হইতে পারিত, বাদীর তাহাই আছে। তাহার পর ধরিতে হইবে মাথায় ও পিঠে ফোড়ার চিহ্ন, ব্যাঘ্রের থাবার চিহ্ন, পুরুষাঙ্গে তিল এবং চলিবার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের মিল। এই অনুচ্ছেদের কথা ছাড়িয়া দিলেও উপরের তালিকার মিলগুলি সহসা দ্বিতীয় ব্যক্তিতে পাওয়া যাইতে পারে না।

অতএব মেজকুমার যদি দার্জ্জিলিংএ সত্য সত্যই মারা গিয়াছেন, মেজকুমার অপেক্ষা বাদীর মন পৃথক ও হাতের লেখা পৃথক, এবং বাদী বাঙ্গালী নহেন ইহা প্রমাণিত না হইলে, এ বিষয়ে আর কোন প্রকার সন্দেহ নাই যে, বাদীই মেজকুমার স্বয়ং।

বাদীর মনের দৃঢ়তা

জনাকীর্ণ আদালতে বাদী সাক্ষ্য প্রদান করিতে আগমন করেন। আমার অভিজ্ঞতায় এমন ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। কুমার বহুদিন মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া সকলেই অবগত। তাঁহার রাণী সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন, ও এই ব্যক্তিকে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি প্রবঞ্চক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। তাঁহার কাহিনী পাগলের কাহিনী বলিয়া মনে হইল, তাঁহার দাবী মনে হইল অদ্ভুত। ক্ষীণ হিন্দী টানে তিনি যখন কথা বলিলেন, তখন একটা হিন্দুস্থানীভাবে তাঁহাকে দেখা যায়। বিবাদী পক্ষ বলিলেন, বহু বৎসর যাবৎ প্রবঞ্চনার ষড়যন্ত্র প্রমাণিত করিতে তাঁহার আবির্ভাব। স্বীকার করিতেছি আমি বাদীকে তখন অবিশ্বাস করি। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা আমি শুনি, তাঁহার প্রতি হাবভাব আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া যাইতে থাকি।

জবানবন্দীতে বাদী তাহার কাহিনী বলিয়া গেলেন। আপন সংক্ষিপ্ত জীবনী, পরিবারের কথা, উপদংশ চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আগমন, দার্জ্জিলিং যাত্রা, দার্জ্জিলিং গিয়া কি হইল, কি করিয়া তথায় তিনি চৈতন্য হারাইলেন, কিরূপে চৈতন্য ফিরিলে তিনি আপনাকে সন্ন্যাসীগণ পরিবৃত দেখিলেন, কি ভাবে তাঁহাদের সহিত ঘুরিয়া নেপাল ব্রহ্মছত্রে সন্ন্যাসীদের সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার পর, নানাস্থান হইয়া তিনি ঢাকায় আসিলেন, সকল কথাই তিনি বলিলেন। তাহার পর বলিলেন কাশিমপুর ও জয়দেবপুর গমনের কথা, আত্মপরিচয় দানের কথা এবং আরও অনেক কাহিনী।

নয় দিন ধরিয়া মিঃ এ, এন, চৌধুরী তাঁহাকে জেরা করিলেন।

উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে বা বড় বড় রাজপুরুষদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় ইংরেজী পোষাক ব্যবহার করা হইলেও কুমারদের আচার ব্যবহার খাঁটি বাঙ্গালীর আচার ব্যবহারের মত ছিল। 'রাজপুত্র' এই কথা দিয়া সাক্ষীদের ভুলান গেলেও আদালতকে উহা দ্বারা বিপথগামী করা চলিবে না।

কুমারের অতীত স্মৃতি সম্বন্ধে কোন কথা জেরায় বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। অজুহাত—স্মৃতির কাহিনী বাদীকে শিখান পড়ান হইয়াছে। কোন সাক্ষীকে শিখান পড়ান হইয়াছে বলিয়াই তাহাকে জেরা করা চলিবে না, ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে, বরং তাহাকে অধিক জেরা করাই সঙ্গত। বাদী জয়দেবপুরে আসিয়া ৩৭ দিন থাকিলেন। প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করা আরম্ভ হইয়াছে। বাদী কখনও রাজবাড়ীর ভিতরে বা ঢাকা ভবনে যান নাই। তাহার পক্ষ হইতে কালেক্টারের নিকট তদন্তের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তদন্ত করা হইবে না, এই কথা কেহ বলেন নাই। বাদী ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আবেদন করিলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বলা হইল 'আদালত খোলা আছে, তথায় গিয়া প্রমাণ কর।' এতদিন মিঃ লিণ্ডসে হইতে মিঃ কে, সি, দে পর্য্যন্ত বাজে আশা দিয়া আসিতেছিলেন। যেন উদ্দেশ্যই হইল বাদীর সম্মুখীন হওয়া চলিবে না, তাহাকে অভিযুক্তও করা চলিবে না। এই নীতি আদালত পর্য্যন্ত অনুসৃত হইয়াছে। মেজকুমারের জীবনের সকল কথাই কি বাদীকে কেহ শিখাইতে পারে, ইহা কি সম্ভবপর হয়? শিখান পড়ানর ফলে কি বাদী আদালতে মানুষকে বা তাহাদের ফটো সনাক্ত করিতে পারে? সহস্র ব্যক্তির সমবেত স্মৃতির সহিত ব্যবহারজীবিদের কুশলতা ও রাণীর পূর্ব্বকথা সমস্তই কি শিখান পড়ানর নিকট হার মানিয়া গেল? মেজকুমারের সমগ্র স্মৃতি-ভাণ্ডার কি তথাকথিত পাঞ্জাবী কৃষকের ভিতর বেমালুম প্রবেশ করান সম্ভব হইল? মিঃ চৌধুরী কি বাদীর হাতে বন্দুক দিয়া তাহা আদালতে ব্যবহার করিয়া দেখাইতে বলেন নাই? স্মৃতির সম্পর্কে মাত্র জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে উপদংশের কথা, বড় দালানের কথা ও দার্জ্জিলিংএর কথা এবং জিজ্ঞাসা করিয়া ফাঁদে পড়িতে যেন তিনি ভীত হইয়াছেন! সত্যের ভিতরে যদি তিনি পড়িয়া যান! মক্কেলদের উপদেশ অনুসারেই অবশ্য মিঃ চৌধুরীকে এই পথ লইতে হইয়াছে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজকুমারগণ প্রকৃত বাঙ্গালীই ছিলেন

মেজকুমার কি সাহেবী ধরণের লোক ছিলেন? সাহেবী পোষাক পরিয়া হোটেল হইতে অর্ডারি সাহেবী খানা সাহেবদের সহিত বসিয়া কি তিনি

খাইতেন? সান্ধ্য-পোষাকে কি তিনি ডিনারে বসিতেন? তিনি কি ক্রিকেট হইতে পলো পর্য্যন্ত সকল খেলা জানিতেন? ইংরেজী ধরণের আসবাবপত্র ও তাহাদের নাম জানিতেন? তিনি কি গান-বাজনা জানিতেন? তিনি কি অশ্বচালনে পটু ছিলেন, ঘোড়দৌড়ে বাজী খেলিতে যাইতেন, দ্রুত গাড়ী চালাইতে পারিতেন, শিকারীরূপে তিনি কি বাঘ মারিতে গিয়াছিলেন?

মেজকুমার অশ্বচালনা করিতে পারিতেন, তিনি ভাল শিকারী ছিলেন, তিনি ঢাকায় টাট্টু ঘোড়দৌড়ে যোগদান করেন এবং মণিপুরী জকিদের সহিত যে মাঝে মাঝে তিনি পলো খেলিতেন, ইহা বাদী নিজেও বলিয়াছেন।

এই মামলার বিচারকালে আমি বেশ বুঝিয়াছি, বিবাদীদের কুমারকে জাল প্রতিপন্ন করিতে জেরায় বিবাদী সাক্ষীদের বড়ই কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। বাদীপক্ষের বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ সাক্ষ্যে যখন মেজকুমারের শিক্ষা ও আচার ব্যবহারের বর্ণনা দিতে আরম্ভ করেন তখন বিবাদীদের সুর নরম হইয়া আসে। সাগর বাবুর সাক্ষ্য দানের সময় পর্য্যন্ত বিবাদীগণের ইহা মনে পড়ে নাই যে, মেজকুমার যদি সাহেবী খানা খাইতেই অভ্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার খানা খাইতে বসিবার ঘরেরও প্রয়োজন। ইংরেজ অতিথিদের মধ্যে রাজবাড়ীতে মিঃ মেয়ার ছিলেন, দুই বৎসর (১৯০২-১৯০৪) মিঃ র‍্যাঙ্কিন ছিলেন। আর—কালেক্টার ও কমিশনরগণ যাইতেন। মিঃ মেয়ার এই কথা বলেন নাই যে, মেজকুমার তাঁহার সহিত বা অন্য কোথাও সাহেবী খানা খাইতেন। মিঃ র‍্যাঙ্কিনকেও কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হন নাই যে, তিনি কোন দিন কুমারদের সহিত আহারে বসিয়াছেন কি না! বলা হইয়াছে, লর্ড কিচেনার যখন জয়দেবপুর যান, তখন কুমাররা তাঁহার সহিত খানা খান। তিনি রৌপ্যমণ্ডিত গাড়ীতে বড় দালানের গাড়ী-বারান্দায় পৌঁছিলেন। মধ্যম ও তৃতীয় কুমার সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি গাড়ী হইতে নামিতেই তাঁহারা তাঁহাকে অভিবাদন (সেলাম) করিলেন। লর্ড কিচনার এবং তাঁহার সঙ্গী সামরিক কর্ম্মচারীগণ সে রাত্রিতে বড় দালানে আহার করিলেন, এবং পরদিন প্রাতঃকালে কোড্ডায় নদী পার হইয়া তাঁহারা জঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করিলেন,—একথা আমার আগেকার বিবরণেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে লর্ড কিচনারের আর্দ্দালির মারফতে হিন্দিতে কি কথা হইল, কারণ মধ্যম কুমার সেই দলের সহিত গিয়াছিলেন—অপর দুই কুমার যান নাই—এবং হিন্দিতে যে কথা হইল তাহা অতি সংক্ষিপ্ত।

বহু সংখ্যক সাক্ষীর কথা হইতে সংগৃহীত এই বিবরণ আমি সত্য বলিয়া

বিশ্বাস করি। (বাঃ সাঃ ৩৯ দিলবর; বাঃ সাঃ ৬৩৬ আবদুল জমাদার; বাঃ সাঃ ৯৫২ মনোমোহন; বাঃ সাঃ ৯০৭ রসিক রায়, বাঃ সাঃ ৮৯২, ৯৭৩, ৯৩৮, ৮, ৯, এবং বাঃ সাঃ ৫৭ আশুবাবু, ষ্টেশন মাষ্টার)। যে সকল কর্ম্মচারী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, যে সকল মাহুত সঙ্গে গিয়াছিল এবং যে সকল রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাঁহার স্পেশাল ট্রেণের সময় উপস্থিত ছিল, তাঁহাদেব নাম ইহাদের অন্তর্ভূক্ত।

আহার প্রমাণ করার জন্য প্রতিবাদী বাবুর্চ্চি ডিকস্টা (প্রঃ সাঃ ৪৩), এবং মাহুত আমানুল্লা (প্রঃ সাঃ ৬১) এবং রায় সাহেবকে সাক্ষী উপস্থিত করেন। ডিকস্টা বলিয়াছে যে তিন তিন কুমারই জঙ্গলে (শিকারে ?) গিয়াছিলেন, বড় কুমার লর্ড কিচনার সাহেবের সঙ্গে একই হাতীতে ছিলেন; এবং ইহারা কাশিমপুরে বাবুদের বাড়ীতে তাঁবুতে খানার সময় যোগ দিয়াছিলেন! আমানুল্লা বলিয়াছে—কাশিমপুরের বাবুদের বাড়ী দুই মাইল দূরে কোড্ডার তীরে তাম্বুগুলি অবস্থিত ছিল; এবং বড় কুমার ও তৃতীয় কুমার আদৌ শিকারে যান নাই নাই। লর্ড কিচনার, কর্ণেল বাডউড্ ও কাপ্টেন ফিট্জেরাল্ডের সহিত তিন কুমারই খানায় বসিয়াছিলেন। আমি এই সাক্ষ্যের একটি কথাও বিশ্বাস করি না। কুমারগণ যে লর্ড কিচনারের সহিত বসিয়াছিলেন—এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যানেজারও বসিয়াছিলেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

প্রতিবাদীপক্ষ ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন,—বড় দালানে খানার কথা কেহই সমর্থন করিবে না, সুতরাং তাঁহারা এ ভোজনকক্ষের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং প্রত্যেক কুমারই পৃথক (এক এক) বাবুর্চ্চি থাকার মিথ্যা প্রাসাদের ভিত্তি স্বরূপ হইল। ৯৭৭ সংখ্যক সাক্ষী সাগর বাবুকে বলা হইল যে মধ্যম কুমারের বৈঠকখানা ঘরের পশ্চিমদিকের একটি প্রকোষ্ঠের পরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে তাহার ভোজনকক্ষ। ম্যাপে উহাই ১২১নং কক্ষ। বৈঠকখানা ১১৫ নম্বর কক্ষ। এই ১২১ নম্বর কক্ষ সম্বন্ধে মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন:—

প্রশ্ন—ইহাই মধ্যমকুমারে ভোজন কক্ষ?

প্রশ্ন—সেখানে টেবিল, চেয়ার ও সাইডবোর্ড (খাবারের বাসন-কোসন রাখিবার আলমারী)? সাক্ষী উভয় প্রশ্নের উত্তরেই 'না' বলিলেন।

এখন, বাদীর সাক্ষীগণের—তাঁহার যে সব খানসামা তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করে, তাহারা এবং তাঁহার ভাগিনেয়গণ ইহাদের অন্তর্গত—প্রদত্ত বিবরণ ইহাই যে মধ্যম কুমার তাঁহার বৈঠকখানার উত্তর দিকে অবস্থিত শয়ন

জবানবন্দীতে বলেন যে, দার্জ্জিলিং যাইবার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে মেজকুমার পলো খেলা ত্যাগ করেন, কাজেই ঢাকা পলো ক্লাবের ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের রসিদে বর্ণিত চাঁদা মেজকুমার দিতে পারেন না। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, মেজকুমার মোটেই পলো ক্লাবের সদস্য ছিলেন না, এবং বাদী যে অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন তদপেক্ষা পলো ক্রীড়াজ্ঞান মেজকুমারের ছিল না। মেজকুমারের পলো না খেলিবার হেতু এই যে, তিনি ডানহাতে লাগাম ধরিতেন। বিবাদী পক্ষের ২৯০ নং সাক্ষী বীরেন্দ্রের কথাই এই ক্ষেত্রে মানিয়া লইতে হয়। বীরেন্দ্র বলিয়াছে যে, মেজকুমার বাড়ী থাকিবার সময় হাতীতে ও টমটমে চড়িতেন, অন্য কোন ব্যায়াম করিতেন না। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, এই সকল খেলা-ধূলা সম্বন্ধে বাদীকে যেরূপ অজ্ঞ মনে হয়, মেজকুমার আদালতে উপস্থিত থাকিলে তুল্যরূপ অজ্ঞতাই প্রকাশ করিতেন।

শিকার ব্যাপারে মেজকুমার

শিকার, বন্দুক ও অশ্ব সম্বন্ধে ইংরেজী নাম বাদী কিছুই জানেন না, তবে বিষয়গুলি তিনি অবগত। শিক্ষিত ভদ্রলোক ফ্যাসানের জন্য শিকার করিতেছেন। মেজকুমার এরূপ ছিলেন না। শৈশব হইতেই শিকার তাঁহার খেলা ছিল। ভাওয়াল জঙ্গলাকীর্ণ বলিয়া তথায় বহু অশিক্ষিত শিকারী আছে, তাহারা বন্দুকের ব্যবহার জানিলেও ইংরেজী নামাদি জানে না, অথবা বুঝাইতে পারে না যে, 'ব্রীচ এণ্ড' অপেক্ষা 'মাজল এণ্ড' ছোট কেন। কয়েকজন শিকারী সাক্ষী ইংরেজী কথাগুলির এই প্রকার বাঙ্গালা নাম দিয়াছে—

টারগেট—	চাঁদমারি
ডি-বি বি-এল—	দোনালা কার্‌তুজ
কার্টিজ—	কার্‌তুজ
ফোর সাইট—	মাছি
ট্রিগার—	মাইর
কক—	ঘোড়া
রেঞ্চ—	পাল্লা
ষ্টক—	কুন্দা
ব্যারেল—	নল
মজিল লোডার—	গুতাইনা
বুলেট—	গুলী

আবার যদি ধরা যায় যে, তিনি দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী সন্ন্যাস জীবনের অভিজ্ঞতার কথা যাহা সাক্ষ্য দান কালে বলিয়াছেন, তাহার সহিত কোন স্থানীয় সম্পর্ক নাই, যাহা স্মৃতিশক্তিকে সঞ্জীবিত রাখে। ইহা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে বাদীকে একেবারে প্রসঙ্গক্রমে এবং একটা অবান্তর ব্যাপারে মিষ্টার গার্থের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন যে গার্থ নবাব এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন।

"১৩১৬ সালে তিনি জীবিত না কোন্ সালে ঠিক বলতে পারি না। তবে আমি দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কতদিন আগে বলতে পারি না। দশ বৎসর আগে নয়, তবে এক বৎসর কি দুইবৎসর আগে, বলতে পারি না।"

১৯০৫ সালে মধ্যম কুমার ভাইস্‌রয়ের কাপের ঘোড় দৌড়ে উপস্থিত ছিলেন এবং ইংরাজীতে কথা কহিতেছিলেন ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শেষের দিকে একজন সাক্ষী আহুত হইয়াছিল, একথা আমার উল্লেখ করা উচিত। যখন আমি বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিব তখন এই সাক্ষ্য সম্বন্ধে বিচার কবিব, এবং তখন ইহা প্রতীয়মান হইবে যে উক্ত সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য, যদিও ঐরূপ উপস্থিতি কোন স্বাভাবিক কারণে অসম্ভব নহে।

বর্ণজ্ঞান

বাদী, এইচ্, ই, এইচ্. এইচ্, সি, এস্. আই, আই, সি, এস্, প্রভৃতি (ইংরাজী) শব্দ জানেন না, কিম্বা "হাউ ডু ইউ ডু" কিম্বা "কোয়াইট্ ওয়েল" কথার অর্থ জানেন না। আই, সি, এস্, সম্বন্ধে তাঁহার একটা ধারণা আছে এবং যদিও তিনি এ, ডি, সি, কাহাকে বলে জানেন না; কিন্তু "এডিকং" সম্বন্ধে ধারণা আছে, যখন কথাটি উচ্চারিত হয়। কুমার ইংরেজী জানিতেন কি না এবং নিরক্ষর ছিলেন কি না, এই সব ধারণা হইতে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় না। ইহা অদ্ভুত বলিতে হইবে যে, তিনি "ক্রাশ্ড্ ফুড্" কথা জানিতেন। তিনি বলিয়াছেন, উহা ঘোড়াকে খাইতে দেওয়া হয়, যদিও ঐ শব্দটি ইংরেজী পোষাক সম্বন্ধীয় শব্দগুলির মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল। জেরার এক অংশে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে বাদী মোটেই বাঙ্গালী নহেন। নিম্নে ঐ প্রসঙ্গ আলোচনার সময় ইহার বিচার সুবিধাজনক হইবে। ইহার একাংশ এখানেই বিচার করিয়া দেখা যাক্।

একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি অতিশয় ধীরভাবেই বলিয়াছেন যে; "রাজা

যাহাতে কুমার গত জীবনের কোন ঘটনা স্মরণ করিয়া উত্তর দিতে না পারেন। এক্ষেত্রে আমি বলিতে চাই। যদিও এই প্রশ্নগুলি সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, এবং কুমার উহার উত্তর দিতে পারেন নাই, তথাপি বলিতে হয়, কুমার ছাড়া যে কোন ব্যক্তি ঐ প্রশ্নগুলির উত্তরদিতে পারিত, যদি সে শিক্ষিত খেলোয়াড় হইত, যাহা মেজোকুমার ছিলেন না।

স্মৃতিশক্তির কথা

আমি এখন সেই সব প্রশ্নের আলোচনা করিব, যাহা মধ্যম কুমারের মনে থাকিবার কথা। এই সব প্রশ্নের উত্তর সঠিক হইয়াছে, কেবল মধ্যম রাণীর এক ভগিনীপতির নাম বাদী বলিতে পারেন নাই; তিনি কলিকাতার এক যুবক এবং এখন জীবিত নাই; এবং আরও কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। প্রশ্নগুলি নেহাৎ খেলোভাবে করা হইয়াছিল, এবং সংখ্যাতেও অল্প, যে সব প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারেন নাই, সেগুলি এই ধরণের; ১৩০৯ সালে কে ছোটলাট ছিলেন? কিম্বা ১৩১০ সালে? কিম্বা ১৩১১, ১৩১২, ১৩১৩, ১৩১৪, ১৩১৫ ১৩১৬ সালে? রিজলি সাহেব কে? লর্ডমিণ্টোর কথা শুনেছেন? হাঁ, তাঁর কথা হয়ত শুনেছি। তিনি কে ছিলেন তা ঠিক বলিতে পারি না, কিম্বা তিনি কোন্ সালে ভারতবর্ষে ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। ১৩০৯ হইতে ১৩১৬ সাল পর্য্যন্ত কে কে কমিশনার বা কালেক্টর ছিলেন বলিতে পারি না, তবে র‍্যাংকিন্ সাহেব এক সময়ে কালেক্টর ছিলেন, এবং পরে কমিশনার ছিলেন। হাঁ, ১৩১৬ সালের আগে, তবে কতদিন আগে বলিতে পারি না। মিষ্টার গার্থ? হাঁ, তিনি নবাব এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ১৩১৬ সালে তিনি ম্যানেজার ছিলেন কিনা তাহা বলিতে পারি না। ১৩১৬ সালে তিনি জীবিত ছিলেন না। কোন্ সালে, বলিতে পারি না, তবে আমি দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে। কত দিন পূর্ব্বে বলিতে পারি না। ১০ বৎসর পূর্ব্বে নয়, তবে ১ বৎসর কি ২ বৎসর পূর্ব্বে তাহা বলিতে পারি না। ৩ বৎসর কি ৫ বৎসর কি তাঁহারও বেশী দিন পূর্ব্বে তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আপনি ঢাকার গঙ্গানারায়ণ রায়কে চেনেন? এক গঙ্গাচরণ ডাক্তারকে চিনিতাম। কুঞ্জবিহারী চাটুয্যেকে চিনেন? আমার মনে নাই। বঙ্কিম চাটুয্যে কে? তিনি কলিকাতার লোক। তিনি কে? তিনি বই লিখেছেন। কোন বইয়ের নাম বলিতে পারেন? কখনো তাঁর বই পড়ি নি। তিনি মৃত। কলিকাতায় মরেন কিনা তাহা বলিতে পারি না।

এই ধরণের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষায় কাহাকেও মর্য্যাদাভ্রষ্ট করিতে পারে না। অন্যদিকে, মিঃ গার্থ সম্পর্কে উত্তর অসামান্যরূপে খাঁটি স্মরণ শক্তির পরিচায়ক—স্মরণ করিবার একটা প্রয়াস দ্বারাই সার বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে। শিখানো হইলে তাহার অন্যরূপ হইত। যাহাই হউক আমি উত্তরের সঠিকতা অগ্রাহ্য করিতেছি না, কিন্তু আমি উত্তরটি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া, এবং এই পরিবারের সমগ্র ইতিহাস আমার যেমন জানা আছে, এবং শিখানো হইলে যে জটিলতা অতিক্রম করিতে হইত, তাহাতে আমি স্মরণ শক্তির চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। 'বড়দালান'কে 'গেষ্ট হাউস' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হইল "আপনার দাদার ঘর হইতে ইহা কত দূরে ছিল?"

উঃ—তাঁহার কোন্ ঘর, বৈঠকখানা না অন্য কোন ঘর? মিষ্টার চৌধুরী কি ভাবিয়া সে কথা ছাড়িয়া দিলেন। কিছুকাল পরে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, গেষ্ট হাউস হইতে তাহার দাদার ঘর কত দূরে ছিল। বাদী উত্তরে বলিলেন, 'প্রায় ৫০ হাত দূরে হইবে'। ইহা ঠিক কথা।

প্রঃ—আপনি এস্, বি, বৰ্দ্ধনের কথা শুনিয়াছেন?

ইংরেজী জ্ঞানের কথা

উঃ—শশী গোবৰ্দ্ধন? আমরা তাঁর কাছে প্রায়ই জামা কাপড় অর্ডার দিতাম।

জেরায় তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ছিলেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলেন যে, তাঁহার বার কি চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহাকে ঐ স্কুলে দেওয়া হয়। আবার জিজ্ঞাসা করায় বলেন নীচের ক্লাসে। ক্লাসের নাম বলিতে পারেন না। হয়ত শুনিয়া থাকিবেন ৮ম শ্রেণী। সেখানে তিনি ১০ কি ১৫ দিন ছিলেন, প্রধান সাক্ষীরূপে তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাকে শিখানো হয় নাই, শিখান কথা হইলে তিনি আরো কিছু বেশী বলিতেন। বিবাদীপক্ষ পরে ইঙ্গিত করেন যে মধ্যম কুমার এই স্কুলে দুই বৎসর ছিলেন। পরে তাঁহাদেরই সাক্ষ্যে দেখানো হইয়াছে যে তিনি এক বৎসরেরও কম সময় সেখানে ছিলেন। বাদী যে বলিয়াছেন যে, তিনি ১০ কি ১৫ দিন স্কুলে গিয়াছেন ইহা অপ্রমাণিত হয় নাই; ইহা আমি নিম্নে দেখাইব। আর বিবাদী পক্ষের উক্তি যে কুমার এক বৎসরের কিছু বেশী সময় স্কুলে ছিলেন, ইহাও তাঁহাদের প্রথমোক্ত দুই বৎসর স্কুলে থাকার কথার চেয়ে অধিক সত্য নহে।

এ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই যে এই বাদী সন্ন্যাসী, তাঁহার জয়দেবপুরে ৩৭ দিন অবস্থানকালে এবং পরে ঢাকায় একখানি টমটম চালাইয়াছিলেন। সে সময়ে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা জয়দেবপুর ছিলেন ও এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছেন, এবং অপর কেহ, এমন কি ফণীবাবু পর্য্যন্ত একথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। জয়দেবপুরে বাদীর গাড়ী চালনা সম্বন্ধে বাঃ সাঃ ৯৭৭, ৯৭৫, ৯১৮, ৮০৬, ৯৩৮, ৯৩৯, সাক্ষ্য দিয়াছেন; এবং ইহা হইতে আরও বেশী লোক বাদীকে ঢাকায় গাড়ী চালাইতে দেখিয়াছে (বাঃ সাঃ ৪৫০, ৪৭২, ৬০২, ৬৬৬, ৭৩৯, ৭৮৯, ৮১২, ৮৩৩, ৯১৫, ৯১৮, ৯০১, ৭৯২, ৯৬১, ৯৭৭, ১০০৯, ১০১৫, ১০০২, ৯৭০, ৯৭৬, ৯১৮)। এই সাক্ষ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই হয় নাই, এবং ইহার বিপরীত কোন সাক্ষ্য প্রদান করাও হয় নাই। মেয়ার সাহেব বাদীকে রমনার মাঠে একখানি টমটমে দেখিয়াছিলেন; প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে সর্ব্বমোহন চক্রবর্ত্তী (কমিশনে) একদিন বাদীর সহিত দেখা করিতে যাইয়া দেখিতে পান যে, তিনি টমটম হাঁকাইয়া যাইতেছেন। বাদী পক্ষের মাত্র একজন সাক্ষী, যতীন্ বলে যে মধ্যমকুমার বামহস্তে লাগাম ধরিতেন, এবং সে এটাকেই কুমারের বৈশিষ্ট্য বলিতে চায়। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে দক্ষিণ বলিতে ভুল করিয়া সে বাম বলিয়াছে। দক্ষিণ হস্তে গাড়ী চালানর মধ্যে অসম্ভবতা কি থাকিতে পারে, তাহা আমি বুঝি না; এমন কথা ত কেহ বলিতেছে না যে তিনি নেস্তা (যাহারা সব কাজে বাঁ হাতে চালায়) ছিলেন, কিন্তু উহাই ছিল তাঁহার নিয়ম। বাদী যে টমটম চালান এবং তাঁহাকে ১৯২১ সালের ৪ঠা মে হইতে ৭ই জুনের মধ্যে টমটম চালাইতে দেখা গিয়াছিল, একথা অবিসংবাদিত থাকায়, ১৯২১ সালে একজন সন্ন্যাসীর মধ্যে এ ব্যাপারের নূতনত্ব থাকিয়া যায়; এবং আমিও বাদীর সেই পুরাতন ধরণে অর্থাৎ কুমারের ন্যায় গাড়ী চালানো সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য পাইয়াছি তাহা নাকচ করিয়া দিবার কোন হেতু দেখতে পাই না।

উচ্চারণের কথা

অবশেষে আমি একটি কথার উল্লেখ করিতে চাই, যাহার উপর বাদীপক্ষ কতকটা গুরুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। বাদীকে ভাওয়ালের বিখ্যাত খাবারের নাম বলিতে বলায়, তিনি জবাব দেন 'দধি সন্দেশ।' সাক্ষ্য প্রমাণদ্বারা দেখান হইয়াছে যে ইহাকে 'দাউদি সন্দেশ' বলে। বাদীপক্ষের সাক্ষীরা বলে যে ইহাকে দাউদি বা দধি বলা হয়, দধি কথাটা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বলে।

আত্মপরিচয়ে বিবাদীপক্ষ

বাদী যেমনি আত্মপরিচয় প্রকাশ করিলেন, সত্যবাবু তাঁহার নিজের উক্তি-মত প্রকাশ যে, প্রায় তন্মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর নিদর্শনগুলি সংরক্ষণের জন্য যত্নবান হইলেন এবং নিজে সরকারী উকীল রায়বাহাদুরের সহিত দার্জ্জিলিংএর দিকে ছুটিলেন। ইহা ১৯২১ সালে মে মাসের মাঝামাঝির কিছুদিন আগে। সরকারী উকীল রায়বাহাদুর শশাঙ্ককুমার ঘোষ সেই হইতে প্রথম প্রতিবাদীর পক্ষে এই মোকদ্দমায় কাজ করিতেছেন। মধ্যমকুমারের যদি কোনও লেখা থাকিত তাহা ধনরত্নের মত সযত্নে সংরক্ষিত হইত; এবং ইহা ভাবিতে ইচ্ছা হয় না যে তাঁহারা সে প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে ১৯৩২ সালে হস্তলিপি বিশারদের মত লওয়া স্থিরীকৃত হয়, এবং সেজন্য মধ্যমকুমারের কতকগুলি স্বাক্ষর এবং বর্ত্তমান। বাদীর কতকগুলি স্বাক্ষরই শুধু পাঠান হইয়াছিল। বাদীর এই স্বাক্ষরগুলি ১৯২৯ সালের ল্যাণ্ড্ রেজিষ্ট্রেশনের মামলায় কতকগুলি দলিল সংক্রান্ত ব্যাপারে পাওয়া গিয়াছিল; আর কোন লেখাই পাওয়া যায় নাই।

বাদীর জেরার পরে

বাদীর জেরা শেষ হইবার প্রায় চারি মাস পরে প্রতিবাদীপক্ষ কতকগুলি দলিল দাখিল করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন যে, মধ্যমকুমার তাঁহার নিজের স্বাক্ষর ছাড়া আরো কিছু লিখিতে পারিতেন এবং জেরায় বাদী যাহা যাহা জানেন না বলিয়া দেখান হইয়াছে, তাহার অনেক বিষয়েই কিছু তিনি জানিতেন। এই দাখিলী দলিলগুলি দেওয়ানী কার্য্যবিধির অর্ডার ১৩ নিয়ম ২ ধারা অনুসারে অচল এবং সেগুলি নাকচ করিবার আমি যথেষ্ট কারণ দেখাইয়াছি। বাদীর জেরাতে যে সকল কাগজপত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল, এই দলিলের অধিকাংশই সেই জাতীয়; কিন্তু পার্থক্য এই যে জেরার কাগজগুলিতে অন্যের লেখার নীচে মধ্যমকুমারের শুধু স্বাক্ষর ছিল এবং এই নূতন দাখিলী কাগজগুলির প্রায় ছয়খানাতে "মঞ্জুর (Sanctioned)," অথবা "অনুমোদিত (approved)" প্রভৃতি কথা দেখা যায়। প্রতিবাদী পক্ষ বলেন এই কথা গুলি কুমারের নিজেরই লেখা, কোনও মুহুরী বা সরকারের লেখা নহে। এ বিষয়ে প্রতিবাদী পক্ষ দুইটি যুক্তি দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা বলিতে চাহেন বাদী যাহা যাহা জানেন না, তাহা স্থির জানিয়া পরে কুমারের সেই সব যে জানা ছিল সে বিষয়ে প্রমাণ পেশ করিবার অধিকার প্রতিবাদী পক্ষের আছে। দ্বিতীয়তঃ একান্ত নিরক্ষরতা কৌঁসুলীকে বিষম মুস্কিলে ফেলিয়াছে। বোধহয় যে, তিনি

১৩০০ সালের পর তিনি মেজোর শিক্ষার বিষয় আর কিছুই বলিতে পারেন না। কিন্তু ১৩০৬ সালের পর যখন কুমারদের ভাগিনেয় বিল্লু একই শিক্ষকের নিকট পড়িতে আরম্ভ করেন, তখনও উভয় কুমারই লালা (অমূল্য) এবং বলার সহিত সেই মাষ্টারদের নিকট পড়িতেছিলেন।

বিল্লুবাবু মেজো কুমারের হাস্যোদ্দীপক কৌতুকের বিষয় এবং তাহাদের পড়িবার ঘরের বিষয় বর্ণনা করেন। পড়ুয়ারা ফরাসের উপর বসিয়া এবং টেবিলের কাজ চালাইবার জন্য একটী ছোট কাঠের বাক্স সম্মুখে রাখিয়া মাত্র পড়িবার অভিনয় করিতেন, এবং শিক্ষক মহাশয় তখন তাঁহার নিজের আবিস্কৃত হিষ্টিরিয়ার পেটেণ্ট ঔষধ সম্বন্ধীয় চিঠি পত্র বিক্রেতাদের নিকট লিখিতেন। কুমারেরা কি কি পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহা অবশ্য তাহার ঠিক স্মরণ নাই, তবে তাহারা ইংরেজী এবং বাংলা উভয় জাতীয় পুস্তকই পড়িতেন, এবং ইংরেজীতে এজ, এব, এট্ প্রভৃতি শব্দ লিখিতে পারিতেন। বড়কুমার অবশ্য এই সময়ে আর পড়াশুনা করিতেন না। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মেজো ও ছোট কুমারের শিক্ষাও শেষ হইয়াছিল।

বিবাদী পক্ষে কুমারদের শিক্ষার বিষয় ফণীবাবু সাক্ষ্য দেন। ছোটকুমার ও তিনি উভয়েই একবয়সী ছিলেন। তিনি বলেন ১২৯৮ হইতে ১৩০০ সাল—তিনি ও ছোট কুমার চা-কর মিঃ ট্রানসবারীর নিকট শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন, এই সময়ে তাহারা পাঁচ বৎসরের বালক ছিলেন। বৈকালে রাজবাড়ীর স্কুলে তাহারা দ্বারিকা মাষ্টারের নিকট পড়িতেন। মেজো কুমার উভয় মাষ্টারের নিকট বহু পূর্ব্ব হইতেই পড়িতে আরম্ভ করেন; এবং তিনি তাহাদের অপেক্ষা লেখা পড়ায় অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন।

১৩০০ সাল—কুমারেরা ঢাকা স্কুলে পড়িতে যান। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পড়াশুনা সাঙ্গ হয়। এই বিষয় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও সকলের সঙ্গে একমত।

১৩০০—১৩০৩—উভয় কুমারই ফিরিয়া আসেন, এবং সাক্ষী তাহাদের সহিত পুনরায় একসঙ্গে পাঠ আরম্ভ করেন।

১৩০৩—সাক্ষী ঢাকা স্কুলে পড়িতে যান।

১৩০৭—মেজো কুমারের লেখা পড়া শেষ হয়।

১৩০৯—সাক্ষী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া স্কুল ছাড়িয়া জয়দেবপুর আসেন। তিনি দুই কুমারকে তাহারই মত ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তিশীল দেখিতে পান। ছোট কুমার শুধু বাংলায় একটু কাঁচা ছিলেন। তিনি উভয় কুমারের প্রত্যেক সময়ের শিক্ষার বিবরণ বর্ণনা করেন। ১৩০০ সালে মেজো কুমার অল্প ইংরেজী বলিতে পারিতেন; ছোট খাট অঙ্ক

প্রমাণিত হইতেছে। নিজের পুত্রদের অর্দ্ধশিক্ষিত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া রাজা তদীয় পুত্রদের শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ দেখান নাই। কিন্তু ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একাদিক্রমে নয় বৎসর কিছুকাল গৃহ-শিক্ষকের নিকট পড়িয়া এবং কিছুকাল ফণীবাবুর কল্পিত স্কুলে পড়িয়া কুমারেরা এত অল্পই শিখিবে! কিন্তু বিবাদী পক্ষ যে সমস্ত চিঠি দাখিল করিয়াছেন তাহা পড়িয়া সমস্ত ঘটনা দিবালোকের মতই পরিষ্কার হইয়া যায়। ছোটকুমার বাংলা লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন, উভয় পক্ষই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে,বড় কুমারের মৃত্যুর পর ছোট কুমার সংসারের কর্ত্তা হইয়া পুনরায় ভাল করিয়া বাংলা লিখিতে ও পড়িতে শিখেন। ছয়খানা চিঠি (এঃ ৩৮--৪৩) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্য সমর্থন করিতেছে। এই চিঠিগুলির তারিখ দেওয়া আছে; কিন্তু কোন বৎসরের তাহা লিখা নাই; তবে ভিতরের লিখিত ঘটনা পড়িয়া বোঝা যায় যে এই সব চিঠি কুমারের মৃত্যুর পরে লিখা হয়। একখানা পত্রে পানুর কথা আছে, পানু বড়কুমারের মৃত্যুর পর জন্ম গ্রহণ করেন। ইহারই একখানা পত্রে ছোটকুমার সগর্ব্বে লিখিয়াছেন,—"এখন হইতে আমি আমার নিজের হাতে পত্র লিখি, আমি একটু একটু ইংরেজী ও বলিতে পারি; কিন্তু এখনও ইংরেজী লিখিতে পারি না। আপনাদের উপদেশানুযায়ী আমি এখন হইতে ইংরেজী লিখিতেও শিখিব।"

ছোট কুমার যে পূর্ব্ব হইতেই লিখিতে পারিতেন তাহা প্রমাণ করিতে বিবাদী পক্ষ ২ খানি চিঠি দাখিল করিয়াছেন। ইহার একটী ১৩১৪ সালে লিখা। অপরটাতে মাসের তারিখ আছে কিন্তু বৎসর লেখা নাই (এঃ জেড ১৪৫, ১৪৬)। ছোট কুমার যে পরে নূতন করিয়া লিখিতে ও পড়িতে শিখেন ইহা নূতন কথা নহে। কেননা এই বিষয়ে আলোচনা হইবার পূর্ব্বেই ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে একটী সাক্ষী বলিয়াছেন যে, ছোটকুমারও ঠিক মেজকুমারের মতই মূর্খ ছিলেন,তবে পরে অনেকটা শোধরাইয়াছিলেন। এই দুই সেট্ পত্রের মধ্যে কোন গুলি যথার্থ তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে, বাদীপক্ষের পত্রগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,বহু বৎসর ধরিয়া শিক্ষকের নিকট পড়িয়াও তিনি বিশেষ কিছুই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এই পত্র লিখিবার সময় ছোটকুমারের বয়স ২১ বৎসর ছিল; কিন্তু যে পত্র তিনি লিখিয়াছেন তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে, ছাপান বই পড়িবার পূর্ব্বে লিখিতে সক্ষম শিশু যে ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করে, উহাতে ঠিক সেই ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে। "আমি" "য়ামি" রূপে এবং "আজ" "য়ায" রূপে ঐ চিঠিতে লিখা হইয়াছে। এই চিঠিগুলি হইতেই বোঝা যায় যে ৭ বৎসর যাবৎ গৃহ

যায় উহাই প্রকৃত সম্মান—(এক্সিবিট প্রদর্শনী ৮৯২)। বড় কুমার নিজেই নিরক্ষরের চেয়ে সামান্য একটু উপরে, এবং রায়বাহাদুরের মত অত বড় পণ্ডিতের নিকট সামান্য ইংরাজী মানে কিছুই নয়, সুতরাং বড কুমারকেও উপদেশ দেওয়া হয় নাই—ইহাই বলা হইয়াছে।

(৪) ৯৪৫ নং বাং সাঃ শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের বয়স ৫২ বৎসর। তিনি একজন হাইকোর্টের উকিল এবং পদস্থ ব্যক্তি: তিনি কলিকাতার একজন অধিবাসী এবং নাটোরের মহারাজার জামাতা। তিনি এ পরিবারকে জানেন না। তবে ১৯০২ সালে তিনি ঢাকার 'সুসঙ্গ হাউসে" অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভাওয়াল রাজার ঢাকার বাড়ীতে এক সান্ধ্য ভোজে যোগদান কালে ঐ উপলক্ষে বড় কুমারের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ছোট দুই কুমার ঐ সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন না, এবং মধ্যম কুমার কোথায় ছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি কিছু শুনিয়াছিলেন না। ঐ সম্মিলনে শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয় সুসঙ্গ পরিবারের কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সহিত গিয়াছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের কথা জেরাতে কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলে কুমার তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন, ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অথবা ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে মধ্যম কুমার দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার ল্যান্স্‌ডাউন রোডস্থিত বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দুই জনই যে তখন কলিকাতা ছিলেন, একথা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। দ্বিজেন কলিকাতায় চাকরী করিতেন (দ্রষ্টব্য প্রঃ বি সাঃ ৮৭) সৌভাগ্যবশত—ঐ সময় কলিকাতায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে দ্বিজেনের দেখা হইয়াছিল)। লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন দুই জনেই টম্‌টমে আসিয়াছিলেন এবং দ্বিজেন (লাহিড়ীর সহপাঠী) কুমারকে তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। মধ্যমকুমার লুঙ্গি পরিয়া আসিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কুমার লাহিড়ী মহাশয়কে তাহার বাসায় যাইবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন। সাক্ষী তাহার বাসা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে কুমার বলিয়াছিলেন (ওয়ালিশ আই ষ্ট্রীট) দ্বিজেনবাবু বুঝাইলেন (ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট) এবং সাক্ষীর উহা স্মরণ ছিল: কেননা সাক্ষী কাহাকেও ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটকে ওয়ালিশ ষ্ট্রীট বলিতে শুনেন নাই, (কিন্তু আমি ৪৩ নং প্রঃ সাঃ এক্সিভিট।) ১৯০৮ সালে কুমারেরা কলিকাতায় ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে আসিবার কথা প্রসঙ্গে ঐ রাস্তার নাম 'ওয়ালিশ আই ষ্ট্রীট' বলিতে শুনিয়াছি।

লাহিড়ী মহাশয়কে গুরুতররূপে জেরা করা হইয়াছে, এবং তাহার সাক্ষ্য

এইক্ষণ "ইংরাজী" এবং "কাটা চাম্‌চে" সম্বন্ধে এই সাক্ষীর মুখ দিয়া কি বাহির হইয়াছিল তাহা কিছু শুনা যা'ক্। সাক্ষী বলিয়াছেন ব্যারিষ্টার মিঃ জে, এন, রায় 'পেলিটি'র বাড়ীতে এক সান্ধ্য জলযোগের আয়োজন করেন এবং কুমার তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং "কাঁটা এবং চাম্‌চ" দিয়া জলযোগ করিয়াছিলেন। "কুমারের মত শ্রেণীর লোক কি পেলিটির বাড়ীতে যাইবেন—এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলিয়াছেন—"আমি এরূপ বহু রাজাদের জানি, যাহারা ইংরাজীতে একটীও কথা বলিতে জানে না, এবং "পেলিটী'র বাড়ীতে কিরূপ ভাবে চলিতে হয় তাহাও জানে না, অথচ তাঁহারা পেলিটীর বাড়ীতে যান। সাধারণতঃ যে ব্যক্তি 'টি গডেন" উচ্চারণ করেন তাঁহার পক্ষে অবশ্য 'পেলিটি'র বাড়া যোগ্যস্থান হইবে না, তবে এখানে ব্যাপারটা ছিল অন্যরূপ। কুমার মিঃ রায়কে 'ব্রুহামের' জুড়ী গাড়ী উপহার দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য মিঃ রায় এই সান্ধ্য ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই ভোজে মিঃ গিরিধারীলাল নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং মধ্যম কুমার তাঁহার সহিত হিন্দীতে কথোপকথন করিয়াছিলেন।

এই সাক্ষী "টি গডেন" এইরূপ ইংরেজী তাঁহাকে কেবল মাত্র ঘোড়দৌড় দিবসে কহিতে শুনিয়াছেন, তাহা ব্যতীত আর কখনও মধ্যম কুমারকে ইংরাজীতে কথা বলিতে শুনেন নাই। কুমারের জীবনবীমার প্রস্তাব পত্রে মিঃ জে, এন রায়ের নাম 'বন্ধু'স্থলে লেখা হইয়াছিল, তাহার কারণ পাওয়া গেল। বিবাদীপক্ষ 'ইংরাজী জ্ঞান' প্রমাণ করিবার জন্য সান্ধ্য ভোজের কথা আনিয়াছেন। যদিও শুধু রাজার ছেলেরা কেন রাজারাও ইংরাজী না জানিয়াও ঐ সব ভোজ খাইতে পারেন। দলিলাদির দ্বারা ঐ সব ভোজের সাক্ষ্য খণ্ডন করা হইয়াছে। ঐ সব ভোজ যে ১৯০৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ঘোড়দৌড় দিবসের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সাক্ষী খুব নিশ্চিত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ২৫শে ডিসেম্বর মধ্যম কুমার জয়দেবপুরে ছিলেন, এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সম্পাদক (Secretary) হিসাবে একখানা চিঠিতে সই করিয়াছিলেন।

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়

জয়দেবপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক
সমিতির সম্পাদকের নিকট হইতে

শ্রীযুক্ত সিভিল সার্জ্জন, বরাবর—ঢাকা

২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৫।

দেওয়া হয় তাহা এই যে, কুমার শিক্ষিত এবং খুব আদবকায়দা দুরস্ত ছিলেন। মিঃ কে, সি, দে মহাশয় রেলওয়ে ষ্টেশনে এবং উদ্যানসম্মিলনে যে তিন ভ্রাতার সঙ্গে একত্র কয়েক মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুনিশ্চিত স্মৃতি, অথবা ছোট কুমারকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যখন লেফ্‌টনাণ্ট হোসেন বিলিয়ার্ড খেলার কথা চাপা দিবার জন্য পার্ক ষ্টীটে রাখিয়াছিলেন, এবং যে সব ভোজের কথা জেরায় টিকিতে পারে না এবং যাহার সহিত ঢাকায় মেজকুমারের প্রীতি, তাহার কলেজ জীবনের অজ্ঞাত বিচ্ছেদ দ্বারা চাপা পড়িতে পারিত,—তাহার বিবরণী এই সিদ্ধান্ত সন্দেহের বাতিল করিতে পারে না। মিঃ র‍্যাঙ্কিনের সাক্ষ্য পড়িয়া Tea goden gonএ বিশ্বাস লওয়াইয়া দেয়।

মিঃ র‍্যাঙ্কিনের কথা

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২রা আগষ্ট হইতে তিনি আর ঢাকা জিলার কালেক্টার ছিলেন না, এবং তারপর প্রায় ২৯ বৎসর পরে এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৬ বৎসর পর সাক্ষ্য দিতেছেন। তিনি যখন কালেক্টার ছিলেন তখন এই তিন কুমার মাঝে মাঝে সম্ভ্রম দেখাইবার জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতেন। তাঁহারা প্রায়ই একত্রে আসিতেন, যদিও কখনও কখনও এই নিয়মের অন্যথাচরণ করা হইত। তিনি বলেন যে যখন কনিষ্ঠকুমার দ্বয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, তাঁহাদের সহিত আর এক ব্যক্তি ইংরাজীতে কথা বলিতে সহায়তা করিতে আসিতেন। তাঁহার স্মরণ আছে যে বড় কুমার বেশ তাড়াতাড়ি ইংরাজীতে কথা বলিতে পারিতেন, যদিও তাহার ইংরাজীতে ব্যাকরণের অনেক ভুল থাকিত, এবং দ্বিতীয়কুমার কখনও যে তাহার সহিত একাকী দেখা করিয়াছে বলিয়া তাহার বিশেষ কোন ঘটনার স্মরণ নাই। সুতরাং তাহার স্মৃতি যে কতটা ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত তাহা বলা শক্ত; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাদের সহায়তা করিতে আসিতেন। তিনি সাক্ষ্য প্রদানকালে বলিয়াছেন যে, তাহার উচ্চারণ একজন শিক্ষিত বাঙ্গালীর চেয়ে অনেক খারাপ এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে দ্বিতীয় কুমার তাহার উত্তর দিতেন এবং বড়কুমার সাধারণ-ভাবে কথা বলিতেন—এই সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমার মনে হয় যে, দ্বিতীয় কুমারের ইংরেজীভাষার উপর সামান্য দখল ছিল।

আমি দেখিয়াছি যে ছোট লাটের সহিত দেখা করিবার জন্য যে সব অনুমতি পত্র আসিত, সেগুলি বড়কুমারের নামেই পাঠান হইত, এবং ঐগুলিতে তাহার ভ্রাতাগণের সহিত আসিবার অনুরোধ থাকিত (২ X ২৮৫ – ২৮৫ (৪))।

গিয়াছেন এবং বাদী তাহাকে জেরা করিয়াছেন। তথাপি হ্যাণ্ডনোট একবৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে চাওয়া হয় নাই। এবং যদিও মিঃ সেন সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তিনি ইহা সম্পাদনের সময় উপস্থিত ছিলেন, তথাপি সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন যে বীমা করিবার সময় এবং হ্যাণ্ডনোট সম্পাদনের সময় তাহার ধারণা এইরূপ ছিল যে, কুমার নিরক্ষর ছিলেন, যদি ধরিয়া দেওয়া হয় যে কুমার "দশহাজার" এই শব্দদ্বয় লিখিয়াছেন, তথাপি ইহা বলা চলে না যে কুমারকে অন্য কেহ বানান বলিয়া দেয় নাই। ইহা দ্বারা কোনমতেই ইহা প্রমাণিত হয় না যে কুমার ইংরেজীতে কথা বলিতে পারিতেন। তবে একটি কথা বেশ ভালভাবেই প্রতীয়মান হয় যে তিনি যখন গৃহশিক্ষকের শিক্ষাধীন ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই হস্তলিপি অভ্যাস করিয়াছিলেন অন্যথা তিনি নিজের নাম সই করিতে পারিতেন না। এই বিষয় "হাতের লেখা" শীর্ষক বিষয়ের সম্পর্কে আলোচনার সময় করিব।

বাদীর অঙ্ক-জ্ঞান

আমি কেবলমাত্র আর একটি বিষয়ে বলিব। বাদী জেরার সময় বলিয়াছে যে সে গণনা করিতে জানেনা, এমন কি ১ হইতে ১০ অথবা ১০ হইতে ২০; ৬০ হইতে ৭০ ও গণনা জানে না। সে দুইটি ক্ষুদ্র সংখ্যার বিয়োগফলও বলিতে পারে না। আমি একথা বিশ্বাস করিনা যে, সে গণনা করিতে পারে না। যদিও সে একজন 'প্রতারক' হয় তথাপি সে বহু জিনিসের কথা, এবং পরিমাণ জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করিয়া বলিতেছিল; যথা—এত গুলি হাতী, এতগুলি ঘোড়া এবং ইহাও বিশ্বাস করি না যে মেজকুমার সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে গণনা দরকার, অথবা দিনের ঘণ্টা বলিতে কি বুঝায় তাহা জানেন না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে তিনি বিশেষ কোন সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা করিতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি না যে বাদী ১০ টাকা ২০ টাকা বলিতে কি বুঝায় তাহা জানে না, কারণ নিতান্ত নিরক্ষর ব্যক্তিও সংখ্যা এবং পরিমাণসূচক শব্দ বোঝে, যদিও একক্রমে গণনা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং দ্বিতীয় কুমার দশ টাকা এবং কুড়ি টাকার পার্থক্য জানিত কি না, অথবা সে দশজন লোক এবং কুড়িজন লোকের মধ্যের বিভিন্নতা বুঝিত কি না, এবং যদি কুড়ি টাকা দিতে গিয়া সে দশ টাকা দেয় তবে, উহার পার্থক্য বুঝিতে পারিবে কিনা—এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তাস দেখিয়া সে কুড়ি গণনা করিতে পারে কি না, প্রশ্নেরও কোন মূল্য নাই। যে ব্যক্তির জ্ঞানের পরিমাণ জানা নাই সে ব্যক্তি ঐরূপ

কাগজপত্রে তাহার স্বাক্ষর নাই। বাদীপক্ষের একজন মোসাহেব যতীন (বাঃ সাঃ ৯) ভিন্ন অন্য কোন সাক্ষী তাহাকে বাঙ্গালায় লিখিতে দেখে নাই। যতীন বলে যে একদিন তাহাকে দিয়া বাঙ্গালায় তাহার খুড়ীমার নিকট একখানি চিঠি লিখাইয়া লইয়াছিল এবং উহাতে তিনি বাঙ্গলায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। বিবাদীপক্ষের কেহ দ্বিতীয় কুমারকে বাঙ্গলায় লিখিতে দেখে নাই। তর্কবিষয়ক চিঠিগুলি কুমারের হাতের লেখা ভিন্ন তাহাদের সাক্ষ্য হইতে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, ইহাদের নাম ফণীবাবু, রায় সাহেব (প্রঃ সাঃ ৩১০) ছোটরাণী এবং বীরেন্দ্র (প্রঃ সাঃ ২৯০)। তাহা আমার বিশ্বাস হয় না যে, ইহাদের মধ্যে কেহ দ্বিতীয় কুমারকে বাঙ্গালা লিখিতে দেখিয়াছে। একমাত্র ছোটরাণী বলেন যে, তিনি দ্বিতীয় কুমারকে দ্বিতীয় রাণীর নিকট লিখিত চিঠি দেখিয়াছেন। তাছাড়া অন্য কেহ তাহাকে বাঙ্গালা লিখিতে দেখিয়াছে বলিয়া বলেন না। আমি বিশ্বাস করিনা যে এই মহিলা দ্বিতীয় কুমারের কোন চিঠি কখনও দেখিয়াছেন, এবং তিনি কোন হাতের লেখা পুনঃ পুনঃ না পড়িয়া এবং সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা না করিয়া কোন মতামত প্রকাশ করিবেন। সুতরাং এই বিতর্কিত চিঠির বিষয় একমাত্র দ্বিতীয় রাণীর সাক্ষ্যের উপব নির্ভর করে ; বাদীকে হাবাইবাব জন্যে পত্রগুলি জাল করা হইয়াছে এতদ্ভিন্ন অন্য প্রশ্ন নাই, এই পত্রগুলি আসল হইয়া তাহাকে পরাস্ত করিতেছে।

উপরিউক্ত চিঠির মর্ম্ম সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি যে কুমারগণ স্বল্পকাল অবস্থানের জন্য প্রায়ই ঢাকায় আসিয়া নিজেদের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। এখানে অবস্থানকালে জয়দেবপুর হইতে ঢাকায় পিয়নেরা আসিত, এবং সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে যে অধিকাংশ চিঠিগুলি ঢাকা হইতে সংবাদ বাহকের সঙ্গে জয়দেবপুরে পাঠান হইত। পত্রগুলির তারিখ এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং সেগুলির মর্ম্ম এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে—

(১) ২৫শে শ্রাবণ ১৩০৯—X(৯) Z (১৪২) (১)

লাটসাহেব আগামীকল্য ১২টার সময় আসিবেন, এবং রাত্রি কমিশনারের বাড়ীতে কাটাইবেন। অদ্য অপরাহ্নে কমিশনারের সহিত আমি দেখা করিয়াছিলাম। আমি বাড়ী গিয়া তাহার সহিত আমার যে সব আলাপ হইয়াছে তাহা তোমাকে বলিব।

(২) ৩০শে বৈশাখ ১৩১১—X (7) Z (143).

প্রভাকে, শালী, দ্বিতীয় রাণীর ছোট বোন প্রভৃতি লেখা হইয়াছে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে :—

এতদিন পর্য্যন্ত তোমার নিকট হইতে কোন পত্র না পাইয়া আমি ভাবিয়াছিলাম যে তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছ। আশা করি তুমি আমার নিকট সর্ব্বদা পত্র ব্যবহার করিবে। এই চিঠি হইতে বুঝা যায় যে এই দুইজনের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে চিঠিপত্রের আদান প্রদান ছিল।

(৩) ৯ই শ্রাবণ, ১৩১২ বুধবার—X (৮) Z (১৫২)

ঢাকা হইতে জয়দেবপুর দ্বিতীয় রাণীর বর্ণনানুযায়ী—

অশ্বিনীবাবুর সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিবেন, এবং তিনি যেমন বলিবেন আমরা তদনুযায়ী কাজ করিব। লাটসাহেব আসিবেন কি, না আসিবেন এখনও জানিতে পারি নাই।

চিঠি-পত্রের কথা

(৪) ১২ই ভাদ্র ১৩১২ (২৮।৮।০৫)

ঢাকা হইতে জয়দেবপুর ছোটরাণীর বর্ণনানুযায়ী—বৃষ্টির জন্য মিছিল বাহির হইতে পারে নাই। আমি প্রাতঃকালে নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিব।

(৫) ১৯শে পৌষ, ১৩১২—Ex z (১৪২) (৩)

দ্বিতীয় রাণীর বর্ণনানুযায়ী ঢাকা হইতে জয়দেবপুর অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উল্লেখ আছে যে, চার পাঁচ দিনের পূর্ব্বে আমি গৃহে ফিরিতে পারিব না, কারণ এখনও লাটসাহেব ঢাকায় পৌছেন নাই। তিনি আগামীকল্যের পরের দিন আসিবেন।

(৬) ১১ই শ্রাবণ ১৩১২—

দ্বিতীয় রাণীর বর্ণনানুযায়ী ঢাকা হইতে জয়দেবপুর—

অন্যান্য বিষয় প্রসঙ্গে বলেন—

ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আজ দেখা হইয়াছে। আগামীকল্য স্যাভেজ সাহেব এবং র্যাঙ্কিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিব এবং তাহাদের সহিত দেখা করিয়া ৫টার সময় লাটসাহেবের সহিত দেখা করিব।

(৭) ১২ই শ্রাবণ ১৩১২

অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উল্লেখ আছে ;

লাটসাহেবের সহিত দেখা হইয়াছে। আগামীকল্য র্যাঙ্কিন সাহেবের সহিত দেখা করিব।

(৮) ১৯শে পৌষ ১৩১২

. রাণীর বর্ণনানুযায়ী জয়দেবপুর হইতে কলিকাতা। দ্বিতীয় রাণী তখন

পূর্ব্বে মাত্র বিবাহ হইয়াছে এবং যে অতি দরিদ্র পরিবার হইতে আসিয়াছে; এবং যাহার 'কমিশনার' সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই; এবং তাহার স্বামী কমিশনার কি বলিয়াছে সে বিষয়ে লিখিতেছে ইহা হইতে মনে হয়, যেন দ্বিতীয় কুমার একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোক, এবং সাহেবদের সহিত তাহার বেশ যাতায়াত আছে। কিন্তু ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

একটা বিষয় আমার নিকট অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে কুমার প্রায়ই ঢাকার বাড়ীতে আসিতেন, এবং যদি এই প্রকারের পত্রলিখেন যাহাতে কেবলমাত্র যেগুলিতে পদস্থ ব্যক্তিগণের উল্লেখ আছে সেগুলিই রক্ষিত হইয়াতে। রাণী অবশ্য বলিয়াছেন যে আরও কতকগুলি চিঠি আছে, সেগুলির মধ্যে একটু লঘুতার পরিচয় প্রকাশ পাইবে বলিয়া কোর্টে প্রদর্শন করিবার যোগ্য নয়, কিন্তু তথাপি ইহা অদ্ভুত যে সেগুলির মধ্যে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় নাই, সেগুলি প্রায় এই বিষয় অবলম্বনে লেখা। যদিও এই চিঠিগুলি ছয়বৎসর ব্যাপিয়া লিখিত, তাহা হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহাদের মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্য অথবা লিখনপদ্ধতির বিভিন্নতার বিশেষ অভাব এবং এইগুলির মধ্যে একজন বালক বা একজন যুবক যে তাহার স্ত্রীর নিকট লিখিতেছে ইহার প্রমাণ খুবই কম আছে। এই সময়ের আরও একটি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, যদিও দ্বিতীয় কুমারের সাক্ষ্য সম্বন্ধে কোন শেষ নাই, কিন্তু সে যাহা বলিয়াছে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। যে ভাবে তিনি কথা বলিতেন তদনুরূপ দুই একটি বাক্য আছে কিন্তু এমন কিছুই নাই যাহা হইতে কোন ব্যক্তি এই চিঠিগুলির মর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া রচয়িতার সম্বন্ধে কৃতনিশ্চিত হইতে পারেন। কিন্তু যদি ইহা মনে করা যায় যে তাহার শিক্ষা সামান্য বাংলা পর্য্যন্ত হইয়াছিল এবং ১৩০৭ সালে ইহার পূর্ণ সমাপ্তি হয়, তবে যে কেহ এই চিঠিগুলি সম্বন্ধে এই ধারণা করিবে যে ইহাদের সর্ব্বপ্রথমখানিও তাহার সাধ্যাতীত। যেরূপ এই চিঠিগুলি দ্বিতীয় কুমারের ক্ষমতার বহির্ভূত, সেরূপ তাহার লিখিত চিঠি যেখানি প্রতিবাদিগণের মতে ২৪ বৎসর বয়সে লেখা, সেখানি একটি শিশুর লেখা বলিয়া মনে হয়। কার্য্যতঃ এই দুই ভ্রাতার শিক্ষা প্রায় সমান ছিল, এবং সেইজন্য ফণীবাবু (প্রঃ সাঃ ৯২) বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে ছোট দুই কুমারের শিক্ষাবসানে তাহাদের ইংরেজীতে জ্ঞান প্রায় সমান ছিল এবং তৃতীয় কুমারের বাঙ্গালায় দখল অপেক্ষাকৃত কম। যদি ছোটকুমারের চিঠিগুলিকে দ্বিতীয় কুমারের লেখার ক্ষমতার মাপকাঠি বলিয়া ধরা হয়; তাহা হইলে তাহার পক্ষে আলোচ্য চিঠিগুলি লেখা অসম্ভব।

(৩) দুইজন হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ এই চিঠিগুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। দুইজন হস্তলিপি বিশারদ এই চিঠিগুলি সম্বন্ধে এবং মেজকুমার (Ex. 2) যাহা তাঁহারই স্বাক্ষর বলিয়া স্বীকৃত—এবং বাদীর আর কতকগুলি বাঙ্গালা স্বাক্ষর সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ এস, সি, চৌধুরীর অভিমত এই যে ইহাই যদি তাঁহার (বাদীর) স্বাভাবিক স্বাক্ষর হয়, তাহা হইলে (Ex. 2) এবং বাদীর স্বাক্ষরগুলি একই হাতের; প্রতিবাদী পক্ষের মিঃ হার্ডলেস্-এর অভিমত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐ সকল মতামতের কারণ বিবেচনা করিয়া আমি এ বিষয়ে নিম্নলিখিত রূপ পর্য্যালোচনা করিতেছি: মিঃ চৌধুরীর অভিমতই ঠিক। ইহা বুঝা যাইবে, যে এই দুইজন বিশেষজ্ঞই যুক্তির ভিত্তি সম্পর্কে একমত, এবং ইহাতে একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই পৌঁছান যায়; কিন্তু মিঃ হার্ডলেস্ তাহা স্বীকার করিবেন না। তিনি সুস্পষ্ট বিচারের ভিত্তি প্রমাণ এবং যুক্তিগুলিকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, কিন্তু যুক্তিগুলি যদিও স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি সিদ্ধান্তটিকে এড়াইবার জন্য সেগুলিকে বরাবর বদ্‌লাইয়া ধরিয়াছেন।

আমার মনে হয় যে এই আলোচ্য বিতর্কিত পত্রগুলি আসল নহে; সেগুলি মেজকুমারের লেখা নহে। এসকল কথা ছাড়িয়া দিলেও, বাস্তবিক পক্ষে মেজকুমার যে শুধু নাম সহি করা ছাড়া বাঙ্গালার কখনও কিছু লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে প্রমাণের একেবারে অভাব; এবং যদিও যাহা করিয়াছেন তাহা এতো কদাচিৎ যে অতি অল্পলোকেই তাঁহাকে ইহা করিতে দেখিয়াছে। এখন যে বিষয়টি বিবেচ্য তাহা এই যে, তিনি তাঁহার গৃহশিক্ষকদের নিকট যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহাতে এমন কি নামের বানান না জানিয়া মাত্র নাম সহি করিতে পারা ছাড়া তাঁহাকে একেবারে নিরক্ষর করিয়া তুলিয়াছিল কি না। ইহা হইতেই পরের বিষয়টিতে যাওয়া যাইবে।

বাদীর এবং মেজকুমারের হস্তলিপি

বাদীর পূর্ব্বতন স্বাক্ষরগুলি আদালতে যাহা উপস্থিত করা হইয়াছে, সেইগুলির বিষয় বলিতে গেলে বাদীর সর্ব্বপ্রথম সহি ১৯২৯ সালে এক জমি রেজেষ্ট্রী মামলায় দাখিলী দুইটী ওকালত নামা ও কতিপয় দরখাস্তের উপর রহিয়াছে (একজিবিট পি, সিরিজ)। পরবর্ত্তী তারিখের সহি সমূহ ৮।১২।২৬ তারিখে রেভিনিউ বোর্ডে প্রদত্ত তাঁহার আবেদনে ১৯টী স্বাক্ষর। পরবর্ত্তী তারিখের সহিগুলি হইতে ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আদালতে

যাহা আকৃতিগত নয়, এবং মনে করিয়াছিলেন যে অনুকরণকারী তাহার প্রতিলিপি করিতে পারিত না, এবং দৌর্ব্বল্য বা বার্দ্ধক্যের চিহ্নটীও দিতে পারিত না।

পূর্ব্বোক্ত লিখিত প্রার্থনামত যে বিশেষজ্ঞ এই মত দিতে পারিয়াছিলেন যে কতকটা বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিল। অবশ্য এইমত রেভেনিউ বোর্ডের নিকট হইতে গোপন রাখা হইয়াছিল। সত্যবাবু বলেন যে, ইহা গোপনে পাঠান হয় নাই। কারণ ইহা চুড়ান্ত ছিল না। মিষ্টার এস, সি, চৌধুরী বাদী কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন, এবং উহার লক্ষ্য একই বিবেচনা করা যাইবে। আহূত হইবার পূর্ব্বে তিনি আর দুইটী লিখিত প্রার্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে মিষ্টার পঙ্কজকুমার ঘোষ বিবাদীর পক্ষে তাঁহার সমক্ষে ৬ খানি বিবাদস্থানীয় বাংলা চিঠি, (একজিবিট নং ২) ও আমি বাদীর যে বাংলা স্বাক্ষরের কথা বলিয়াছি এইগুলি স্থাপন করেন এবং তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁহাকে যে মত দিয়াছিলেন তাহা এই যে—২নং একজিবিটের লেখকের যদি এই সাধারণ সহি হয়, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা এই চিঠিগুলি লেখা হইতে পারে না এবং বাদীর সহিগুলি সেই হস্ত দ্বারাই লেখা হইতে পারে (তাহাকে বলা হয় নাই যে, সেগুলি বাদীরই স্বাক্ষর)।

৯ই জানুয়ারী বা সেইরূপ সময়ে দুই সেট্ ইংরেজী সহি ও বাংলা লেখা গুলির সম্বন্ধে মত জানিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। মিষ্টার চৌধুরী বাংলা লেখাগুলিতে তাঁহার মত দিতে অস্বীকার করেন। কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বে মত দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজী সেট গুলির মধ্যে নূতন উপাদান ছিল বলিয়া তিনি মত দিলেন, যে সেগুলি একই হাতের লেখা।

তাঁহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে কতিপয় সহজ বাহ্যাকার ও স্বতঃসিদ্ধ উৎপত্তির উল্লেখ করা আবশ্যক। অনুকরণকারী বাহ্যাকার বা তাহার কতকটা আয়ত্ত্ব করিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার নিজস্ব লিখিবার ধরণ আছে বলিয়া সে তাহার অজ্ঞাতসারে অনুকরণের মধ্যে তাহার অভ্যাসের এমন চিহ্ন বলিয়া যায়, যাহা আসল জিনিষ ছিল না। এইগুলিকে বলে মৌখিক লক্ষণ। আপত্তিজনকই হউক আর আদর্শই হউক সুদীর্ঘ দলিলাদির সময়ে বিরাম লিখিবার অভ্যাস কিংবা অপরিবর্ত্তনশীল অক্ষরও এই অর্থে মৌলিক হইতে পারে, কিন্তু আসল ব্যাপার হইতেছে গতিশীলতা, যদি দুইটি লেখা গতির পার্থক্য প্রকাশ করে।

লেখকের লেখা সাক্ষ্য: একজিবিট্ নং ২এর রেখা বিন্যাস উপরের দিকে হেলান; আর বিতর্কনীয় পত্রগুলির লাইন সোজা, যদিও সেগুলি কাগজের সমস্ত প্রস্থ ব্যাপিয়া চলিয়াছে, তথাপি তাহারা সমান্তরাল, তাহারা বেগদ্যোতক, তাহাদের রেখা গুণ উত্তম চাপের গতি নিয়মিত, এবং সুন্দর সূচালো অগ্র ভাগের আভাস রহিয়াছে, সবদিকে বিবেচনা করিলে ইহা উৎকৃষ্টধরণের লেখা।

কি ভাবে কিরূপ লেখা হয়

আলিপুর বারের মিষ্টার মুখার্জ্জী এই বিশেষ তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি মিষ্টার চৌধুরীকে জেরা করেন। এই জেরা করিবার পূর্ব্বে তিনি যে জেরা করিতে যাইতেছেন তাহা না বলিয়া তাঁহার সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করেন। যে প্রশ্নে উত্তর প্রকারান্তরে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয় সেইরূপ প্রশ্নের দ্বারা তিনি অঙ্গুলি, কব্জি ও বাহুর অগ্রভাগ দ্বারা লেখার চিহ্নগুলি বাহির করিয়া লইয়া ছিলেন, এবং সেইরূপ করার পর ব্যাপারটী এই ভাবে দাঁড় করাইলেন যে একজিবিট নং ২টী অবশ্য কব্জির দ্বারা লেখা, কিন্তু তর্কবিষয়পূর্ণ চিঠিগুলি কব্জি লিপি আর বাদীর স্বাক্ষরগুলি অঙ্গুলিলিপি। তিনি বাহির করিলেন যে একজিবিট নং ২ উৎকৃষ্টতর ও শোভনতর বক্রতা প্রদর্শন করিতেছে, এবং অঙ্গুলি অপেক্ষা অধিকতর পরিসর দেখাইতেছে। এবং তিনি বাদীর স্বাক্ষর গুলিতে চিহ্ন বাহির করিতে চেষ্টা করিতেন ইহা দেখাইতেন যে এগুলি এক নিরক্ষর লোকের অঙ্গুলিলিপি। ইহা নিশ্চয়ই বোধ হইয়াছিল যে এরূপ তর্ক করা অসম্ভব হইবে যে, বিতর্কময় পত্রগুলি কব্জিলিপি, সুতরাং— মিষ্টার হার্ডলেস্ এই বলিলেন যে বিতর্কযুক্ত পত্রগুলি অবশ্য বাহু লিপি, কিন্তু একজিবিট নং ২ (কুমারের স্বাক্ষর) ও বাহুলিপি। বিতর্কযুক্ত পত্রগুলি সম্বন্ধে তিনি তাহাদের প্রশংসায় প্রায় মুখর হইয়া উঠিলেন এমন কি তাহাতে বিবাদীপক্ষের ভীতির সঞ্চার হইল, সুতরাং মধ্যাহ্নে জলযোগের পর তিনি ইহা কতকটা কমাইলেন, কিন্তু তাঁহার মত এখনও এই যে সেগুলি অসাধারণ কৌশল প্রদর্শন করিতেছে এবং সেগুলি বাহুলিপি ও অঙ্গুলিলিপি। ঠিক যেমন মিষ্টার চৌধুরীও বলিয়াছেন সেগুলি সুন্দর বক্রতা প্রদর্শন করিতেছে, তাহাদের সোজা লাইনগুলি ঠিক এরূপভাবে মোটা যে তিনি একথা বলিতে সক্ষম যে, "যতই কেন পারদর্শী হউক না অতি অল্প লোকই তাহাদের পার্শ্বিক টানগুলি এই লেখকের মত এতটা সুদীর্ঘভাবে বরাবর একরূপ মোটা রাখিতে পারে।" মিষ্টার এস, সি চৌধুরীর ঠিক ইহাই মত এবং তাঁহার এই

মিঃ হার্ডলেস গেভির এই বিভিন্নতা ছাড়াও বাদীর ও কুমারের স্বাক্ষরের মধ্যে বহুসংখ্যক বিভিন্নতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলির কোনটীই মূলগত নহে। সেগুলি একই ব্যক্তির দুইটী স্বাক্ষরের মধ্যে দেখা যাইতে পারে; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এবং সমস্তগুলিই বহুবর্ষের ব্যবধান গত দুইটী স্বাক্ষরের মধ্যে দেখা যাইতে পারে, বিশেষতঃ এই বহুবর্ষ ধরিয়া যখন লেখার কাজ বন্ধ ছিল আমি এই সকল বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিতে চাহি না এবং মানুষের লেখার উপর বার্দ্ধক্য, অনভ্যাস বা দৌর্ব্বল্যের ফল গণনা করিতে চেষ্টা করিব না, কারণ মিঃ হার্ডলেসের সাক্ষ্যই সপ্রমাণ করিয়াছে যে বাদী ও কুমারের স্বাক্ষরগুলি একই হাতের লেখা। আমি এখনই সেই সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বর্ণনা করিতেছি।

পত্রগুলির বিস্তৃত বর্ণনা

ইহা স্মরণ থাকিতে পারে যে রেভিনিউ বোর্ডে যে আবেদন পাঠান হইয়াছিল তাহাতে বাদীর ১৯টী স্বাক্ষর ছিল, এবং ১৯২৯ সালে দাখিলা দলিলে কতকগুলি স্বাক্ষর ছিল, এবং কতগুলি স্বাক্ষর বিচারের সময় আদালতে লেখা হইয়াছিল, আর কতকগুলি কোর্টে দাখিল করা হইয়াছিল কিন্তু যখন লেখা হইয়াছিল তাহা কেহ জানেন না। এক্ষণে মিঃ হার্ডলেস তাঁহার চার্টে আবেদন হইতে ৭টী স্বাক্ষর লইয়া আঁটাদিয়া বসাইয়াছেন এবং তাহার নীচে ১৭টী স্বাক্ষর বসাইয়াছেন যাহার মধ্যে ১৯২৯, ১৯৩০ ও ১৯৩৩ সালের লেখা স্বাক্ষর আছে। এই সমস্ত পাইনরকে পি পর্য্যায় বলা যাইতে পারে, এগুলি ঐ একই চার্টের বামদিকে কাগজে লাগান আছে; সুতরাং যে কেহ দুইটী পাইয়াই পাশাপাশি দেখিতে পারে। বিবাদীদিগের মধ্যে আবেদন মধ্যহইতে গৃহীত ৭টী স্বাক্ষরকে জে পর্য্যায় বলা যাইতে পারে, এবং তাহাই বলা হইয়াছে।

মিঃ হার্ডলেস্ জে পর্য্যায় সহ পি পর্য্যায় এক হাতের লেখা। এবং তিনি আরও বলিতেছেন :—

(১) কে পর্য্যায়ের একটী স্বাক্ষরের মত নমুনা হইতে জে পর্য্যায় নিশ্চয়ই নকল করা হইয়াছে। যেগুলি আস্তে আস্তে ও যত্ন করিয়া লেখা এবং উপরের ও নীচের টান গুলি ঠিক একই রূপ মোটা, যেন লেখক ড্রয়িং আঁকিতে ছিলেন।

(২) পি পর্য্যায়ে বাকী গুলি নমুনা না দেখিয়া আনাড়ি লোকের সহজ স্বাভাবিক লেখা।

(৩) যে পর্য্যায়ের কতকগুলি নিজস্ব একরূপতা আছে, জে পর্য্যায়ের

আবির্ভাবের পর তাহাকে লেখা শেখান হয় নাই কিন্তু সে ইংরেজী ও বাংলা স্বাক্ষর অন্তত: ১টা অক্ষরের ক্ষীণ স্মৃতিসহ লিখিয়া থাকে। মিঃ হার্ডলেস যে লেখার অভ্যাস সম্বন্ধে বলিতেছেন এবং যাহার পরিমাণ তিনি এইরূপ দিয়াছেন যে 'এ' হইতে 'জেড্' পর্য্যন্ত ধরিলে যোগ্যতা অনুসারে তাহার স্থান 'ডাব্লিউ' অক্ষরে পড়ে। এই লেখার অভ্যাস তাহার দার্জ্জিলিং গমনের আগের দিন হইতে চলিয়া অসিতেছে। এবং তাহার স্বাক্ষরগুলি ঐ সমস্ত দিনগুলির অবশিষ্টাংশ। ইহাতে আমার ই, বি, ফ্লোটিলা কোং লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টর মিষ্টার হলধর রায়ের এই সাক্ষ্যে মনে পড়িতেছে যে অন্তত: ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে, যদি আরও পূর্ব্বে না হয় (একজিবিট নং ২৪ দ্রষ্টব্য), বাদী ঐ কোম্পানীর প্রথম ডিরেক্টারগণের মধ্যে একজন ছিলেন এবং তিনিও হয়ত রায়ের মতই মিষ্টার সহি করিতেন। বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী মিষ্টার চৌধুরী জেরায় এই কথা বাহির করেন। এই তর্ক উপস্থিত করা হইয়াছিল যে বাদী যদি কুমার হইত তাহা হইলে অক্ষরগুলি ভুলিয়া যাইত না। যেহেত কেহই ভোলে না। অন্যান্য জ্ঞানের ন্যায় অক্ষর জ্ঞানও বিস্মৃত হওয়া যায় এবং সামান্য মাত্র অক্ষর পরিচয় হইতে নিরক্ষরতা প্রাপ্তি একটী সাধারণ ও সহজবোধ্য অভিজ্ঞতা, এবং ইহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপকের সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই। যিনি একটী প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করিবেন। যে কেহ উর্দ্দু কিংবা সংস্কৃত শিখিতে চেষ্টা করিয়াছে বা শিখিয়াছিল এবং সামান্য বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে নিরপবতা প্রাপ্তি ও তৎসহ স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতা বজায় রাখা সংঘটিত হয়। যদি সে সহি করিতে থাকে ; কিন্তু অন্য কোন লেখা পড়া করে না ; এবং এইরূপে অবশেষে স্বাক্ষরটি একটি চিহ্নে পরিণত হয় এবং যে স্মৃতি হইতে চলিয়া যায় বিশেষতঃ যদি স্বাক্ষর ও বহু বৎসর ধরিয়া লেখা না হয়।

আমার মতে মেজকুমারের ও বাদীর যে স্বাক্ষরগুলি দুইজন বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে ইহা একই হাতের লেখা এবং এস, সি চৌধুরী ঠিকই বলিয়াছেন।

এই বর্ণ পরিচয়ের অজ্ঞতা, জবানবন্দীতে যে পোলো খেলা সম্বন্ধে অজ্ঞতা তাহারই মত, এই সম্পূর্ণ অজ্ঞতা তাহাই দৃঢ়ীকৃত করে যে শেখান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অস্পৃশ্য রহিয়াছে ; এবং রেভেনিউবোর্ডে বিকৃত ফটো পাঠানর মত লোকটীর সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইলে ইহা কেহই করিত না।

বাদীর জেরার যে অংশে সে বাঙ্গালী নয় দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে সে অংশের এখনও আমি আলোচনা করি নাই। ইহার অধিকাংশই কথার

যে এইগুলির ফলে বাদীর সাপক্ষে বিচার হইয়াছিল। আমার এইরূপ মত না— যে উহা দ্বারাই ঐ সাক্ষ্য বাদীর স্বীকারোক্তি হইবে, কারণ সে উহাতে সাক্ষ্য ছিল না, যেমন এই আদালতে সাক্ষীরা যাহা বর্ণনা করিয়াছে উহা যে পক্ষ দ্বারা ঐ সাক্ষিগণ আহূত হইয়াছিল, তাহাদের স্বীকারোক্তিতে ইহা প্রমাণিত হইতে পারে না।

বাদীর কতগুলি স্বীকারোক্তি আছে যাহা বাদী সন্ন্যাসী জীবনের যে বর্ণনা দিয়াছে। তৎসংক্রান্ত কিংবা আমি তাহার যে কথা আটকাইয়া যাওয়ার উল্লেখ করিয়াছি তাহার সে যে কারণ দিয়াছে তৎসংক্রান্ত। এগুলি সেই সেই দফায় বিবেচিত হইবে। যে সাক্ষ্য দ্বারা মেজরাণীর আচরণ বা স্বীকারোক্তি প্রদর্শন করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিতগুলি লক্ষ্য করিতেছি। ফণী বাবুর খুড়ী কমলকামিনী দেবী সাক্ষ্য দিতেছেন যে, বাদী আসিয়া উপস্থিত হইবার পর, কলিকাতায় মেজরাণীর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। রাণী ইহা অস্বীকার করিতেছেন। কিন্তু কথাবার্ত্তায় এমন স্বীকারোক্তি প্রকাশ পাইতেছে না। মিথ্যা সাক্ষী বেশী করিয়া দিলে যাহাতে এবিষয়ে কিছুই বলিবার প্রয়োজন থাকে না।

মেজকুমারের মামী সুধাংশুবালা দেবী বলিতেছেন যে তিনি কলিকাতায় বাদীর গৃহে বাসকালীন কলিকাতায় মেজরাণীর গৃহে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি জেরায় বলিতেছেন যে, তিনি যখন বাদীকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন প্রত্যেকেই এমনকি বাদী ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও ইহা জানিতেন। তিনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি লোকটিকে চিনিতে পারিয়াছেন এবং এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে লোকটি মেজকুমার। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "খুকী একবার মেজ খোকাকে দেখ।" তিনি বলিয়াছিলেন, "কি দরকার। দাদার কিংবা আর কারও কাছে শুনিয়াছি যে সে, সে লোক নয়। কিন্তু সে একজন পাঞ্জাবী, মহিলার সাক্ষাৎকারের কথা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার উক্তি বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিতেছেন। ইহাকে স্বীকারোক্তি বলা চলে না। এবং কথাবার্ত্তায় ভিন্ন প্রকার বিবৃতি দিতেছেন। ইহার উপর কিছুই সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু রাণীর নিজের বৈপরীত্য ইহার সারাংশ পরিত্যাগ করিতেছে। তিনি স্বীকার করিতেছেন সুধাংশু বালা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তুমি তাহাকে একবার দেখ না? রাণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাহাকে যদি দেখার দরকার হইত তিনি তাহা করিতেন এবং তাঁহার বলার অপেক্ষা করিতেন না, এবং তা ছাড়া তিনি

তাঁহাকে দেখিয়াছেন ইত্যাদি। তিনি আরও বলিতেছেন যে সুধাংশুবালাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ী হইতে আসিযাছেন। এই স্বীকারোক্তিতে কিছুই নাই। যদিও কিছুই অসম্ভব নহে। ইহা আদৌ বলা চলে না যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যদি জানিয়া শুনিয়াই একজন প্রতারককে খাড়া করিয়াছিলেন তাহা হইলে তিনি এই মহিলাকে (সুধাংশুবালাকে) রাণীকে হাত করিবার জন্য রাণীর নিকট পাঠাইযাছিলেন। ইহাতে আমি দেখিতে পাই উহারা আশা করিয়াছিলেন যে তাহাকে দেখিয়া পত্নীর হৃদয় হয়ত স্বামীর জন্য বিগলিত হইবে এবং ভ্রাতার (সত্যর) অবাধ্য হইয়াই চলিবে।

রাণীর কুমার দর্শন কথা

সাক্ষ্য প্রদানকালে রাণী আদালতকে বলিয়াছেন, তিনি কিরূপে এবং কখন বাদীকে দেখিয়াছিলেন। ইহা বাদীর কলিকাতায় অবস্থান কালে এবং আমরা জানি যে উহা ১৯২৪ হইতে ১৯২৪ হইতে ১০২৯ সালের কোন একটা তারিখ পর্য্যন্ত। তিনি প্রথম তাহাকে দেখেন যখন সে ও বুদ্ধু তাঁহার বাড়ীর সামনে দিয়া আস্তে আস্তে ফিটনে চড়িয়া যাইতেছিল। তিনি রাস্তার সামনেই গাড়ী বারান্দায় ছিলেন, গাড়ী বারান্দাটী খোলা ও যেখানে পথি পার্শ্বের কৃষ্ণচূড়া গাছের দ্বারা কতকটা ঢাকা। ফিটন আস্তে আস্তে আসিয়া তাঁহার বাড়ীর সামনেই দাঁড়াইল। বুদ্ধু তাঁহাকে দেখাইয়া দিল এবং বাদী পিছন ফিরিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে ফিরিল। ফিটন সেখানে পাচ মিনিট দাঁড়াইয়াছিল। এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই সময়ে এবং সেই স্থানেই দ্বিতীয় বার দেখা হয়। এবারও ফিটন দাড়াইয়াছিল, বাদী এইরূপে অনেকবার তাঁহার বাড়ীর সামনে দিয়া যাওয়া আসা করিয়াছিল, কিন্তু ফিটন থামে নাই, এই সকল সময়েও তাহারা সম্ভবতঃ তাঁহাকে (কুমারকে) দেখিয়াছিল।

মেজোরাণী আরও বলিতেছেন বাদী ও রাণী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে পরস্পরকে দেখিয়াছিল, এই সময়ে তিনি একটা মোটরগাড়ী বা ল্যাণ্ডোতে যাইতেছিলেন, আর বাদী একটী ট্যাক্সিতে যাইতেছিলেন, কিংবা বেড়াইতে ছিলেন, এবং গঙ্গার ধারে লোকে সন্ধ্যায় যেখানে বেড়াইতে যায় সেখানেও তাহারা পরস্পরকে দেখিয়াছিলেন, আর অনেক পরে একবার কলেজস্কোয়ারের নিকটে দেখিয়াছিলেন।

মিষ্টার চাটার্জ্জী এই সময়গুলিতে দেখিতেছেন যে চিনিবার ভাব এবং রমণী হৃদয়ের প্রবল আগ্রহ না হউক অন্ততঃ কৌতূহল

যাদব বসাকের সহিত সাক্ষাৎকার, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যক্তি বিশেষের সাক্ষ্যের উপর মোকদ্দমার বিচার হইবেনা, যদিনা উহাস্বীকারোক্তি ও অখণ্ডনীয় ঘটনা দ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারে।

এতদূর পর্য্যন্ত আমি বাদীর দেহ ও দেহের প্রত্যেক অংশ পরিষ্কার করিয়া দেখিয়া এমন কিছুই দেখিনাই, যাহা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের দ্বারা এবং যে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমবায় কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া যায় না। উহাদ্বারা প্রমাণিত সনাক্তকে বিভ্রান্ত করে। আমি দেখিয়াছি হস্তলিপি একই এবং বাদীকে মোটেই কোন লিখান পড়ান হয় নাই। আমি বিবাদীপক্ষের অর্থপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করিতেছি। উদাহরণস্বরূপ ডাক্তারি রিপোর্টের 'ভয়' অর্থাৎ যে ভয়ে সত্যবাবু সনাক্ত প্রকাশ করার ২।১ দিনের মধ্যেই মিঃ লেথব্রিজকে মৃত্যুর সাক্ষ্য অক্ষুন্ন রাখিবার অনুরোধ করিয়াছিল, এবং অপর যে কতিপয় বিষয়ের আমি উল্লেখ করিয়াছি এবং যাহা আমি উপসংহারের সময় পুনরায় উল্লেখ করিব এবং যেন সবগুলিই বাহির হইয়া পড়িবে। আমার মতে কিছুই সনাক্তকে বিচ্যুত করিতে পারে না, যদি না ইহা প্রকাশ পায় যে, মেজকুমার দার্জ্জিলিংএ মরিয়াছিলেন, কিংবা বাদী আউজলার মালসিং, কিংবা আদৌ বাঙ্গালী নহে। দার্জ্জিলিং এর আসার উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে আর দুইটী ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাদী মেজ-রাণীর দেহের তিনটী চিহ্নের উল্লেখ করিয়াছেন উহাদের মধ্যে দুইটি পরিবারের সকলেই নিকটেই বিদিত। সুতরাং এই দুইটি চিহ্ন জানা থাকিলে কিছুই প্রমাণ হয় না। সে যে তৃতীয় চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেটি যদি বিদ্যমান থাকিয়া যায় তবে তাহা কেবল রাণীর স্বামীরই জানা থাকিতে পারে। তিনি এই চিহ্ন অস্বীকার করিতেছেন, এবং এক পক্ষ জোর করিয়া বলিতেছে ও আর একপক্ষ অস্বীকার করিতেছে। এক্ষেত্রে এবিষয়ের কোনই মূল্য আছে বুঝি না।

আমি জানিনা কি কারণে মিঃ চৌধুরী কুমারের ভাগিনেয়ের নিকট একটি প্রশ্ন করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন **মেজরাণী একবার গর্ভধারণ করিয়াছিলেন একথা সত্য কিনা?** বিল্লু কখনও একথা শুনে নাই, এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে আগের সাক্ষ্যদিতে ডাকা হইল, যাহাতে তাঁহাকে আগে একবার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

রাণী যে কোনকালে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি অস্বীকার করিলেন। এবং মিষ্টার চৌধুরী জেরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিন মাসের জন্য মাসিক ঋতু বন্ধ হইলে তাহা ননদের পক্ষে জানা সম্ভবপর কিনা?

এবং সে মৃত মেকৃবিনের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। মুকুন্দ ও বীরেন্দ্র মেজকুমারের হিসাব রাখিত এবং দার্জ্জিলিংএও তাহারা হিসাব রাখিয়াছিল। বীরেন্দ্র বলে যে প্রায় ৮ মাস পূর্ব্বে সে নিযুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কুমারের কেরাণীরূপে মুকুন্দ এষ্টেটের কর্ম্মচারীর কাজে সম্প্রতি যোগ দিয়াছিল, এবং তাঁহার ভাই বলে সে বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। সত্যবাবু বি, এ পাশ করিয়া বি, এল, পড়িতেছিল।

ষ্টেপ এসাইড বাড়ীর কথা

এই দল ষ্টেপ্ এসাইড্ বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল, চৌরাস্তা হইতে রঞ্জিৎ রোড ধরিয়া যাইতে বাম দিকে ইহাই প্রথম বাড়ী। নথীতে দার্জ্জিলিঙের একটি বর্ত্তমান ম্যাপ রহিয়াছে, এবং ইহাতে এই বাড়ীটী অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা ২০১নং বাড়ী। একখানি দ্বিতল গৃহ, প্রত্যেক তলায় পাঁচটী করিয়া কক্ষ এবং উত্তর দক্ষিণে লম্বা, রঞ্জিৎ রোডের সহিত সমান্তরাল। দুই তলারই সামনের কক্ষগুলি দক্ষিণ দিকে মুখ আছে এবং বাড়ীর সামনে একটি ছোট কম্পাউণ্ড ও ছোট ফুলবাগান। রাস্তা হইতে কম্পাউণ্ডে ঢুকিতেই রাস্তার উপরেই একটী গেট পার হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। একটী বারান্দা দুই তলায় পাঁচটী কক্ষ হইতেই সমস্ত অট্টালিকাটীর দৈর্ঘ ধরিয়া অবস্থিত। বাড়ীর পিছনদিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে একটু জায়গা, পরে চাকরাণ বা চাকরদিগের বাসস্থান ও রান্নাঘর, এবং এগুলির জন্য হইতে একটী পৃথক রাস্তা ছিল।

নিম্নের নক্সার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই দোতালার কক্ষগুলির অবস্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে।

১ হইতে ৫—বারান্দামুখী কক্ষগুলি

৬—রাস্তার ধারের বারান্দা

৭—সামনে একটী সংকীর্ণ বারান্দা

—চাকরদের বাসস্থান—

—দোতালায় ৭নং বারান্দা পর্য্যন্ত এক পার্ব্বত্যপথ গিয়াছে। এই হইল দোতালা এবং নীচের তলায় অনুরূপ কক্ষের কথা। গৃহের পিছনের রাস্তাটী একজায়গায় বাঁকিয়া আছে এবং তদনুসারে রাস্তার ধারের বারান্দাটীও বাঁকিয়াছে। বাড়িটী পশ্চিম দিকে একটী পাহাড়ের গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং সেই পাহাড়ে 'পিকোটিপ্' নামে একটী বাড়ীও রহিয়াছে।

ফটকের সামনে কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিয়াই একটী পার্ব্বত্য পথ দেখা যাইবে, এবং এই পথ ধরিয়া গেলে ৭ নম্বরের একটী ছোট বারান্দায় যাওয়া

অঞ্চলে ১৯০৯ সালের মে মাসের পর বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং শবদাহ ভূমির সম্বন্ধে বিবাদী পক্ষে দলিল পত্রাদি দাখিল করিবার পর এবং বাদীর দ্বারা উপস্থাপিত ম্যাপের সহিত পড়ার পর, বিবাদী পক্ষে ১৯০৯ সালের পরে যাহার উদ্ভব হইয়াছে সেইরূপ ব্যাপার ১৯০৯ সালে আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ১নং মলভিলায় ১৯০৯ সালের মে মাসে কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বাস করিতেছিলেন।

দার্জ্জিলিঙে রাস্তা পরিচয়

ইহা দৃষ্ট হইবে যে গাড়ীর রাস্তা দার্জ্জিলিঙের মধ্য দিয়া গিয়াছে। দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে যেস্থানকে মালগুদাম বলে, সেই পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কিন্তু আরোহীগণের জন্য ষ্টেশনে আমি যে স্থান চিহ্নিত করিয়াছি, সেই স্থানের নিকটে, কিন্তু সেনিটোরিয়াম লুইস্ জুবিলি অপেক্ষাকৃত নিম্নতলে অবস্থিত, এই সেনিটোরিয়ামে যে সকল অবস্থাপন্ন ভারতবাসী বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিঙ আসেন তাহারা বাস করেন। ইহাও দৃষ্ট হইবে যে চৌরাস্তায় উঠিয়া আসিবার সময় ষ্টেপ এসাইড্ হইতে তুমি তোমার বামদিকে কমার্শ্যাল রো নামক একটী রাস্তা দেখিতে পাইবে। এই রাস্তায় উঠিয়া যাও এবং উহা যেখানে রবার্টসন রোড্ ও অকল্যাণ্ড রোডের সহিত মিশিয়াছে সেই স্থলে আইস। তুমি রবার্টসন রোড্ ধরিয়া কতকটা নীচের দিকে যাও এবং তারপর লয়েড্ রোড ধরিয়া কিছুদূরে যাও এবং তুমি দেখিবে তুমি মালগুদামের নিকটস্থ গাড়ীর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছ। মালগুদামে পশ্চিমের দিকে একটী রাস্তা গিয়াছে, ইহার নাম ফার্ণভেন রোড্,' তুমি এই রাস্তাটী ধরিয়া যাও এবং তারপর কনজারভেন্সী রাস্তায় গিয়া পড় তারপর এই আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরিয়া গিয়া ভিক্টোরিয়া রোডে পড়িবে এবং ভিক্টোরিয়া রোড ধরিয়া কিছুদূর গেলে তুমি তোমার বামদিকে একটী হাঁটা রাস্তা পাইবে ; যাহা শ্মশান পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই হাঁটা রাস্তা কিংবা তিনফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, যাহার দুইপাশে গাছ ও ঝোপ জঙ্গল এবং স্থানে স্থানে যাহাতে দুইটী লোক পাশাপাশি চলিতে পারে না। ১৯০৯ সালে উহারই নাম ছিল সুধীর কুমারী রোড্। এই পর্য্যন্ত কোনই বিতর্ক নাই এবং এই বর্ণনায় আমি কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান সন্নিবিষ্ট করি নাই। বিবাদী আর্য্য-হিন্দু-শবদাহ-সমিতির যে দীর্ঘ বিবরণ দাখিল করিয়াছে, তাহার সহিত এবং ১৯২২ সালে নিউ সুধীর কুমারী রোড্ খুলিবার পূর্ব্বে যে সব চিঠিপত্র লেখা হইয়াছিল তাহার সহিত সেগুলি আমি নক্সাতেও সূচিত করিয়াছি। এই ম্যাপের সহিত সাক্ষ্য পাঠ

উচ্চতা সম্বন্ধে কোন সঠিক সাক্ষ্য নাই তথাপি দুইটী ঝোড়া উপত্যকার একটু পশ্চিম দিকে মিশিয়াছে, যদিও দার্জ্জিলিং প্রায় ৬৮০০ ফিট উচ্চ।

কুমার ও তাঁহার দলবল ২০শে এপ্রিল দার্জ্জিলিং পৌঁছিয়াছিলেন। এবং ১৯০৯ সালের ৮ই মে শনিবার কুমার মারা যান বা মৃত বলিয়া অনুমিত হন। সুতরাং তিনি ঠিক ১৯ দিন দার্জ্জিলিংয়ে ছিলেন, অবশ্য ঐ তারিখের পরে কি ঘটিয়াছিল তৎসম্বন্ধে বাদীর বর্ণনা বাদ দিয়া ধরিলে। বাদী বলিতেছেন যে, ১৯০৯ সালের মার্চ্চ মাসে সত্যবাবু জয়দেবপুরে আসিয়া পৌঁছিবার পর পাহাড়ের যাদুমন্ত্রের কথা বলেন এবং তদনুসারে বাদী দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। সিফিলিস্ ছাড়া তাহার আর কোন অসুখ ছিলনা, দার্জ্জিলিং আসার পর তিনি বলিতেছেন (আমি ইহা কিছু সংক্ষেপে করিয়াছি)।

দার্জ্জিলিং ঘটনার বাদীর উক্তি

"আমি বেশ ভালই ছিলাম, তারপর এখানে পৌঁছিবার ১৪।১৫ দিন পরে আমি অসুস্থ হইলাম। রাত্রে পেটফাঁপা লইয়া অসুখ আরম্ভ হইল। সে রাত্রে আমি আশু ডাক্তারকে বলিলাম। পরদিন এক সাহেব ডাক্তার আসিয়া তিনি একটি ঔষধ ব্যবস্থা করিলে আমি এই ঔষধ খাইলাম। তৃতীয় দিনও আমি ঐ ঔষধই খাইলাম কিন্তু ইহাতে কোন উপকার হইল না। সেই রাত্রে ৮টা ৯টার সময় আমাকে একটা গ্লাসে (একটী ছোট গ্লাস দেখাইয়া) এক ঔষধ দিল। ইহাতে আমার কোনও উপকার হইল না। বরং এই ঔষধ খাইতেই আমার বুক জ্বলিয়া উঠিল, আমি বমি করিলাম ও অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমার ঔষধ খাওয়ার ৩।৪ ঘণ্টার পরে এই লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম। সে রাত্রে কোন ডাক্তার আসিল না।

চতুর্থ দিনে—"পরদিন প্রাতঃ কালে আমার রক্ত বাহ্যে হইল—খুব ঘন ঘন বাহ্যের বেগ হইল। আমার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তার পর আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন ডাক্তার আসিয়াছিল কি-না তাহা আমি জানি না।

জেরার সময় মিষ্টার চৌধুরী এই বিবৃতি কেবল স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র। তিনি এইটুকু মাত্র বাহির করিয়াছেন, যে মাত্র বাদী প্রথমদিন ডাক্তার ক্যালভ্যার্টের নাম শুনিয়াছিল; এবং দ্বিতীয় দিন আশুডাক্তার তাহাকে ঔষধ দিয়াছিল, তখন সে চীৎকার করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহার বুক জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাহার বমি হইয়াছিল এবং সে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল— "আশু তুমি আমাকে কি ঔষধ খাইতে দিয়াছ?"

তাহা অসত্য, এবং বাদী সেই সকল সাক্ষীগণকে বলিয়াছে যাহারা সন্ধ্যার একটু পরেই তাহাকে মৃত দেখিয়াছে কিংবা প্রায় রাত্রি ৯টার সময় তাহাকে পোড়াইবার জন্য শ্মশানে লইয়া গিয়াছে এবং বৃষ্টির সময় যেখানে আশ্রয় লইয়াছিল তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মৃতদেহ আর দেখিতে পায় নাই।

বিবাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন ডাক্তার ক্যাল্‌ভার্ট, যিনি কুমারের চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত সাক্ষীগণ। ১। মেজরাণী ২। সত্যবাব ৩। ডাক্তার আশুতোষ ৪। বিপিন খানসামা ৫। পার্শন্যাল ক্লার্ক বীরেন্দ্র ৬। দার্জ্জিলিঙের দলবলের অন্যতম এণ্টনি মোরেল ৭। ধাত্রী জগৎ মোহিনী দেবী (দাসী) ৮। সত্যবাবুর সম্পর্কীয় প্রজা শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়। ইহারা অসুখ সম্বন্ধে বলিতেছে এবং প্রথম ৬ জন অসুখের সমস্ত সময় ও মৃত্যু সম্বন্ধেও সাক্ষী দিতেছে। ডাক্তার ক্যালভার্ট কার্য্যতঃ অসুখের সমস্ত কাল ব্যাপী ও মৃত্যু সম্বন্ধেও সাক্ষী দিতেছেন। ঐ সকল সাক্ষী ছাড়া আরও বহু সংখ্যক সাক্ষী আছে, যাহারা প্রাতঃকালের শোভা যাত্রার সম্বন্ধে বলিয়াছে এবং এই সম্বন্ধে বলিতেছে যে শব বাহিত ও পোড়ান হইয়াছিল, তাহা কুমারের মৃত দেহ কিংবা বিবাদীপক্ষের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যাহা যথেষ্ট অর্থাৎ উহা ঢাকা ছিল না। দেহটী দেখা যাইতেছিল। এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য ৯৬ জন সাক্ষী ছিল। যদিও সকলেই মৃত্যু সম্বন্ধে এবং অসুখ বা শবদাহ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় নাই, কিন্তু অধিকাংশ সাক্ষী ঐ সাক্ষ্য দিয়াছে এবং বিবাদীপক্ষের অনেকে কমিশনে সাক্ষী দিয়াছে। সমস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্যক বুঝিতে হইলে কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করা আবশ্যক হইবে। ইহা স্মরণ থাকিতে পারে যে, ৪ঠা মে তারিখে বাদীর সঙ্গে পরিচয় দানের পর সত্যবাবু ১৫ই মে তারিখের পূর্ব্বে কোন এক তারিখে একজন ব্যারিষ্টার সহ দার্জ্জিলিঙ গিয়াছিলেন, এবং সেই যাত্রায় দার্জ্জিলিঙের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ মিষ্টার এন, এন, রায়ের দ্বারা কতকগুলি সাক্ষীর সাক্ষ্য ও তাহাদের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল। তখন কতকগুলি সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল তাহা জানা নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রলাল মুখোপাধ্যায়, বাদীর দ্বারা যাহার জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে, এবং ১৭।৫।২১ তারিখে দার্জ্জিলিঙে যাহার সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল। যখন সাক্ষীদের বিবৃতি লওয়া হইতেছিল তখন সত্য বাবু ও গভর্ণমেণ্ট উকিল রায় বাহাদুর দার্জ্জিলিঙে ছিলেন, এবং তাহারা সকলেই একই হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন। একজন ব্যারিষ্টারও তথায় ছিলেন। এই ব্যারিষ্টার, মিষ্টার এন, এন, রায়ের আত্মীয়। আমি এতদ্বারা মিষ্টার এন,

সাধুর কাহিনী :—

"সাধু বলিতেছে যে সে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। তাহার কাহিনী এই যে, ১৯০৯ সালের ৮ই মে তারিখে ডাক্তারগণ মনে করেন যে সে মরিয়াছে, এবং তাঁহারা তাহাকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তারপর শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল ও তথায় উহা চিতার উপরে স্থাপন করা হইল, কিন্তু চিতায় আগুন দিবার পূর্ব্বে এরূপ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে শবযাত্রীদল পলায়ন করেন এবং বৃষ্টি কমিলে তাহারা শ্মশানে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু দেখিল যে, মৃতদেহ উধাও হইয়াছে। যাহাহউক তাহারা চিতায় আগুন দিল এবং গৃহে ফিরিয়া গিয়া বলিল যে কুমারের দেহ দাহ করা হইয়াছে। কাহিনীতে আরও প্রকাশ যে শব যাত্রীরা পলায়ন করিলে পর নিকটস্থ এক সন্ন্যাসী চিতার নিকটে আসিয়া দেখিল যে দেহে জীবন নাই, শবটি তাহারা আবাসস্থলে লইয়া গেল এবং মন্ত্রবলে দেহে জীবন সঞ্চার করিল।

তার পরে এই নোটে দ্বিতীয় কুমারের দেহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; গৌর বর্ণ, মোটাসোটা শরীর, সবল স্বাস্থ্য, বাদামী রঙের চুল, ২৭ বৎসর বয়স, সে ষ্টেপ-এ সাইডে মরিয়াছিল। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে সে তথায় তাহার পত্নী, ভ্রাতা, কতিপয় কর্ম্মচারী ও চাকর সহ বাস করিতেছিল এবং আরও বলা হইয়াছে, বৃষ্টিপাতের রেকর্ড হইতে জানা যায় যে ৮ই ও ৯ই তারিখে দার্জ্জিলিঙে বৃষ্টি হয় নাই।

এ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন রহিয়াছে এবং ৭ই তারিখের শেষে একটি নোট আছে যে শবযাত্রার সময় টাকা ও খুচরাপয়সা ছড়ান হইয়াছিল ও গরীবদিগকে পয়সা দেওয়া হইয়াছিল।

বাদীর মামলা কখনও এরূপ ছিল না,—কেহ কখন প্রকারান্তরেও বলে নাই যে, সে মধ্যরাত্রে মারা গিয়াছিল, কিংবা সে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, অতঃপর মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত হইয়াছিল, কিংবা কেহ দেহ ব্যতিরেকে কাঠ পোড়াইয়াছিল। তাহার মামলা যথেষ্ট অসম্ভব, কিন্তু নোটটি যদি সাক্ষীদিগকে সংবাদ জানাইবার জন্যই লিখিত হইয়াছে, তবে তাহা ছাড়া অন্য কি উদ্দেশ্যে হইয়াছিল বলা শক্ত,—তাহা হইলে এইরূপ বোধ হইতেছে যে মৃত্যুর কথা মধ্যরাত্রি সর্ব্ববাদিসম্মত ধরিলেও সাক্ষীর মন আর তাহার পূর্ব্বে যাইবে না, এবং বৃষ্টিপাতের পূর্ব্ব হইতে বৃষ্টি হয় নাই বলিলে পূর্ব্বস্মৃতি আর জাগিবে না। কিম্বা প্রাতঃকালে শবযাত্রা হইয়াছিল বলিয়া সেই দিকেই মন যাইবে।

অসুখ সংক্রান্ত সমস্ত টেলিগ্রামের কথা লিখিয়াছিলেন (একজিবিট নং ৫৫) এবং বড় রাণী ৯।১১।২১ তারিখে সেগুলি পাঠাইয়াছিলেন। জয়দেবপুরে মৃত্যু-জ্ঞাপক যে টেলিগ্রাম অবশ্যই পাঠান হইয়াছিল এগুলির মধ্যে সেটি নাই। একবার এইরূপ সূচিত হইয়াছিল যে বড়রাণী সেটি পাঠান নাই; কিন্তু পরে এই সূচনা স্পষ্টভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছিল। (৪-৭-৩৫ তারিখের ১০৭৯নং অর্ডার দ্রষ্টব্য)। বিবাদী পক্ষের মামলা এই যে বড়রাণী ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই, এবং ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না যে, তিনি ইহা গোপন করিতেছিলেন। কে এরূপ করিতেছিল তাহা নিম্নে জানা যাইবে।

১০ই মে তারিখে, যেদিন দার্জ্জিলিঙের দল, দার্জ্জিলিঙ পরিত্যাগ করেন, সেইদিনই কর্ণেল ক্যালভার্ট বড়কুমারের নিকট একখানি মৃত্যুর শোক-সূচক পত্র রচনা করেন। সেই পত্রখানি বিবাদীপক্ষের সওয়াল জবাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ক্যালভার্ট বড় কুমারকে চিনিতেন না। বিবাদীপক্ষের কেহই জানে না কেন তিনি এই পত্র লিখিয়াছিলেন, কিংবা কখন তিনি উহা লিখিয়াছিলেন, এবং সত্যবাবু কখনও আসল চিঠিখানি দেখেন নাই। ১নং বিবাদী ৫-৬-২১ তারিখে উহার একটি নকল রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইয়াছিলেন (একজিবিট নং ২১৬০) কিন্তু তিনি বলেন যে জয়দেবপুর হইতে তাঁহার নিকট যে নকল পাঠান হইয়াছিল, উহা সেই নকলের নকল। লণ্ডনে যখন কর্ণেল ক্যালভার্টের সাক্ষ্য লওয়া হয়, তখন তিনি প্রথম জবানবন্দীতে এই বলিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন যে—উহা তাঁহার চিঠি। তিনি বলেন নাই যে তিনি উহা পাঠাইয়াছিলেন, আর তিনি যে উহার উত্তর পাইয়াছিলেন সে ত আরও দূরের কথা, যদিও চিঠির উপরেই একটা লেখা আছে—"২০-৫-০৯ তারিখে উত্তর দেওয়া হইল"; আর চিঠিতে যাহা লেখা আছে তৎসম্বন্ধে তিনি মাত্র এই কথা বলিয়াছেন যে চিঠিতে শুশ্রূষার কথা আছে। এই পত্রখানি, মূলতঃ সাক্ষ্য নহে, কিন্তু সমর্থনভাবে অত্যন্ত মূল্যবান, এবং বিবাদীপক্ষের মামলা যতদূর সম্ভব ইহাকে অবলম্বন করিয়াছে এবং সাক্ষ্যের বিচার করিতে হইলে উহা এখনই বিবৃত করা উচিত।

বেদনা। কুমারের দার্জ্জিলিঙ আসার মত দিবার জন্য আমি যখন কুমারকে প্রথম দেখি তখন ঐ যন্ত্রণাই ছিল। আমি দিনের পর দিন এই অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমার যতদূর স্মরণ হয় মধ্যে মধ্যে তাঁহার সামান্য সামান্য আক্রমণ হইত, এবং পরিশেষে এই মারাত্মক আক্রমণ ইহাই হইয়াছিল যাহা আমরা পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তিনি জানেন যে এটা ১৪ দিনের ব্যাপার, এবং মাঝে মাঝে শূল বেদনা আসিতেছিল এবং তাঁহার লক্ষ্য করিতে করিতে অবশেষে শেষ আক্রমণ ৮ই মে তারিখে প্রবলভাবে আসিল, এবং ইহাই তাঁহার এফিডেবিটের সহিত সামঞ্জস্য বিশিষ্ট। বাহ্যতঃ বাদীদের ইহা মনে হইয়াছিল যে এবিডেবিট কেবল কর্ণেল ক্যালভার্টের দ্বারা নহে, অপরাপর ব্যক্তির দ্বারা পোষণ করা হইবে,এবং ক্যালভার্টের পরে অ্যান্টনিমোরেলের সাক্ষ্য লওয়া হইলে তিনিও এই মর্ম্মেই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে অসুখটা ছিল মধ্যে মধ্যে সংঘটিত জ্বর ও শূল বেদনা। এবং উহা ১০।১২ দিন ধরিয়া চলিতেছিল—প্রথম জবানবন্দীতে এইরূপই বলা হইয়াছিল যে, কুমারকে দার্জ্জিলিং আসিবার দুইতিন দিন পরেই কর্ণেল ক্যালভার্ট দেখিতে লাগিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আসিতেছিলেন এবং প্রত্যেকবারই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল।

সাক্ষ্যের অনৈক্য

এক্ষণে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে এই সমস্ত মিথ্যা, যে কুমার ৬ই মে তারিখে অসুস্থ হন, এবং ৮ই তারিখে মারা যান। দার্জ্জিলিং আসার পর হইতে তিনি সুস্থ ছিলেন, ইহাই মেজরাণী, আশু ডাক্তার, বীরেন্দ্র ও সত্যবাবুর সাক্ষ্য। ৬ই তারিখে অসুস্থ হওয়ার পূর্ব্বে তিনি সুস্থ ছিলেন, এবং সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে তিনি দার্জ্জিলিঙে এখানে সেখানে বেড়াইতেছিলেন, সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছিলেন, বাহিরে আহার করিতেছিলেন, একটা সেলুনে বিলিয়ার্ড খেলিতেন, এমনকি একটা শিকারে যাওয়ার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ও ব্যবস্থা করিতেছিলেন (বিবাদীর সাক্ষী ৫৭, ৭৯, ৭২, ১০)। আশু ডাক্তার এই দলের সঙ্গে যোগ দিয়া বলিতেছেন যে ৬ই পর্য্যন্ত কুমার সুস্থ ছিলেন, এবং সত্যবাবু ও অপর কতিপয় সাক্ষী তাঁহার মৃত্যুর ৬ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সুন্দর স্বাস্থ্যের কথা বলিতেছেন (বিবাদীর সাক্ষী ৫৭) যদিও এ্যান্টনি মোরল বলিতেছেন যে কুমার কার্ল্টনস্ হোটেলে ভোজন করেন নাই, যাহা মিষ্টার প্রিভা পরে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহার ১২ দিন বা আরও কিছু পরে বার্লী ও সাগু খাওয়াইয়াছেন।

যাহা হউক ডাক্তার ক্যালভার্টের এফিডেবিট রক্ষা কল্পে কিছু কেরদানী করা হইয়াছিল। আশু ডাক্তার বলিতেছেন যে, তাঁহাদের দার্জ্জিলিঙ আসার ৩ কি ৪ দিন পরে ডাক্তার ক্যালভার্টকে ডাকা হইয়াছিল, এবং তিনি কুমারকে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার পরবর্ত্তী আসার তারিখ, পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত ৬ই তারিখ হয়। তাহা হইলে ১৪ দিন পাওয়া গেল। আশু ডাক্তার বলিতেছেন যে এই প্রথম আসার দিন আন্দাজ ২৪শে এপ্রিল তারিখে, তিনি ডাক্তারকে কুমারের ইতিহাস বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে কুমারের সিফিলিস্ ছিল, ও তাঁহার পৈত্তিকশূলবেদনা ছিল। সে সময়ে তাঁহার পৈত্তিকশূলের কোন লক্ষণ ছিল না, অর্থাৎ কোন যন্ত্রণাই ছিল না। ডাক্তার ক্যালভার্ট সিফিলিসের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

নিম্নে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে এই পৈত্তিকশূল একটা সাজান বা বানান কথা, এবং বিবাদিগণ যে ম্যালেরিয়া জ্বরের কথা বলিতেছে তাহাও তাই। কিন্তু এখনকার মত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে যদিও তাঁহার পৈত্তিক শূল ছিল অর্থাৎ সে মধ্যে মধ্যে এই রোগে ভুগিত, কিন্তু তথাপি কর্ণেল ক্যালভার্ট কখনও উহা দেখেন নাই। বাদীকে জেরা করার ফলে যে অবস্থা দাঁড়াইল তাহাতে তাহাকে সাহেবের পোষাকে বাহির করা, সাহেবদের সঙ্গে কথা বলা ও ছুরি কাঁটা ব্যবহার করান দরকার হইয়া পড়িল, বলিয়া বিবাদী পক্ষ ক্যালভার্টকে এই ভাবে পরিত্যাগ করিল কিনা সে বিষয়ে আমি যে বিবেচনা করিয়াছি, উহা ঠিক নহে। ক্যালভার্টের কথামত ১৪ দিনের অসুখ ও মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা—যাহার উপর তিনি দিনের পর দিন নজর রাখিয়াছিলেন এই সমস্ত একটি ঘটনার দ্বারা বাদ পড়িতেছে।

ঔষধ ব্যবস্থা

৬ই মের পূর্ব্বে কোন ঔষধের ব্যবস্থা পত্র নাই। বিশেষত বাদী স্মিথষ্টানি ষ্ট্রীটে কোম্পানীর খাতা হইতে নকল দাখিল করিয়া ব্যবস্থাপত্র গুলি প্রমাণ করিয়াছে এবং এগুলি ৬ই তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষত আশু ডাক্তার স্বীকার করিতেছেন তিনি ব্যবস্থা পত্র ও তাহার নকলগুলি সযত্নে রক্ষা করিতেন। সেগুলি উপস্থিত করা হয় নাই, এবং এইরূপ ইঙ্গিত করা ও হয় নাই যে ডাক্তার ক্যালভার্ট প্রথমবার আসিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে তাহার নকল লইতে কোন চেষ্টা করা হইয়াছে কিম্বা বলা হইয়াছে যে সেগুলি পাইবার উপায় নাই। ইহা সত্য নহে যে কর্ণেল ক্যালভার্ট ৬ই মের পূর্ব্বে কুমারকে দেখিয়াছিলেন এবং ইহা সেইরূপই মিথ্যা।

ইহাদের মধ্যে তিনটি একত্র মিশাইলে আর্সেনিক গলিবে না। ডাক্তার ম্যাকগীলক্রায়েষ্ট্ ঔষধগুলির ফল ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে এই ব্যবস্থাপত্রের বারগুণ ঔষধে ১৪৮ গ্রেণ কুইনাইন ৬ গ্রেণ অ্যালয়েন, $\frac{1}{2}$ গ্রেণ ষ্ট্রিকলিন, ($\frac{1}{4}$ হইতে $\frac{1}{2}$ গ্রেণ মারাত্মক), ১২ গ্রেণ ইননিমিন, প্রায় $\frac{1}{2}$ গ্রেণ আর্সেনিক (২ গ্রেণ মারাত্মক) থাকিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ডাক্তার ম্যাকগিলক্রিষ্ট এবং মেজর টমাসের উক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। এবং সম্ভবতঃ ম্যাকগিলক্রিষ্ট মেজর টমাসের সহিত একমত হইবেন যে, এই ঔষধ ম্যালেরিয়া সারাইবার উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছিল।

কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট প্রতিবাদীগণের পক্ষে বলিতেছেন :—

প্রঃ—এই ব্যবস্থা পত্র কিসের জন্য ? (প্রদর্শক Ex ৫১ (এ),

উঃ—আমার মনে হয় ডাক্তার দীর্ঘকাল স্থায়ী ম্যালেরিয়ার সঙ্গে রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, ইহাই সন্দেহ করিয়াছিলেন। পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্যে হয়ত কুইনাইন এবং আর্সেনিক সাধারণ প্রতিষেধক, এবং অ্যালয়েন এবং ইননিমিন জোলাপ মাত্র হিসাবে দিয়াছেন।

প্রঃ—মাত্রাগুলি কি স্বাভাবিক ?

উঃ—মাত্রাগুলি ঔষধ প্রস্তুত করণ বিদ্যার নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে নয়।

ইহার পর তিনি বলেন যে কোন মানুষকে এইরূপ বারটি বটিকা সেবন করান যাইতে পারে না। এবং যদি উহা সেবন করাইতে প্রবর্ত্তিত করা যায়, তবে ফলাফল সম্বন্ধে ম্যাকগিলক্রিষ্টের সঙ্গে তাহার মতের কোন বিভিন্নতা নাই, এবং তারপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল।

প্রঃ—যদি নাক্সভমিকা মারাত্মক মাত্রায় সেবন করান যায়, তবে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইবে ?

উঃ—ষ্ট্রীকনিন বিষপ্রয়োগের লক্ষণ দেখা যাইবে।

তিনি বলেন যে, এই লক্ষণগুলি অর্দ্ধ ঘণ্টা বা ঘণ্টার তিন চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। এই প্রসঙ্গে কর্ণেল ম্যাকগিলক্রিষ্ট বলিয়াছেন সে বিদ্রাবণের উপর সময় নির্ভর করে, পাকাশয়ে শূন্যতা অথবা খাদ্য পরিপূর্ণ ছিল কিনা ইহাও একটি দেখিবার বিষয়।

দুইজনেই ইউল্যান্সের ব্যবহার শাস্ত্রের সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়াছেন, এবং সেই পুস্তকে এই অনুচ্ছেদটি আছে।

"বিষগ্রহণের এবং উহার লক্ষণ প্রকাশিত হইবার মধ্যবর্ত্তী সময়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানে গৃহীত আর্সেনিকের বেশী বা কম মাত্রার উপরে নির্ভর করে এবং সে

সেদিন আসেন নাই। মিঃ এস, পি, ঘোষের সামনে তিনি বলিয়াছেন ডাক্তার নীলরতন দুইতিন দিন ধরিয়া চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ৭ই তারিখের বেদনার বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন তিনি কেবল মাত্র ডাক্তার ক্যালভার্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সেই শূলবেদনার উপশমের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং শ্রীপুরের মামলায় তিনি ইহার পুনরাবৃত্তি করেন এবং পরিষ্কার বলিয়াছিলেন যে সেইদিন ডাক্তার নিবারণ আদৌ আসেন নাই। এই শ্রীপুরের মামলার সময় যখন ডাক্তার আশু প্রতিবাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছিলেন তখন তাহাকে সমস্ত ব্যবস্থাপত্রগুলি দেখান হয়, তথাপি তাহার উত্তর একই, যে তিনি ঐ ব্যবস্থাপত্র করেন নাই, ক্যালভার্ট করিয়াছেন।

লণ্ডনে প্রতিবাদীগণ ডাক্তার ক্যালভার্টের নিকট এই ব্যবস্থাপত্র দেন নাই। ইহা দেওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, কারণ ইহাদ্বারা পিত্তশূলের, শোকজ্ঞাপক চিঠির, এবং মৃত্যুর এফিডেভিটের প্রমাণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। জেরার সময় তাহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, কুমারের ঐরূপ অবস্থায় তিনি এই ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন না। আসল কথা এই যে সংক্ষেপে তিনি ব্যবস্থাপত্রের বিষয়ে অস্বীকার করেন।

সুতরাং যখন ইহার জন্য আর তাহাকে দায়ী করা গেল না, তখন মিঃ চৌধুরী এই বলিয়া মামলা আরম্ভ করিলেন যে, ডাক্তার নিবারণের নির্দ্দেশমত এই ব্যবস্থাপত্র আশু ডাক্তার লিখিয়া লইয়াছিল, এবং তিনি ডাক্তার ম্যাকগিলক্রিষ্টের নিকট আভাস দিয়াছেন, ডাক্তার কিংবা ডাক্তারগণ সেইজন্য ম্যালেরিয়া আছে বলিয়া সন্দেহ করেন। এই বিষয়ে আশু ডাক্তার সাক্ষ্যদানকালে এইরূপ বলিয়াছে :—

প্র—কুমার যখন অসুস্থ হইয়া দার্জ্জিলিংএ ছিলেন তখন আপনি কি কোন ব্যবস্থাপত্র করিয়াছিলেন ?

উ—না।

প্র—আপনি কি কোন ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াছিলেন ?

উ—আমি ডাক্তারগণের পরামর্শমত একখানি লিখিয়াছিলাম, আমি ব্যবস্থাপত্রখানি করি নাই, আমাকে লিখিবার জন্য বলা হয়, আমি উহা লিখিয়াছিলাম। হয় ডাক্তার নিবারণ অথবা ডাক্তার ক্যালভার্ট আমাকে ইহা লিখিতে অনুরোধ করেন।

এই ব্যবস্থাপত্র কখন লেখা হইয়াছিল, কেন অথবা কোন অবস্থায় এই

ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল কিনা, এবং হইয়া থাকিলে উহার কি ফল হইয়াছিল এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই।

ইহা ডাক্তার ক্যালভার্টের লেখা নয়, কারণ তিনি সেকথা অস্বীকার করিয়াছেন। ইহার জন্য ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার নিবারণকে দায়ী করা যাইতে পারে না। কারণ তিনি ৭ই তারিখে আসেন নাই। ইহা হইতে এইরূপ মনে হইবে যে ব্যাপারটির এইখানেই শেষ মীমাংসা হইয়া গেল, এবং এই ব্যবস্থাপত্রের জন্য আশু ডাক্তারই সর্ব্বতোভাবে দায়ী। কারণ তিনি নিজেই উহা লিখিয়াছেন এবং উহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। এইরূপ মনে হয় যে, তাহাদের মধ্যে কাহারও উপর ইহা আরোপ করা না হইলেও যখন নিবারণ ডাক্তার মারা গিয়াছে, তখন তাহার ঘাড়ে সহজেই ঐ দোষ নির্ভয়ে চাপান যাইতে পারে।

৭ই তারিখে ডাক্তার ক্যালভার্ট বা নিবারণ কেহই কোন ব্যবস্থাপত্র করেন নাই। সুতরাং এই ঔষধের ব্যবস্থা পত্রখানি একটু অশুভ ও অতিশয় আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়। কেহই ইহা লিখিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন না। সাক্ষ্য দেখিয়া বুঝা যায় যে এই প্রকারের ব্যবস্থাপত্র সেইদিনকার অসুখের অবস্থার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

৭ই তারিখে মেজকুমারের অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে!

এই দিনের টেলিগ্রামে কুমারের ৬ই তারিখে রাত্রিতে সুনিদ্রা হইয়াছিল— ইহা ভিন্ন অন্য কোন কথার উল্লেখ নাই।

সকাল ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত জ্বর বা বেদনার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। ডাক্তার ক্যালভার্ট এবং ডাক্তার নিবারণ উভয়েই রোগী দেখিতে আসিয়াছিলেন।

দিবা ১০টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত সত্যবাবুর মতে রোগীর একই অবস্থা। আশুবাবুর কথানুযায়ী তখন কুমারের জ্বর আরম্ভ হইয়াছে।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বেদনা এবং যন্ত্রণা ছিল, এবং সত্যবাবু বলিয়াছেন যে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছিল কিনা ইহা বলা শক্ত, তবে তিনি প্রাতঃকালের ন্যায় সুস্থ ছিলেন না।

সত্যবাবু বলেন যে হয় ক্যালভার্ট অথবা নিবারণবাবু সন্ধ্যার সময় একবার আসিয়াছিলেন। তাহারা কোন ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন বলিয়া তাহার মনে নাই।

ডাক্তার আশুতোষ এই দিন সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা এইরূপ :—

আশু ডাক্তার যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছে তাহা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া মনে হয় না যে, কুমারের জ্বর ছিল। (Ex৫১ (এ)। ৭ই তারিখেব পূর্ব্বে কুমারের কোন জ্বর ছিল না, যদিও ডাক্তার আশুতোষ ৬ই তারিখের বায়ুনিঃসারক ব্যবস্থাপত্রে জ্বরের আভাস পাইয়াছেন। আমার মনে ইহা দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে জ্বর ছিল, এই কথা ব্যবস্থাপত্র দ্বারা প্রমাণ করাইবার প্রয়োজন ছিল; এবং এই কারণেই রায় সাহেব এবং ফণীবাবু এবং প্রতিবাদী পক্ষের ভৃত্যগণ কুমারের মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হইত এই কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত ছিল।

আমি এই সাক্ষ্যের একটি কথাও বিশ্বাস করি না। মিঃ চৌধুরী বড়রাণীর লিখিত ৬-২-০৯ তারিখের একখানি চিঠির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উহাতে বড়রাণী লিখিয়াছেন :—

"সেজ ঠাকুরপো ভাল আছেন, আবার গতরাত্রে তাহার জ্বর হইয়াছে।" এখানে তিনি তাহার নিজের স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছেন— আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা পত্রের মধ্যেও নিজেদের স্বামীর নাম উল্লেখ করে না। এবং ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসের শাশুড়ীর চিঠিগুলিতে তখন মেজকুমারের জ্বরের কথা আছে এবং তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইবেন। আমরা জানি তিনি সিফিলিসের চিকিৎসার :জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন। কুমারের ম্যালেরিয়া ছিল, একথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। কারণ একথা ব্যবস্থাপত্রদ্বারা প্রমাণিত হয় না। এমন কি ডাক্তার আশুতোষও বলেন না যে, কুমারের ম্যালেরিয়া ছিল, অথবা তিনি সেজন্য তাহার চিকিৎসা করিয়াছেন। তিনি তখন একজন যুবক এবং সবেমাত্র এক মেডিক্যাল স্কুল হইতে সাধারণ পরীক্ষা পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন! এ অবস্থায় তিনি কুমারের চিকিৎসা করিবার ভার গ্রহণ করিবার কথাও ভাবিতে পারেন না। তাহার মুখ দিয়া সত্য কথা বাহির হইয়াছিল যে ৭ই তারিখের বেদনার জন্য ইহা কোন প্রকারেই প্রতিষেধক হইতে পারে না।

কুমারের পীড়ার অবস্থা

এই দিনের ব্যাপারগুলি অতি সহজেই বুঝা যায়। এই দিনে কোন ডাক্তার আসে নাই, টেলিগ্রাম না করিয়া ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল যে গোধূলি পর্য্যন্ত কুমারের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু ডাক্তারেরা ক্যালভার্টের ইনজেকসন দেবার প্রস্তাবের কথার সাক্ষ্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য রাণীকে ঐরূপ বলিতে বিশেষ বাধ্য করান হইয়াছিল। বেদনার কেবল লক্ষণ না থাকিলে এই প্রস্তাবে স্বতঃই সন্দেহের উদ্রেক

নার্স আসিয়াছিল। কুমারের শরীর ঠাণ্ডা হইতেছিল। নার্সরা তাঁর শরীরে একপ্রকার পাউডার দিয়া মালিশ করিতে থাকে, এবং তিনি বিছানার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কর্ণেল ক্যালভার্ট রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আহার করিতে চলিয়া যান।

রাণী বলিয়াছেন যে ইন্‌জেক্‌শান্ বোধ হয় দুইবার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ঠিক তাহা স্মরণ হয় না।

গোধূলি সময়ের অবস্থা

তাঁহার (রাণী) মামা, সূর্য্যনারায়ণ বাবু, ডাঃ বি, বি, সরকারের সঙ্গে আসিলেন। তাঁহারা দুজনেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ডাক্তার বাবু কুমারকে পরীক্ষা করিয়া প্রায় ৭ হইতে ১০ মিনিটকাল ঘরে থাকিয়া চলিয়া যান। সূর্য্যনারায়ণ বাবু প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে চলিয়া গেলেন। যখন ডাঃ সরকার রোগীকে পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন ডাঃ ক্যালভার্ট এবং ডাঃ নিবারণ ঘরের ভিতর যান নাই। দুজনেই ঘরের মধ্যে ছিলেন এবং যখন ডাঃ সরকার কুমারকে পরীক্ষা করেন তখন কুমারের শরীর ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা হয় নাই।

রাণী অস্বীকার করিয়াছেন যে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে ডাঃ সরকার কুমারকে মৃত বলিয়া জানাইয়াছিলেন।

মধ্যরাত্রের অবস্থা

ডাঃ ক্যালভার্ট ডাঃ নিবারণের এবং আশু ডাক্তারের সম্মুখে কুমারের মৃত্যু হয়, বিবাদীপক্ষ ঐ কথা বলেন।

ডাঃ ক্যালভার্ট যাইবার পরে ফিরিয়া আসিয়া মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। বাদীর পক্ষের কোনও সাক্ষ্য মৃত্যুর পরের এই দিনের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই ষ্টেপ্ এসাইডেব জমিদার মিঃ ওয়ার্ণিকল্—যিনি সত্যবাবু ও মুকুন্দের সঙ্গে চুক্তি করিয়া কুমারকে বাড়ীভাড়া দিয়াছিলেন—তাঁহার এক মুন্সি, নাম ছিল রাম সিং সুবা, সে বলিয়াছে যে সে ঐদিন সাড়ে চারিটার সময় লেবং-এ ঘোড় দৌড় দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল এবং খাইয়াছিল। সে ষ্টেপ্ এসাইডের ১৫ ফিট্ নীচে থাকিত। খাইবার দুঘণ্টা পরে সে ষ্টেপ্ এসাইডের দিকে মেয়ে মানুষের কান্না-কাটি শুনিয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছিল। তখন প্রায় সাতটা অথবা সাড়ে সাতটা হইবে। সে নীচের তলায় চাকর বাকরদের কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিল এবং শুনিল যে কুমার মারা গিয়াছেন। সে উপরে উঠিয়া ৫নং ঘরের সম্মুখে বস্ত্রাচ্ছাদিত কুমারের মৃতদেহ দেখিতে

সিষ্টিক্ নলের দ্বারা আবার পিত্তকে পিষিয়া আর একটি সাধারণ নল দিয়া বাহির করিয়া দেয় এবং পরিপাকের জন্য উহা যখন প্রয়োজন হয়, তখন উহাকে অন্ত্রের মুখস্থিত নলের সহিত সংযুক্ত করে। পার্শ্বের নকসাটি এই তিনটি নল দেখাইতেছে—পাথরি পিত্তকোষে অসুস্থ অবস্থা আনয়ন করে এবং তাহারা নানা আকারের হইয়া থাকে, কখন কখন বালির দানার মত হয়, সেগুলি পিত্তের সহিত বাহির হইয়া যায়, এবং কোন অসুখ সৃষ্টি করে না; কিন্তু খুব বড় পাথরি সিষ্টিক্ বা সাধারণ নলে আটকাইয়া যায়, এবং যখন আটকাইয়া যায় তখন তীব্র যন্ত্রণা হয়। ইহাকে বলে পৈত্তিক শূল। পুস্তকে এই যন্ত্রণাকে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বহুদর্শী ডাক্তার ম্যাক্‌গিল-ক্রীষ্টের যে সাক্ষ্য সম্বন্ধে কেহই আপত্তি উত্থাপন করে নাই, আমি তাহা হইতেই বর্ণনা দিতেছি। যন্ত্রণা দুই এক মিনিট অন্তর অন্তর প্রবল হয় কিংবা যখন একবার আক্রমণে পাথরি বাহির হইয়া যায়, তখন হঠাৎ যন্ত্রণা বন্ধ হয়, এবং তখন রোগ আপনা আপনি ভাল হইয়া যায়, ও ভবিষ্যতে সাবধান হওয়া ছাড়া আর কোন চিকিৎসার দরকার হয় না। শূল যন্ত্রণার আক্রমণের মধ্যে মধ্যে যে চিকিৎসা করা হয়—তাহাকে 'বিরাম চিকিৎসা' বলে। কোন নিয়মিত বিরাম আছে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ কখন যে আবার পাথরী হইবে এবং বাহির হইয়া যাইতে না পারে আবার কখন এতটা বড় হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে এইরূপ প্রস্তর বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বে ও পরে অজীর্ণ হয়, কর্ণেল ম্যাক্‌গিলক্রীষ্ট ইহা অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তিনি কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধে স্বীকার করেন নাই; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে ইহা ফলই হোক্ আর সহ-ফলই হউক, ইহা সাধারণতঃ এক সঙ্গেই বর্ত্তমান থাকে। মিষ্টার চৌধুরী ব্র্যাড্‌লিকে জিজ্ঞাসা করেন যে প্রাইস সাহেবের মত প্রামাণ্য কিনা এবং ডাক্তার স্বীকার করেন যে প্রাইস্ প্রামাণ্য গ্রন্থকার। তাঁহার ঔষধের গ্রন্থে তিনি আর বেশী কিছু বলেন নাই এবং ম্যাকগিল ক্রীষ্ট পীড়ার আসন্ন কারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ঠিক তাহাই পোষণ করিতেছেন। সর্ব্বশেষ দূরবর্ত্তী কারণ সংক্রমণ ও পিত্তকোষের সর্ব্বদা প্রদাহই হউক· কিম্বা আসল পাথর বলিয়াই কোন জিনিষ থাকুক উহাতে কিছু আসে যায় না, তবে ডাক্তার টমাস এবিষয়ে একটা কল্পনা করিয়াছেন যাহা আমিও পরে বলিব। কিন্তু প্রাইস্ ইহা সম্ভব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সত্য সত্যই এরূপ পাথর দেখিয়াছেন। পীড়ার আক্রমণের সময় এই যন্ত্রণা যাহা অববাহিকাতে উৎপন্ন হয়। পাকস্থলীতে না গিয়া বরাবর দক্ষি৹

স্কন্ধে উঠিয়া থাকে। পাকস্থলীর সহিত এই ব্যাপারের কোনই সম্বন্ধ নাই, পাকস্থলীতে পিত্ত প্রত্যক্ষভাবে প্রবাহিত হয় না, কেবল মাত্র অন্ত্রমুখের নলের দ্বারা যায়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে পিত্তকোষের পাথরি পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দ্বিগুণ দেখা যায়, এবং মৃত্যুর পর পরীক্ষায় প্রায় পাঁচ গুণ দেখা যায়, এবং চিকিৎসার জন্য যাহা আসে তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ দেখা যায়,—যে সকল পীড়া চিকিৎসাধীনে আসে তাহা ৩০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে দেখা যায়, ৪০ হইতে ৬০ বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ বয়স (প্রাইস)। ইহাও সকলে স্বীকার করেন যে পৈত্তিক শূল হইতে মৃত্যু অতি কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে, এবং যে বিষয়ে কোনই মতদ্বৈধ নাই তাহা এই যে গলষ্টোন্ পীড়ায় সম্পূর্ণরূপ কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। এই বিষয়ে সকলে একমত যে পৈত্তিকশূলের অস্ত্রোপচার ছাড়া কোন আরোগ্য নাই। পীড়ার আক্রমণের সময় একমাত্র চিকিৎসা এই যে যন্ত্রণা উপশমের জন্য আফিং দিতে হয় এবং উহার সাধারণ ও সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক উপায় হইতেছে চামড়ার নীচে মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন্। অসুখ উপশম অবস্থায় আর একটি চিকিৎসা আছে যাহাতে পাথরি বাড়িতে না পারে ও পিত্ত অধিক সঞ্চারিত হয় এবং যদিও এবিষয়ে বিভিন্ন মত আছে, ইহার বিশেষ চিকিৎসা আছে এবং তাহার নাম বিরাম কালের চিকিৎসা।

ডাক্তার ক্যাল্‌ভার্টের সাক্ষ্য এই যে পূযাশয়ের নলে পাথর আট্‌কায় পৈত্তিক-শূলে কুমারের মৃত্যু হয়।

আর একটা ব্যাপার উল্লেখ করা প্রয়োজন। কুমারের অসুখ ও মৃত্যু বর্ণনা দিতে গিয়া রাণী ও সত্যবাবু পূর্ব্বের কোন বিবৃতি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু ডাক্তার আশুতোষ পূর্ব্বে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, এবং সেই মামলায় এই ব্যাপার বিচার্য্য বিষয় ছিল। ডাক্তার আশুতোষ ১৯২১ সালে মানহানি মামলায় দুইবার সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং এই মামলায় কুমারকে দার্জ্জিলিঙে সে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে অভিযুক্ত করায় সে লোকটীর নামে মোকদ্দমা করিয়াছিল। সে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এস, পি, ঘোষের নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং পুনরায় মিঃ বি, এম, ঘোষ নামক যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ পুনর্ব্বার বিচার করেন তাঁহার সমক্ষে সে সাক্ষ্য দিয়াছিল। ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট শ্রীপুর মামলা নামক যে সত্ত্বের মামলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেও সাক্ষ্য দিয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানহানির মামলা ঢাকার গভর্ণমেণ্ট উকিল রায় বাহাদুর এস, সি, ঘোষ ফরিয়াদী পক্ষ চালাইয়াছিলেন এবং তিনি এই মামলায় বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ মামলা বাস্তবিক পক্ষে ভাওয়াল রাজের দ্বারায় আনিত

হোয়াইট সাধারণ সজী-ঔষধ বলিতেছেন। বিবাদী পক্ষের মেজর টমাস বলিতেছেন যে প্রথম ব্যবস্থাপত্রটি ক্ষারবৎ অম্লনাশক ঔষধ, এবং যে কোন রকমের অজীর্ণ রোগ, এমন কি পেট ফাঁপা অজীর্ণের পক্ষেও উপযোগী।

ভাওয়াল কুমারের জন্য ঔষধের ব্যবস্থাপত্র

প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শিত বস্তুর সংখ্যা—	ঔষধ বিক্রেতার ধারাবাহিক চিহ্ন—	
		রি—
৫১(ই)	৩৪৩৯	ম্যাগ কার্ব
		সোডি কার্ব
		বিস্মাথ কার্ব
		পালভ্ ট্রাগাকান্থ্ কো, প্রত্যেকটি 3i
		অয়েল ক্যাজিপুট, মিনিম্ xii
		একোয়া মেন্থ্ পিপ এ্যাড আউন্স্ xi
		প্রত্যহ তিনবার সেব্য।
		স্বাঃ জে, টি, সি।
৫১ (বি)	৩৪৪০	
		রি—
	৩৪৪০।১	সোডি সাইট্রেট্ 3i
		একোয়া ষ্টেরিলাইজ্ড্ এ্যাড্ 3vi
		3i দুগ্ধের সহিত নির্দ্দেশমত
		রি—
		গ্লিসারিন্ পেপ্সিন্ 3ii
		নির্দ্দেশমত—
		পেপ্ পাউডার ফ্রেশ্
		স্বাঃ এন্, সি, সেন।
		রি—
		এ্যাট্রোপিন্ ট্যাব গ্রেন্ ১/১০০
		ষ্ট্রিনিন্ ট্যাব্ গ্রেন্ ১/৩০
		ডিজিট্যালিস্ ট্যাব গ্রেন্ ১/১০০
		ইথার পিওর ½ আউন্স
		মরফিয়া ট্যাব্ গ্রেন ১/৮
		স্বাঃ এন্, সি, সেন।

স্পিরিট্ ইথার্ 3iv
স্পিরিট্ এমন এ্যারোম্যাট্ 3iv
একোয়া ক্যাম্ফর এ্যাড্ আউন্স্ viii
½ অংশ একমাত্রা

আই, টি, এস্।

রি—
একস্ট্রাক্ট ওপিআই
বেলেডোনা
স্যাপনিস্ প্রত্যেক গ্রেন ½
৬টি বড়ি করিয়া পাঠাও
প্রত্যহ তিনবার সেব্য।
স্বাঃ জে, টি, সি।

প্রমাণ স্বরূপ প্রদর্শিত বস্তুর সংখ্যা—		ঔষধ বিক্রেতার ধারাবাহিক চিহ্ন—
৫১ (ডি)	৪২০	লিণ্ট্ স্যাপনিস্ 3ii সিনাপিস্ কো এ্যাড্ 3ii আদার গুঁড়ার সহিত সর্ব্বগাত্রে মালিশ করিতে হইবে। রি— বেলেডোনা এ এ Zii পেটের উপর প্রলেপ দিতে হইবে। স্পঞ্জিস্ লেনিন্ ১২ × ১২ স্বাঃ এন্, সি, সেন।

ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে ঔষধের দোকানের ব্যবস্থা পত্র গুলি সমান ভাবে ধারাবাহিক রূপে চলিয়াছে, কোথাও একটু বাদ নাই, এবং ইহাদ্বারা সে গুলি কত দ্রুত পর পর আসিয়াছে তাহাও বুঝা যায়। মেসার্স স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট্ কোম্পানী বোধহয় সেদিন সর্ব্বক্ষণ প্রতিবাদীর ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ প্রদান করা ছাড়া আর কাজ করে নাই। শেষ ঔষধ পাউডারটি সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বেই দেওয়া হয়। রাণী বলিয়াছেন সন্ধ্যার পূর্ব্বে নার্সেরা কুমারের দেহে এই পাউডার লাগাইতেছিল। ঔষধ বিক্রেতার ক্রমিক চিহ্নের উপর ভিত্তি করিয়া কত দ্রুত এইসকল ঔষধ আসিয়াছে আমি সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে

কিছুই বলেন না। একমাত্র আফিমের বড়ি ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা মলত্যাগ কালীন যন্ত্রণার উপশম হয় এবং মর্ফিয়া ইনজেকসনের পরিবর্ত্তে দেওয়া যাইতে পারে। জিতোর পাউডার ব্যবস্থাপত্র শরীরের খিল ধরা কমাইতে এবং শৈত্য কমাইয়া উত্তাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য ডাক্তারেরা শরীরে ডলিয়া দিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে ডেনহাম হোয়াইট এবং ম্যাকগিল-ক্রাইষ্ট একমত। বিলিয়ারী কলিকে হাতে পায়ে খিল ধরা দূর হয় কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উহা স্বীকার করেন। তাহার মত সমর্থন সম্বন্ধে "সেজার্স এনালিটীক প্রাকটীকাল মেডিসিন" ২য় খণ্ড ১৯১৫ সালের ছাপা ২৯১ পাতায় দ্বিতীয় কলমে একটী প্যারা দেখান। জেরায় স্বীকার করেন যে ঐখানে যে সমস্ত ঘটনার কথা লেখা আছে, তাহা অস্ত্রচিকিৎসার পরের ঘটনাসমূহ। তবে ইহাও বলেন যে তাহার কথিত ঘটনা বিরলই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রেসক্রুপশনগুলি হইতে অথবা নিম্নলিখিত অভিমতসমূহ হইতে নহে।

বিবাদীপক্ষীয় সাক্ষী মেজর টমাস

১। প্রাথমিক উদারাময়
২। হিমাঙ্গ
৩। পিত্তশূলের জন্য আফিমের বড়ি।
৪। পাকাশয়ের আক্ষেপ ও খিচুনী

বাদী পক্ষের সাক্ষী কর্ণেল ম্যাকগিলক্রাইষ্ট

১। প্রাথমিক উদরাময়
২। হিমাঙ্গ
৩। ঘন ঘন দাস্তের জন্য আফিমের বড়ি
৪। পাকাশয়ের আক্ষেপ ও খিচুনী

মেজর টমাস পাকাশয়ের আক্ষেপ ও খিচুনী স্বীকার করিতে চাহেন নাই। কিন্তু বিবাদী পক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পিত্তশূলে ঐরূপ হইতে পারে কিনা এবং মেজর টমাস স্বীকার করেন যে তাহা হইতে পারে এবং তিনি বলেন জিঞ্জার পাউডার (আদার গুঁড়া) ঔষধ দৃষ্টে তাহাই মনে হয় তবে তিনি উহা দিবেন না।

মেজর টমাসের সঙ্গে মেজরাণীর বর্ণিত ঘটনাবলী একেবারে হুবহু মিলিয়া যায়। কুমার সকাল হইতে বেলা দশটা পর্যন্ত সুস্থ ছিলেন। ১০টার সময় হিক্কা ও অল্প ব্যথা আরম্ভ হয়, ১২টার সময় হইতে অসহ্য বেদনা ও রক্তদাস্ত

হইতে থাকে। কর্ণেল কালভার্ট ২টার সময় আসেন এবং কুমারকে একটা ইনজেকসন নিতে অনুরোধ করেন। বিকাল ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে ইনজেকসন্ দেওয়া হয় এবং বেদনা কমিয়া আসে।

সন্ধ্যার সময় নার্সেরা আসে এবং গুঁড়া ঔষধ গায়ে মালিস করিতে থাকে। ঐ সময় ডাক্তার বি, বি, সরকার আসেন এবং দুপুররাত্রে কুমারের মৃত্যু হয়।

তাহার বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে, সন্ধ্যা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন চিকিৎসাই হয় নাই। ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে আদালতের সম্মুখে যে সমস্ত ব্যবস্থাপত্র ও টেলিগ্রাম দাখিল করা হইয়াছে, উহাই ঐ দিনের সমস্ত ব্যবস্থাপত্র এবং টেলিগ্রাম, কেবল মৃত্যুর টেলিগ্রাম মাত্র আদালতের সম্মুখে স্থাপন করা হয় নাই।

সত্য, আশু, বীরেন এবং বিপিন খানসামা ইহারা সকলেই আদালতে আসিয়া রাণীর কথিত ঘটনা সমর্থন করেন। এখন নিম্নলিখিত ঘটনা সমূহ আলোচনা করা যাক—

(১) সকালে কুমার সুস্থ ছিলেন, ডা ক্যালভার্ট তখন আসিয়া কুমারকে ইনজেকসেন দিবার কথা বলেন। মৃত্যুর জন্য শোক-জ্ঞাপক পত্রে ইহাই বলা হইয়াছে যে, তাহাকে ইনজেকসন দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করা হয়। জেরায় জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যখন কুমার সুস্থ ছিলেন তখন তাহাকে কেন ইনজেকসন দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। সত্যবাবু এই মিথ্যা সাক্ষ্যের অসুবিধা দেখিয়া বলেন যে কুমার সম্যক সুস্থ ছিলেন না, তাহার অল্প অল্প বেদনা ছিল এবং আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তাহাকে ইনজেকসন দিবার কথা ওঠে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বর্ণনা, কেননা ডাঃ কালভার্ট বলিয়াছেন যে ঐ দিনের পুর্ব্বে তাঁহার আর বেদনা হয় নাই, কিন্তু তত্রাচ তিনি ইনজেকসন দিতে চাহিয়াছিলেন এবং দিতে না পারিয়া শুধু উদরাময়ের জন্য তিনি একটী ব্যবস্থাপত্র করিয়াছেন।

কিন্তু মানুষের অল্প উদরাময় হইতেই হিমাঙ্গ হয় না।

কখন তিনি হিমাঙ্গ হইয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব্বে কি হইয়াছিল তাহা এখন আলোচনা করা যাক্।

বার বৎসর পূর্ব্বে আশু ডাক্তার অন্য এক মামলায় সাক্ষী দিতে যাইয়া বলেন,—১২ বৎসর পূর্ব্বে একটী মোকদ্দমায় এই হিমাঙ্গ অবস্থাই বিচার্য্য ছিল, এবং ঐ মোকদ্দমা এষ্টেট কর্ত্তৃক করা হইয়াছিল। ঐ মোকদ্দমায় ডাঃ আশুতোষকে রায় বাহাদুর এস, পি, ঘোষ জবানবন্দী করান তাহাতে ডাঃ

আশুতোষ বলিয়াছিলেন,—তাঁহার মৃত্যুর দিনে সকাল বেলা তাহার খুব গুরুতর রকম পেটের অসুখ হয়। তিনি ভয়ঙ্কর রক্তবাহ্ করেন। উহার ২দিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি উদরাময়ে ভুগিতেছিলেন।

জেরায় ডাঃ আশুতোষ ৭ই রাত্রিতে কুমারের পিত্তশূলের কথা বর্ণনা করেন, এবং তজ্জন্য ডাঃ কালভার্ট ব্যবস্থাপত্র দেন। কিন্তু ঐ ব্যবস্থাপত্র ডাঃ কালভার্টের নহে উহা তাহারই, ৮ই তারিখের ঘটনা সম্বন্ধে বলেন—রাত্রি ২।৩টার সময় ডাক্তার কালভার্টকে ডাকিতে পাঠান হয়। পরদিন ৭টা ৭॥ টার সময় ডাঃ কালভার্ট আসেন এবং ইন্‌জেকসন দিতে বলেন। কুমার আপত্তি করেন। ডাঃ কালভার্ট পরে ডাঃ নিবারণচন্দ্র সেনের সহিত আসেন। ডাঃ কালভার্ট তাহাকে ২৪ ঘণ্টার জন্য নিযুক্ত করেন। সকাল বেলা ডাঃ কালভার্ট ব্যবস্থাপত্র দেন, তবে তিনি কি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই। তিনি পুনরায় বেলা ২টার সময় আসেন, কিন্তু অবস্থায় কোন উন্নতি দেখা গেলনা। তিনি আবার রাত্রি ৮টার সময় আসেন, কুমার যেন তখন রক্ত বাহ্ করিতেছিলেন। রক্ত বাহ্যের কোন রাসায়নিক পরীক্ষা হয় নাই। ডাক্তার ক্যালভার্ট উহা পরীক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার তাহা জানা নাই। ডাঃ ক্যালভার্ট ও ডাঃ নিবারণ সেন, কুমারকে ঔষধ খাওয়ানের জন্য ২।৩ জন নার্স নিযুক্ত করেন। মৃত্যুর দিন বেলা ৮টা হইতে রক্ত দাস্ত আরম্ভ হইল। ১০।১২ বার দাস্ত হয়, বাহ্যেতে রক্তও ছিল। কতবার রক্ত পড়িয়াছিল তাহা আমি আন্দাজে বলিতে পারি না। বাহ্যের সহিত যে রক্ত ছিল তাহা লাল রংএর।—২৭।১।২২ তারিখে এই সাক্ষ্য মিঃ এস, সি, ঘোষের সম্মুখে মানহানির মোকদ্দমায় দেওয়া হয়।

শ্রীপুর মোকদ্দমায় ও ঐ কথা বলেন—যন্ত্রণার কথা ৪টা অথবা ভোর ৫টায়, ডাক্তার ক্যালভার্টের কথা—সকাল ৭টা অথবা ৮টা এবং ইন্‌জেক্‌সনের জন্য বলা, রক্তবাহ্যের কথা বলেন, বেলা ১০টা কি ১১টা এবং আরও বলেন রক্ত বাহ্ বন্ধ করিতে "ডাঃ ক্যালভার্ট, ব্যবস্থা পত্র পাঠান" (এক্সিবিট ৩৯৪ (২) এবং ৩৯৪ (৮)। ৮ই সকাল বেলায় মধ্যম কুমারের যন্ত্রণা ছিল এবং যন্ত্রণায় তিনি ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন। ঐ দিনকার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"বেলা ২টার পর হইতে কুমারের নাড়ীর অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল"। (Exhibit ৩৯৪।১১) ৪টা ৫টার সময় দেহ হিম হইয়া গেল।" তাহার পূর্ব্বকার সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে রাত্রি ২টা, ৩টা অথবা ৪টার সময় যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। যন্ত্রণা এত কষ্টদায়ক হইল যে রাত্রি ৪টার সময়ই ডাক্তার কালভার্টএর নিকট লোক পাঠাইতে হইয়াছিল। ডাক্তার কালভার্ট বেলা

বলেন বাহ্য পাতলা ছিল এবং তাহার মধ্যে রক্ত ছিল, এবং কুমারের এরূপ ১০।১২ বার বাহ্য হইয়াছে। রাণী বলেন—বাহ্য পাতলা, কিন্তু ঠিক জলের ন্যায় নহে। রাণী আরও বলেন তাহাতে আমও মিশ্রিত ছিল। আম কেন মিশ্রিত ছিল তাহার কারণ পাওয়া যাইবে,আশুবাবুও অবশ্য ঐরূপ কথাই বলেন, —পাতলা বাহ্য কিন্তু জলের ন্যায় নহে, তবে চা'ল ধোয়া জলের ন্যায় এবং তাহার সঙ্গে রক্ত ছিল। রক্ত যে লাল রং এর একথা সকলেই স্বীকার করেন। আশুবাবু এবং সত্যবাবু জল বাহ্য মানে ঠিক জলের মত নহে, তবে তরল এবং ছাকা ছাকা ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বহু অবান্তর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু "জল বাহ্য" একথাটা মুকুন্দই ব্যবহার করিয়াছিল। মুকুন্দ একজন বি, এ, ফেল ব্যক্তি। বাঙ্গালী জলের মত পাতলা বাহ্য বুঝাইতে "জল বাহ্য" এই কথাই ব্যবহার করিয়া থাকেন, সত্যবাবু তাহা স্বীকার করিয়াছেন। রক্তের পরিমাণ যখন সঙ্গে জড়ান ছিল তখন উহা পরিমাণে কম অথবা মলের মত একথা কেহই বলেন নাই। কিন্তু আদালতে মল অতিরিক্ত এবং ভয়ানক একথা কেহই বলেন নাই। আশুবাবু "ভয়ানক" শব্দটী পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং মিষ্টার এস, পি, ঘোষের নিকট আগেকার মোকদ্দমায় যে অভিমত দিয়াছিলেন, এখনও সেই অভিমত পোষণ করেন। যে তাঁহাকে যদি ঐ রক্ত সম্বন্ধে চিকিৎসা করিতে হইত তাহা হইলে তিনি, —ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অথবা ল্যাক্‌টিট অথবা এড্রেনেশেন দিয়াই চিকিৎসা করিতেন। যখন তিনি কুমারের ঐ বাহ্যকে ভয়ঙ্কর বলিয়াছিলেন তখন এই কথা বলিয়াছিলেন এবং তাহা এখনও বলেন, এবং ঐ ঔষধগুলি রক্ত-স্রাব বা গুরুতর শোণিত নিঃসরণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এ সম্বন্ধে হল-হোয়াইটের ভৈষজ্যদ্রব্য তত্ত্ব (Materia Medica) হইতে দেখান হইয়াছে (হল হোয়াইটের ভৈষজ্য দ্রব্যতত্ত্ব পৃষ্ঠা ৫৩,—১৮ সংস্করণ) যে, যখন ভীষণভাবে শোণিত নিঃসরণ হয় তখন উহাকে ঘনীভূত করিবার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অথবা ল্যাকটেট ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় "এড্রেনেগেল" দ্রষ্টব্য। এড্রোনলে ধমনীর সঙ্কোচনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ঐ দিনের প্রধান উপসর্গই ছিল রক্তস্রাব।

বাদী আসিবার বহুপূর্ব্বে ১৯১৭ খৃঃ রাণী সত্যভামা বর্দ্ধমানের মহারাজকে পত্রে কুমারের মৃত্যুর গুজবের কথা লিখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে কুমার রক্ত দাস্ত হইয়া মারা যান। বিবাদী পক্ষ খবরের কাগজে যে মৃত্যুর রিপোর্ট বাহির করেন, তাহার উপর জোর দেন। মৃত্যুর কারণ বাহির করিতে, শুধু এই দুইটী দলীলের উপরই একমাত্র নিভর করি

মিথ্যা প্রমাণিত হয়, এবং সেইদিন দুপুর বেলায় মৃত্যু হওয়ায় সকালবেলা যে ভাব ছিল তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। আশুর পূর্ব্বকার সাক্ষ্যানুসারে রক্তমিশ্রিত বাহ্য নিবারণ করিবার জন্য প্রাতঃকালের অনুগ্র ঔষধের ব্যবস্থাপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, কারণ ঐ রোগের উপযোগী আর কোন ব্যবস্থাপত্র নাই। আশু এখন তাহা স্বীকার করেন না, কিন্তু তিনি এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে ডাক্তার ক্যালভার্ট যদি প্রাতঃকালে রক্তবাহ্য দেখিতেন তবে তিনি এইরূপ ব্যবস্থা অনায়াসেই করিতে পারিতেন। তাহার পরীক্ষার জন্য দুপুরবেলা যে রক্তবাহ্য রাখা হইয়াছিল তাহা দেখিবার পূর্ব্বে তিনি সকালবেলা যাইয়া যে এই ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন কি না, তাহা তাহার স্মরণ নাই।

আমার মনে হয় উদরাময়ের সহিত রক্তবাহ্য হওয়াই প্রধান রোগ। ইহা যে পিত্তশূল নয় তাহার পক্ষে অশেষ কারণ আছে। আমি এখানে তাহাদের কয়েকটি কারণ মাত্র উল্লেখ করিব।

(এ) কোন টেলিগ্রামে এমনকি আশুর (টেলিগ্রামে) পিত্তশূলের কোন উল্লেখ নাই। (২) পিত্তশূলের ফলে উদরাময় বা রক্তমিশ্রিত বাহ্য হয় না। কোষ্ঠকাঠিন্যই ইহার সহচর। ডাক্তার ক্যালভার্ট একথা স্বীকার করেন এবং উদরাময় না দেখিয়া তিনি যে রক্তমিশ্রিত আমবাহ্য দেখিয়াছেন, উহা ইহার ফলমাত্র। পৃযকোষস্থ রসবাহিকা নালীর অভ্যন্তরে পাথরের ঘর্ষণের ফল। তিনি বলেন যে তিনি শব পরীক্ষার সময় অন্ত্রের মধ্যে রক্ত দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যখন রক্ত রসবাহিকা নালীর এবং অন্ত্রের মধ্য দিয়া আসে তখন উহার বর্ণ কৃষ্ণ হইয়া যায়। কর্ণেল ম্যাকগিলক্রিষ্ট ইহার এইরূপ কারণ দেখাইয়াছেন, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে পাথর গুলি নালীর ভিতরে ক্ষত করায় রক্ত বাহির হইতে আরম্ভ হয়, এবং এই রক্ত 'ডিউডেনামে' প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে পঁচিশ ফিট লম্বা ছোট বড় অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হয়; ইহা নিঃসরণ সময়ে পরিপাক হইবে, কাজে কাজেই ইহা বাহির হইলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে। টাটকা লালরক্ত মলদ্বারের সঙ্কুচন বুঝায় অর্থাৎ গুহ্যদ্বার দিয়া রক্ত পড়িতেছে। ইহার উপর কিছু হইলে লালরক্ত পড়িবে না। মেজর টমাস্ ভিন্ন অন্য কেহ ইহার যাথার্থ্য অস্বীকার করিতে পারিত না। তিনি বলেন যে তাহাকে উদারময়ের কথা বলা হয় নাই, কিন্তু তিনি ধরিয়াছিলেন যে ঐ দিন যে বাহ্য হইয়াছিল তাহার মধ্যে আম এবং যৎসমান্য রক্ত বর্ত্তমান ছিল। এবং ঐ বিষয়ে জেরার সময় যখন তাহার অভিমত লওয়া হয়। তখন আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় কল্পনার আশ্রয়

লইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে 'গলষ্টোন' বলিতে 'গলব্লাডারের' প্রদাহ বুঝায়। ইহার ফলে পূয জন্মায় এবং এই পূয অন্ত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এমন এক প্রদাহের সৃষ্টি করিতে পারে, যাহার ফলে রক্তামশায়ের ক্ষত হইয়া, আম এবং রক্ত মিশ্রিত মলত্যাগের কারণ হইতে পারে। তাহার অভিমত এইভাবে লওয়া হইয়াছিল।

প্র—কর্ণেল ক্যালভার্ট জানাইয়াছেন বাহ্যের সহিত রক্তমিশ্রিত আম এবং কাচা রক্ত পড়িয়াছে বলিয়া তাহাকে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল ?

উ—না, উহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

জেরার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল।

প্র—কুমারের উদরাময় হইয়াছিল, এ খবর আপনি কি জানিতেন ?

উ—না, জানিতাম না।

প্র—আপনি কি জানেন যে কুমারের বমন হইয়াছিল এবং তাহাকে জোলাপ দিয়া মলত্যাগ করান হইয়াছিল ?

উ—আমার মনে হয় যে তাহার বমনেচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু বমন হয় নাই। মলত্যাগ করাইবার বিষয়ে আমার মনে হয় যে তাহার বাহ্যের সহিত আম এবং একটু রক্তও পড়িয়াছিল। কেহ কেহ উহাকে রেচন করান বলিবেন। আমি ইহাকে রেচন করান বলি না।

এই অভিমত কোন কাজেই লাগে না। রক্তামশায়ের কথা উদরাময়ের দ্বারা বাতিল হইয়া যায়।

প্রতিবাদীপক্ষের কর্ণেল ডেনহাম-হোয়াইটকেও ঐরূপ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, মলের সহিত আম এবং রক্ত থাকিলে উহাদ্বারা আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের লক্ষণ প্রকাশ পায় কিনা ? তিনি উত্তরে না বলিয়াছেন—প্রত্যেকেই না বলিবেন। তরল বাহ্যের সহিত রক্ত এবং উদরাময়ের কথা স্বীকার করিয়া লইলে ডাক্তার ক্যালভার্টের রক্তমিশ্রিত আম বাহ্যের বিষয় আলোচনা করিলে কি ফল হইবে তাহা বুঝা কঠিন ; যে সব লক্ষণ মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে পিত্ত-শূলের ফলে উদরাময়ের সহিত টাটকা লাল রক্ত পড়িতে পারে না।

(সি) পিত্তশূলের যন্ত্রণার সময় কুমারকে ইনজেকসন দিবার প্রস্তাবে তিনি অসম্মত ছিলেন, ইহা ভিন্ন তাহার পিত্তশূলের কোন চিকিৎসা করার চেষ্টা করা হয় নাই। আফিংয়ের বটিকা সেবন ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না ; এবং যদিও উহা পিত্তশূলের প্রতিষেধক হয়, উহা দ্বারা রক্ত নিঃসরণ বন্ধ হয় না ; এবং যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে অবশেষে একটি ইনজেকশন দিবার পর বেদনা

বাদী ফিরিয়া আসিলে সত্যবাবুই ইহার নকল রেভিনিউ বোর্ডের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই সকল হইতে বোঝা যায় যে ১৯২১ সালের মে মাসে এই পত্র প্রথম বাহির হইয়াছে। ২০দিন পূর্ব্বে বাদী নিজ পরিচয় দিয়া সম্পত্তির দাবী করিলে মিঃ নিড্হাম বাদীর মৃত্যুর প্রমাণ চাহিয়া পাঠান। তখন এই চিঠি এবং ইহার একখানা নকল মেজরাণীকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আমি এই সকল কথা বিশ্বাস করি না। ইহা আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য প্রথমে জয়দেবপুরে পাঠান হইয়াছিল; পরে যথাসময়ে বড় সাহেবের কাছে পাঠান হয়। আমি দেখিতেছি পিত্তশূল গল্প মাত্র। ইহাতে মলে তাজা রক্ত থাকিতে পারেনা এবং কর্ণেল ম্যাক্গিলক্রাইষ্টের মতে পিত্তশূলের চিকিৎসাও হয় নাই। কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট ইহার সহিত একমত। মেজর টমাস—যখন বলিলেন যে আফিংয়ের বড়িই এ জায়গায় একমাত্র ঔষধ, পেটের অসুখ হইলেও উহাই দেওয়া উচিত ছিল—আর শূলবেদনা ধরিলে পেটের অসুখের কোন চিকিৎসাই হইবে না। এই বিষয় তিনি স্থূলত উক্ত দুইজন ডাক্তারকেই সমর্থন করিয়াছেন।

কুমারের চিকিৎসা বিভ্রাট

ডাঃ কালভার্ট ইহা দেখিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন,—রক্তের জন্য কোন চিকিৎসার দরকার নাই, কারণ রক্তের সঙ্গে কোন তরল মল নাই। মলে যে আম রক্ত আছে তাহা সামান্য (fivial)। রক্তশূলের কথা ছাড়িয়া দিলেও ৮ই তারিখের উপসর্গগুলির কারণ কি? যে উপসর্গগুলি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা প্রাতঃকালে বমি, ঘন ঘন রক্ত দাস্ত, অস্থিরতা এবং অবসাদ ও হিমাঙ্গ অবস্থা---তারপর খিঁচুনি এবং শেষ পর্য্যন্ত যাহা দেখা যায় তাহা হইতেছে পাকস্থলীর ব্যাঘাত; আশু ডাক্তার ও ইহা স্বীকার করিয়াছে। পাকস্থলীতে বেলেডোনা মলমই শেষ ঔষধ প্রয়োগ। খিচুনিদ্বারা শরীরে জলীয় পদার্থের অল্পতা—হিমাঙ্গ অবস্থা অর্থে রক্তের অপ্রাচুর্য্য, তীব্র বেদনা ও স্নায়ুকেন্দ্রে অতিরিক্ত উত্তেজনা বুঝায়। মলের রক্ত লাল—সে জন্যে রক্তদাস্ত দ্বারা অন্ত্রের চাপ (congestion) বোঝা যায়। ডাঃ ম্যাক্গিলক্রাইষ্টের মতে এই সকল আর্সেনিক বিষের লক্ষণ। ইঁহার অন্যমতগুলিরও কেহ আপত্তি করেন নাই। তাহার এই মতটী কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটও সমর্থন করেন। অন্ত্রের এই স্ফীতি কোন উত্তেজক পদার্থের ফল। এই উত্তেজক পদার্থ অনেক কিছুই হইতে পারে, আর্সেনিক ও তাহার মধ্যে একটা। লায়নের জুরিস্‌-প্রুডেনস্ বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমার কাছে উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহাতে

গোপনীয় · টেম্পেল কম্ব
১০৩ উইলিংডন রোড
ঈষ্ট বোর্ণ
৩রা আগষ্ট ১৯২১।

প্রিয় মহাশয়,

ভাওয়ালের কুমারের কথা আমার মনে আছে। তিনি ১৯০৯ সালের মে মাসে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। তিনি 'গলষ্টোনে' ভুগিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যু আমার মনে রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। যদি তিনি আমাদের উপদেশ মত চলিতেন, তাহা হইলে এভাবে মারা যাইতেন না। মৃত্যুদিনে তাঁহার তীব্র পিত্তশূলের ব্যথা হয়। একটা মরফিয়া ইন্‌জেকসনেই তৎক্ষণাৎ আরাম পাওয়া যাইত। তিনি সাব্‌কিউটিনাস্ ইন্‌জেকসন নিতে অস্বীকার করেন, কারণ মৃত্যুকালে তাঁহার মা একটী হাইপোডারমিক ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার পরেই মারা যান—তিনি, রোগ যে মৃত্যুর কারণ ইহা না বলিয়া এই ইন্‌জেকসনকেই মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই রোগের জন্য চিকিৎসা করা উচিত ছিল। ভেদ বমির জন্য মুখ দিয়া ও গুহ্যদ্বার দিয়া আফিং দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। উৎকট যন্ত্রণা যখন উপশম করা গেল না; তখন তাহা হইতে অবসাদ আসিল এবং অবসাদ হইতেই মৃত্যু ঘটিল। আমি মৃত্যুর সময়ে তাঁহার কাছে ছিলাম কিনা সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না—কিন্তু মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে অবসন্ন ও হিমাঙ্গ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়াছি। শেষ বার যখন তাঁহাকে দেখি তখন তাঁহার বাঙ্গালী চিকিৎসকটি উপস্থিত ছিলেন, এবং অধুনামৃত কর্ণেল মেকাস্ আই, এম এস্, কে পরামর্শের জন্য সকাল বেলায় ডাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কর্ণেল মেকাস্ ঢাকার সিভিল সার্জ্জেন ছিলেন এবং এই পরিবারটির সহিত পরিচিত ছিলেন। কুমার এই অবসাদ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই এবং ঐ রাত্রেই মারা যান।

ভবদীয় বিশ্বস্ত—
জে. টি, ক্যালভার্ট

ইহা জানা যায় না যে, চিঠিতে তাঁহাকে কি খবর দেওয়া হইয়াছিল—যাহার উত্তরে তিনি উপরের এই চিঠি লিখিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন, একথা ১৯২১ সালে তাঁহার স্মরণ ছিল না। এফিডেবিট্ দেখিয়া পরে তাঁহার ইহা মনে হইতে পারে। এই চিঠির পর তিনি অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এই ঘটনার কথা তাহার মনে ছিল

ডাঃ কালভার্টের এই কথাটা সত্য নয়। আমি বেশ ভালভাবেই বুঝিয়াছি যে তাঁহার এই স্মরণ থাকা—'১৪ দিনের অসুখের'—'মাঝে মাঝে ব্যথা' এবং 'প্রত্যহ রোগী দেখা'রই মত। তাহার এফিডেভিট্ ছিল বলিয়া তাঁহাকে স্মৃতি হইতে অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। একটী কথা ত সম্পূর্ণই মিথ্যা—আর একটিও প্রায় তদ্রূপ। কারণ যাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না এইরূপ কতকগুলি ঘটনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায় যে মধ্যম কুমারের ৮ই মে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে মৃত্যু হইয়াছিল বা মৃতবৎ মনে করা হইয়াছিল।

এই সিদ্ধান্তটি নিম্নের ঘটনাগুলির দ্বারা—পৃথক করিয়া নয়, সবগুলিকে একসঙ্গে মিলাইয়া লইলে পাওয়া যায়—

(ক) রোগের গতি অবসাদের মত মৃত্যুর দিকেই ছিল—নাড়ী ছিল না—সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘুঁটের গুঁড়া দিয়া হাত পা ঘষা হইতেছিল—বিবাদীগণই এই কথা স্বীকার করেন। রাণীর জবানবন্দিতে চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাঃ বি, বি, সরকারের আগমনের পর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনও কথা নাই।

(খ) মৃত্যুর পূর্ব্বে সর্ব্বশেষ টেলিগ্রামের সময় হইতেছে বৈকাল ৩-১০ মিনিট ষ্টাণ্ডার্ড সময় অর্থাৎ ৩-৪০ এই রকম স্থানীয় সময়।

৪-৪৫ মিনিটে বড়কুমার যে টেলিগ্রাম করিয়াছেন তাহাতে আছে—ভয়ানক চিন্তিত, ঘন ঘন অবস্থা জানাও। সবচেয়ে ভাল চিকিৎসক দেখাও। বর্ত্তমান অবস্থা টেলি করিয়া জানাও। এই টেলির কোন জবাব দেওয়া হয় নাই অথচ ৬টার মধ্যে এর উত্তর আশা করা হইতেছিল।

(গ) সন্ধ্যার পর ডাঃ বি, বি, সরকারের দেখতে আসা।

সত্যবাবু এই ডাক্তারের দেখা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ:—সন্ধ্যার সময় তিনি সম্ভবতঃ ঔষধের তাগিদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। সব ঔষধই আগে আসিয়াছিল। এই সময় বিভারাণীর মামা সূর্য্যনারায়ণ বাবুর সঙ্গে চৌরাস্তায় দেখা হয়। তাহার মামা তখন সরকারী উকিল মহেন্দ্রনাথ বানার্জ্জীর বাড়ী 'বলেন ভিলার' এক অংশে বাস করিতেন। তিনি একা ছিলেন, সঙ্গে পরিবার ছিল না।

সত্যবাবু তাঁহার কাছে আসিয়া মেজ কুমারের অসুখের কথা বলেন,—সূর্য্যবাবু অসুখের কথা পূর্ব্বে জানিতেন না,—যদিও তিনি পিতার ন্যায়, সত্যবাবু তাঁহার মা ও রাণীকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাকে অসুখের কথা বলা হয় নাই। সত্যবাবু তাঁহাকে কুমারের অসুখের কথা এবং কোন্ কোন্ ডাক্তার দেখিতেছে তাহাদের কথা

৭॥টার সময় তিনি সে ঘরে আসেন তখন কুমারের মৃতদেহ ও ডাঃ বি, বি সরকারকেও সে ঘরে দেখিয়াছেন। তিনি (ডাঃ সরকার) তখনই সেখান হইতে চলিয়া যান নাই। বাঙ্গালী বলিয়া তিনি সেখানে মৃতদেহটী না লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া ভালই করিয়াছেন। বিবাদীগণ তাঁহার যে ডাইরী দাখিল করিয়াছে, তাহাতে ৮ই তারিখে লেখা আছে—"ভাওয়ালের কুমারের কাছে কয়েক ঘণ্টা।"

বিজলী সরকারের জবানবন্দীতে দেখা যায় যে ১৯৩৫ সালের মে মাসের বিবাদীপক্ষের এক উকিল এই ডাইরী দেখিয়াছেন। রাণীকে ফেব্রুয়ারী মাসে জেরা করা হয়। একথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তাহার উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। ডাঃ আশু ও বীরেন্দ্র তাঁহাকে কয়েক মিনিট রাখা হইয়াছিল বলিয়া বলিয়াছে। দেখা যায় যে ডাঃ ক্যালভার্ট ৮টায় খানা খাইতে চলিয়া গেলে, সত্যবাবু তাঁহাকে পাশের বসিবার ৫নং ঘরে বসান—এখানেই রামসিংহ সুভা কুমারকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়।

তাঁহার (সত্যবাবুর) নিজের ডাইরীতে লেখা আছে—তিনি বলেন ইহা প্রায় তিন দিন পরে লেখা, কাজেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে। সত্যবাবু ৮ই তারিখে লিখিয়াছেন "কুমার রমেন্দ্র দার্জ্জিলিংএ ষ্টেপএসাইডে মধ্যরাত্রে মারা যান—৪জন ডাক্তার দেখিয়াছিল।"

১। পারিবারিক ডাক্তার আশু দাসগুপ্ত, ২। রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ ৩। বি, বি, সরকার এম বি ৪। লেফ্‌টানেণ্ট কর্ণেল কালভার্ট। মৃত্যুকালে সকলেই উপস্থিত ছিলেন।"

তিনি বলেন, বি, বি, সরকার ছাড়া আর সকলেই তখন সেখানে ছিলেন এ কথা সত্য। কিন্তু সত্য কথা হইতেছে ডাঃ বি, বি, সরকার ও ডাঃ আশুতোষ ছাড়া আর কেহই ছিলেন না।

মৃত্যুর টেলিগ্রাম কোথায়

বিবাদীরা কেহই এই টেলিগ্রামের কথা জানে বলিয়া মনে হয় না। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে দার্জ্জিলিংএ যে সকল সাক্ষী ছিল—তাহাদের কেহ এমন কি সত্যবাবু কেহই এ কথা জানেন না যে কে, এবং কখন এই টেলিগ্রাম দিল এ বিষয়ে কেহই কিছু বলেন নাই, কেবল বীরেন্দ্র শ্রীপুর মোকদ্দমার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে গিয়া বলিয়াছে যে ডাঃ ক্যালভার্ট এই টেলিগ্রাম করিয়াছেন, এখন বলে যে, মৃত্যুর পরে তাঁহাকে (ক্যালভার্ট) টেলিগ্রাম করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। ইহা স্বতঃই দেখা যায় যে, সে বাড়ীতে এতগুলি চাকর ছিল এবং কালভার্ট এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না।

জন্য অনুরোধ করে। প্রিন্সিপাল মৈত্রের এই অনুরোধের কথা স্পষ্ট মনে আছে। এই খবরের পর তাঁহাদের গল্প ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাঁহাদের স্মৃতিতে এটা বেশ দাগ কাটিয়া আছে। এই একবার ছাড়া প্রফেসার রাধাকুমুদ মুখাৰ্জ্জী, প্রফেসার মৈত্র ও ডাঃ হীরালাল রায়ের সঙ্গে স্যানিটোরিয়ামে থাকেন নাই। তিনি বলেন এই সময় স্যানিটোরিয়ামে থাকিতে ঐ সন্ধ্যা ছাড়া ভাওয়ালের কুমারের আর কোনও খবর শুনি নাই। তখন আমরা কমন রুমে বসিয়াছিলাম। লোকটি কুমারের মৃত্যু সংবাদ দিয়া চলিয়া গেল।

প্রঃ—আপনাদিগকে মৃত্যু সংবাদ কেন দিয়াছিল ?

উঃ—তাহারা মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়ার জন্য লোক খুঁজিতেছিল।

আমার যতদূর মনে আছে, তাহাতে মনে হয় মাত্র একজন লোক ঐ সাহায্যের জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু কতজন লোক আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে আমার সঠিক মনে নাই। কিন্তু আমার ঠিক মনে আছে খবরটি আসিয়াছিল। আমাদের রাত্রে খাওয়ার ১ ঘণ্টার পূর্ব্বেই সে আসিয়াছিল। খাওয়ার ঘণ্টা ৮টা হইতে ৮৷৷টার মধ্যেই পড়িত—৮টার পূর্ব্বে নয়।

খাওয়ার পর আমি কখনও কমন রুমে আসিতাম না। কারণ শীতের জন্য আমি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতাম না। শ্মশান নীচে অনেক দূরে—এবং শরীর সুস্থ নয় বলিয়া আমি শ্মশানে যাই নাই।

সংবাদটীর স্থান কাল ও সময় সম্বন্ধে ডাঃ রায় বিশেষভাবে একমত। ইহা রাত্রের আহারের পূর্ব্বে যখন তাঁহারা কমনরুমে ছিলেন তখন। মিঃ রক্ষিতের এই খবরটি সম্বন্ধে ঠিক মনে আছে যে, যখন তাঁহারা খাওয়ার পূর্ব্বে কমনরুমে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন তখনই আসিয়াছিল।

দাহ করিবার তারিখ বলিতে পারেন না,—তাহারা খবরটির বর্ণনা ও দিতে পারেন না। কেহই কুমারকে চিনিতেন না,—বা কোন অনুসন্ধিৎসা ছিল না। ডাঃ রায় বলেন ব্যাপারটা তাহার মনে কোন দাগ রাখিয়া যায় নাই,—তবে এটা একটা দুঃসংবাদ। তাহাদের বেশ মনে আছে লোকটি আসিয়া খবরটি দিল এবং সাহায্য প্রার্থনা করিল। তখন তাঁহারা রাত্রে খাওয়ার পূর্ব্বে কমনরুমে ছিলেন—রাত্রের খাওয়া সাধারণতঃ ৮টার সময় হইত।

উল্লেখযোগ্য অভিমত

এতে তাহাদের কোন লাভ নাই। তাঁহারা কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। আমি ইহাদিগকে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক মনে করি,—এবিষয়ে এদের কোনও স্বার্থ নাই। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাহাদের মনে ছিল না, এই

প্রমাণ করার জন্য তাঁহাদিগকে জেরা করা হইয়াছে,—এবং অভিমত এই যে এবিষয় তাঁহারা কাগজে পড়িয়াছেন। এবং ডাঃ রায় ও ডাঃ মুখার্জ্জী দুইজনই জবানবন্দি দেওয়ার পূর্ব্বে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ চৌধুরী, ডাক্তার মুখার্জ্জীর নিকট হইতে বাহির করিয়াছেন যে, যখন তিনি কাগজ পড়িতেন তখন এ ঘটনার কথা মনে হইয়াছে এবং মিষ্টার চৌধুরী ডাক্তার মুখার্জ্জী হইতে বিবৃতি লইয়াছিলেন যে প্রিন্সিপাল মৈত্রের সাক্ষ্য তিনি পড়িয়াছিলেন এবং যত্নসহকারে তাঁহার এজাহারে তাঁহার পক্ষে আসিয়া এজাহার দেওয়ার হাঙ্গামার অসুবিধাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মিষ্টার চৌধুরী সাক্ষীদিগের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করিবার সময় আশুতোষ চৌধুরী কবে মারা গিয়াছিলেন এবং তজ্জাতীয় প্রশ্ন সাক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সাক্ষীগণ ঘটনার তারিখ ছাড়া আর বিশেষ কিছু বলিতে পারে নাই, সমস্ত ঘটনা নিখুঁতভাবে বলাও সম্ভবপর নহে। রাস্তায় কোন ঘটনা কাহারও চক্ষে পড়ে, তখনই সেই ঘটনা তাহার মনে উদয় হইবে এবং ঘটনাটি যে সময়ে ঘটিয়াছিল, সেই সময়ও মনে পড়িবে, যদিও ঠিক তারিখটী তাহার স্মরণ-পথে না আসে। উভয় পক্ষের শত শত সাক্ষী এজাহার দিয়াছে যে তাহারা বাদীকে সকাল বেলা, সন্ধ্যাবেলা, মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে দেখিয়াছে, কিন্তু কেহই তারিখের কথা বিশেষ বলিতে পারে নাই। ৮ই মে তারিখের পর শোকসভা এই সাধারণ ঘরে হইয়াছিল। ডাক্তার তাহার তারিখ বলিতে পারেন নাই। তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন যে এই শোকসভা সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইয়াছিল এবং পরে বিবাদিনী কর্ত্তৃক শোকসভায় যে কাগজ পেশ করা হইয়াছিল, তদ্দারা তাহার সত্যতা নিরূপিত হইয়াছিল। ইহাও সকলের স্মরণ রাখা উচিত। পরে যে সত্য তাহার ডায়রীতে লিখিয়া রাখিয়াছিল যে, স্বাস্থ্যবাসে শববহন করিবার জন্য লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল।

আমি দেখিতে পাই যে এই সকল লোক ৮টার পূর্ব্বে স্বাস্থ্যবাসে একজন আগন্তুকের নিকট হইতে মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছিল। ইহা লইয়া বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে যে, সকলেরই ইহা কানে শোনা কথা। কেহ চক্ষে দেখে নাই। ইহা যেন মৃত্যুর বাণী!

যদি এই সকল ভদ্রলোক ৮টার পূর্ব্বে ঐ মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া থাকে তাহা হইলে কি কারণে এই সকল সাক্ষীদিগকে অবিশ্বাস করা হইয়াছিল, যাহারা শপথপূর্ব্বক বলিয়াছিল যে তাহারাও ঐ মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছিল। (বাদীর নং ৮৩৮, ৯৪০, ৯৮০, ৮০৭, ৬৭২ এবং কালিদাস পাল), ইহাদের মধ্যে

রামসিং সুবা সত্য বলিয়াছিল, সে সন্ধ্যার সময় লিবং ঘোড়দৌড় হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া তখন বলিল যে সে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়াছিল, ঐ গৃহে গিয়াছিল এবং সম্মুখের ঘরে মৃত কুমারকে দেখিয়াছিল। তথায় ডাক্তার বি, বি সরকার বসিয়াছিলেন। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—যদি দ্বিতীয় রাণীর মুখ হইতে এই ঘটনা বাহির হইয়াছে, ইহা কিছু চতুরতার সহিত গঠিত হইয়াছে, যাহাতে ইহা কিয়ৎপরিমাণে আশু এবং বীরেন্দ্রের পূর্ব্ব সাক্ষ্যের সহিত মিল থাকে; এবং সর্ব্বপ্রকারে শোকপ্রকাশক পত্র, ঔষধ তালিকাগুলি, টেলিগ্রামগুলি এবং ডাক্তার ক্যালভার্টের মৃত্যুশপথবাণী। সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত ঘটনার কোন প্রমাণ নাই। ইহা একটী ঘটনা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, যাহা আমি অখণ্ডনীয় বলিয়া মনে করি, যে কুমার ৭টা এবং ৮টার মধ্যে সম্ভবতঃ মারা গিয়াছেন কতকগুলি প্রমাণ রাত্রি ৭টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ঘটনাবিহীন মৃত্যুসময় দ্বারা ইহা অবিশ্বাস্য এবং ইহার ভিতরের প্রমাণ দ্বারা বিশ্বাস করা যায় না।

আশুর আরও কথা

আশু ডাক্তার এই সময়ে একটী ইনজেকসন্ দিয়াছিল, সে বলিতে পারে না যে কি ইনজেকসন্ দিয়াছিল, কারণ সে ভালরূপ বলিতে পারেন না যে, যন্ত্রণা থাকিবার পর, হিমাঙ্গের সময় পুনরায় মর্‌ফিয়া ইনজেক্‌সন্ দিয়াছিল কিনা, মানহানি মোকদ্দমায় তাহার বিবৃতিতে ইন্‌জেকসন্ কথার আদৌ উল্লেখ নাই। শ্রীপুর মোকদ্দমায় ইনজেক্‌সন্ রাত্রি ৯টা কিংবা ১০টার সময় হইয়াছিল বলিয়াছিল, '(এক্সিকিট্ ৩৯৪ (১৩)। রাণী বলিয়াছিলেন, ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে একটী ইন্‌জেকসন্ হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ আর একটী ইন্‌জেকসনের কথা তাঁহার মনে ছিল না।

ডাক্তারগণ তখন কোথায় ছিলেন?

বলা হইয়াছে, সত্যবাবু ডাক্তার নিবারণ বাবুকে বৈঠকখানায় রাখিয়াছিলেন, কর্ণেল ক্যাল্‌ভার্ট খাইবার জন্য প্রস্থান করিলে, তিনি তথায় আহার করিলেন। নীচে বৈঠকখানা ছিল, কিন্তু এই পঞ্চম ঘর, রাণীর ঘরের পার্শ্বে, ডাক্তারদের বসিবার ঘর করা হইয়াছিল এই উদ্দেশে যাহাতে রামসিং সুভা, যে মৃতদেহকে সেখানে দেখিয়াছিল, সে বিবরণগুলি অবিশ্বাস করা যাইতে পারে। এই ঘরের বর্ণনা করিতে গিয়া আশু,বীরেন্দ্র এবং বিপিন এত জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে বীরেন ৭ই এবং ৮ই রাণীর শয়নকক্ষে নিদ্রা গিয়াছিল বলিয়া শেষ বক্তব্য

বহনার্থ লোকের জন্য ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিতেছিল। অতএব রাত্রি প্রায় ৯টার সময় শ্মশানে দেহ লইয়া যাইবার প্রমাণ অগ্রাহ্য হইবার কোন কারণ দেখি না।

মৃতদেহ কখনই দাহ করা হয় নাই

মৃত দেহটি কখনই দাহ্ করা হয় নাই। তদন্তের এই অংশ সম্পর্কিত সাক্ষ্যের প্রকৃত পরীক্ষা মৃত্যুর সময়েই হয়। কিন্তু সাক্ষীদের মধ্যে যাহারা ঐ সৎকার-রাত্রে শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল কিংবা শব লইয়া যাইত দেখিয়াছিল। এ বিষয় একজন এখানে নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন এবং অপরেও তাঁহার মত একজনের উপর নির্ভর করিতে পারেন।

শ্মশানযাত্রী, দেওয়ান পদ্মিনীবাবুর সাক্ষ্য

বাবু পদ্মিনী মোহন নিয়োগী, ৫৫ বৎসব বয়স, (গৌরীপুব ময়মনসিংহ) ষ্টেটের ম্যানেজার, ২০ বৎসর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের একজন সভ্য, ১৯০৯ সালে বিখ্যাত দৈনিক ইংরেজি বেঙ্গলী কাগজের সব এডিটর, স্বাস্থ্য-বাসে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বলেন, আমি লুই জুবিলি স্বাস্থ্য-বাসে দিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময় একটী লোক আসিয়া আমাকে বলে যে, ভাওয়ালের কুমারের মৃত্যু হইয়াছে সে সৎকারের জন্য লোক চায়।' ষ্টেপএসাইডে যে ৭ কিংবা ৮ জন গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আমি ও একজন। কুমাব সেই বাটীতে ছিলেন বলিয়া আমাদের সেখানে যাইতে বলিল। ৭ কিংবা ৮জন লোক যাহাবা আমার সহিত গিয়াছিল আমি তাহাদের মুখ চিনি। আমি তাহাদিগকে দাৰ্জ্জিলিংএ চিনিয়াছি। ষ্টেপএসাইড্ যাইতে আমাদের প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় লাগিল, আমি নীচে খাটিয়ায় আচ্ছাদিত মৃত দেহ দেখিলাম। ঘরে কি বাহিরে দেখিয়াছি তাহা আমার স্মরণ নাই। পৌঁছিয়াই কাগ্ঝোরাতে মৃত দেহ লইয়া যাওয়া হইল। তৎপরে শব লইয়া বাহির হইবার পর আবহাওয়া খারাপ দেখিয়া আমাদের মধ্যে যাহারা স্বাস্থ্য-বাসে থাকিতাম তাহারাই ফিরিয়া আসিলাম। সাক্ষী ষ্টেপাসাইডের কোন লোককে জানেন না, কেবল বলেন যে স্বাস্থ্য-বাসে ফিরিয়া আসিতে ১৫ কিংবা ২০ মিনিট কিংবা অর্দ্ধঘণ্টা, ৯-৩০ কিংবা রাত্রি ১০টা হইয়াছিল এবং একটু পরেই বৃষ্টি আসিল। ৭-৬-২১ তারিখে আর, সি, দত্ত মহাশয়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, লিণ্ডসে সাহেবের তদন্তের সময় এই সাক্ষীর এই এজাহার লিখিয়াছিলেন। তিনি মানহানির মোকদ্দমায় এজাহার দেন।

উ—তাহা আমার স্মরণ নাই।

প্র—সে কি বলিয়াছিল ? যে সে শ্মশানে গিয়াছিল ?

উ—হাঁ।

প্র—সে কি বলিয়াছিল, কখন, এবং কোথা হইতে ?

উ—ষ্টেপএসাইড হইতে। রাত্রি কয়টার সময় বলিয়াছিলেন তাহা আমার মনে নাই।

প্র—তিনি কি বলিয়াছিলেন কখন তিনি ষ্টেপএসাইডে গিয়াছিলেন ?

উ—রাত্রিতে।

প্র—আপনি কি অনুমান করিয়া বলিতে পারেন তখন রাত্রি কয়টা হইবে ?

উ—আমি আন্দাজ করব না, সে আন্দাজ করবে।

প্র—অনুকূলবাবুর নিকট হইতে কি শুনিয়াছিলেন ?

উ—সম্ভবতঃ রাত্রি দশটা কিংবা বারটা।

শোভাযাত্রার কথা কাহারও নাম মনে নাই।

প্র—তিনি কি বলিয়াছিলেন যে তিনি শব সৎকার করিয়াছিলেন ?

উ—তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি সৎকার করিতে গিয়াছিলেন, দেহ সৎকার করিয়াছিলেন কিনা তাহা বলেন নাই।

প্র—ঝড়বৃষ্টির জন্য দেহটি ফেলিয়া আসিয়াছিলেন একথা কি তিনি বলিয়াছিলেন ?

উ—না।

প্র—তিনি কি বলিয়াছিলেন যে তিনি সৎকার করিতে পারেন নাই ?

উ—না।

প্র—শব লইয়া কখন রওনা হইয়াছিলেন ?

উ—তিনি কখন মৃতদেহ লইয়া রওনা হইয়াছিলেন, তাহা আমার মনে নাই।

প্র—আপনি জেরার সময় কাল বৈশাখীর (ঝড়বৃষ্টির) উল্লেখ করিয়াছিলেন। উহা কখন আরম্ভ হয় ?

উ—মার্চ্চমাসের শেষভাগ হইতে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত।

প্র—যখন ইহা আরম্ভ হয়, তখন কি ইহা দার্জ্জিলিংয়ের সর্ব্বত্র আরম্ভ হয় ?

উ—হাঁ।

প্র—তিনি কাল বৈশাখের ঝড়বৃষ্টির সময় মারা গিয়াছিলেন। আপনি

বলিয়াছেন যে পূর্ব্ব রাত্রিতে সন্ধ্যা হইতে রাত নয়টা পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আপনার কি এতদিন পরে মনে আছে যে শোভাযাত্রা বাহির হইবার আগেই রাত্রে প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টি হইয়াছিল ?

উ—আমার কিছুই মনে নাই।

প্র—আপনি কি বলিয়াছিলেন যে কালবৈশাখীর সময় বলিয়া পূর্ব্বরাত্রে বৃষ্টি এবং ঝড় হইয়াছিল ?

উ—হাঁ।

পুনরায় জবানবন্দী গ্রহণ করা অসম্ভব। ইহা একজন কমিশনারের সামনে করা হইয়াছিল। সাক্ষী যে বৃষ্টি এবং ঝড় দেখিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিতে বলা হইতেছিল। অতীত সময়ের কোন এক বিশেষ দিনে বৃষ্টি হইয়াছিল কি না তাহা বিশেষ কোন ঘটনার সহিত জড়িত না থাকিলে উহা কেহ স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না। এই সাক্ষীর বৃষ্টির কথা মনে আছে, কারণ উহা এক কথোপকথনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। কথোপকথনের যাথার্থ্য যাহাই হউক না কেন, প্রতিবাদীপক্ষ নিজেই আলোচ্য বিষয়ের খুটিনাটী ব্যাপারগুলি বাহির করিয়া কথোপকথনের সত্যতা স্থির করিতে সাহায্য করিয়াছেন। এবং আলোচ্য বিষয়টি কিয়ৎপরিমাণে চিত্তাকর্ষক ছিল এবং প্রতিবাদীপক্ষ বলেন যে তাহার উহা মনে আছে, নতুবা তাহারা তাহার জবানবন্দী করিতেন না।

শ্মশানে আশ্রয় স্থান

পূর্ব্বরাত্রির বৃষ্টির সহিত অন্যান্য ঘটনা একত্র করিয়া ভাবিলে বাদীপক্ষের মামলা সত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু রাত্রির শোভাযাত্রা এবং পরবর্ত্তী ঘটনা-গুলিকে মিথ্যা প্রমাণিত করিবার জন্য যে তিনটি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে সেগুলির একটু বিশদভাবে বিবেচনা করা দরকার। সন্ধ্যার পর মৃত্যুর দৃঢ় ভিত্তির উপর ইহা নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তথাপি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। প্রথমতঃ সেদিন কোন বৃষ্টি বা ঝড় হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ শ্মশানে কোন চালা ছিল না। তৃতীয়তঃ নিকটে এমন কোন চালা বা কুঁড়েঘর ছিল যেখানে লোকেরা আশ্রয় লইতে পারিত। আমি প্রথমেই শ্মশানের চালার কথাটাই আলোচনা করিব।

আলোচ্য দিনে নূতন শ্মশানে একটি চালা ছিল ইহা স্বীকার করা হইয়াছে এবং চালাটী আরও নীচে ছিল। বাদীর বিবরণ এই যে দেহটী পুরাতন

শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, যেখানে কোন চালা ছিল না। এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত নক্সাটী কাজের হইবে।

রাস্তার বিবরণ

পূর্ব্বদর্শিত-সুধীরকুমারী রোড দিয়া নূতন কিংবা পুরাতন শ্মশানে যাইবার রাস্তা ছিল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ষ্টেপ-এসাইড হইতে আসিতে হইলে কামসিয়াল রোডে পড়িয়া কার্ট রোডে নামিয়া, ফার্ণডেল রোড ধরিয়া এবং সেখান হইাত কনসারভেন্সি রাস্তা বরাবর এবং সেখান হইতে ভিক্টোরিয়া রোডে পড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে সুধীরকুমারী রোডে পড়িতে হয়, সেখান হইতে ডানদিকে ফিরিলেই পুরাতন শ্মশান। ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত এই পুরাতন শ্মশানই দাৰ্জ্জিলিংয়ের একমাত্র শ্মশান ছিল।

১৯০৭ সালে নূতন পুরাতন শ্মশানের দক্ষিণে ঝোরার অপর পারে নক্সায় চিহ্নিত স্থানে এক নূতন গৃহতল নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। রাস্তাটা ততদূর পর্য্যন্ত যায় নাই, কিন্তু কিছু আগেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। "৬"র নিকট হইতে মিঃ মৰ্ম্মিষ্টেনের সব্জীবাগানের পশ্চিমদিকে একটু বাঁকিয়া গিয়াছিল।

বিবাদীরা অনেকদিন পর্য্যন্ত নূতন শ্মশানটিই একমাত্র শ্মশান এবং ১৯০৬ সালে ওখানে যে চালা ছিল সেটী বরাবরই ছিল এবং যদিও উহার পুনর্নিম্মাণ হইয়াছিল এবং কুমারের দেহ এইস্থান ভিন্ন অন্য কোথাও লইয়া যাওয়া সম্ভব নয় বলিয়াছে। এখন ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে প্রকৃতপক্ষে পুরাতন শ্মশানটীই পূর্ব্বের শ্মশান ছিল কিন্তু নূতন শ্মশানটী ১৯০৭ সালে নিৰ্ম্মিত হইবার পর পুরাতনটীর আর ব্যবহার করা হয় নাই। দাৰ্জ্জিলিংয়ের হিন্দু-সৎকার এবং সমাধি সমিতির সেক্রেটারী মিঃ মণিমোহন সেনকে জেরা করিয়া এই স্বীকারোক্তি পাওয়া গিয়াছে যে দাৰ্জ্জিলিংয়ে একটী পুরাতন শ্মশান ছিল। আর এন ব্যানাৰ্জ্জির কমিশনে জবানবন্দী গ্রহণের সময় প্রতিবাদীরা এই সভার এবং উহার কার্য্যাবলী সংক্রান্ত নানা প্রকার কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন এবং তাহার নিকট হইতে এই সাক্ষ্য আদায় করিয়াছিলেন যে, যে শ্মশানকে তাহারা নূতন শ্মশান বলিয়া ধরিতেছেন সেটি আদৌ নূতন ছিলনা। কিন্তু বরাবরই সেটি চালাসমেত সেখানেই ছিল। এবং এই যুক্তি সমর্থন করিবর জন্যে তিনি মিসেস পিলের সমাধির বিষয় উল্লেখ করেন। প্রতিবাদীরা মিঃ মণিমোহনের নক্সার সহিত কমিটির কার্য্যক্রটির বিবরণ দাখিল করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া এই ঘটনাগুলি জানিতে পারা যায়:—

না, এবং রাত্রিকালে পুরাতন শ্মশানটি নির্ব্বাচন করাই স্বাভাবিক, কারণ ইহাতে অধিক দূরে নামা এবং ঝোরা অতিক্রম করা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই ঝোরা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও প্রত্যেক মানচিত্রে ইহার নির্দ্দেশ আছে এবং মিঃ মর্গেনষ্টেন একথা স্বীকার করিয়াছেন। ১৯১৯ সালের মে মাসে শ্মশানে যাইবার রাস্তাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল না, যদিও মিঃ মর্গেনষ্টেন বলেন যে সুধীরকুমারী রোড নূতন শ্মশান অতিক্রম করিয়া চন্দ্ররঞ্জনশালা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ১৯০৯ সালে তাহার বয়স নয় বৎসর ছিল, একথা বলা ভুল।

শ্মশানের রাস্তা

যদি রাস্তাটি আরও নামিয়া যাইত, তবে মণিমোহনবাবু বিন্দু বসাইয়া উহার নির্দ্দেশ করিতেন না এবং কমিটি সুধীরকুমারী রোডের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন না যে, যে পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা করিয়াছেন, তাহা নির্ম্মাণ হয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটির আমিন সামসুদ্দিন বলিয়াছে, মানচিত্রের পশ্চিমে যে নূতন শ্মশান হইতে চন্দ্ররঞ্জনশালা পর্য্যন্ত রাস্তাটি দেখান হইয়াছে তাহা পরে নির্ম্মাণ হইয়াছে। আমি ইহার পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পুরাতন সুধীর-কুমারী রোড দুর্গম, তিন ফিটেরও কম চওড়া, ইহার উভয় পার্শ্বে জঙ্গল এবং আলোকবিহীন। অবশ্য পুরাতন শ্মশানের ব্যবহার বন্ধ হইয়া না গেলে, মৃতদেহ লইয়া দক্ষিণদিকের প্রথম শ্মশানে যাওয়াই স্বাভাবিক। যাহা হউক মন্মথবাবুর সাক্ষ্যের দ্বারা মনে হয় যে সম্ভবতঃ ইহার প্রায়ই ব্যবহার হইত, এবং প্রতিবাদীপক্ষের দুইজন সাক্ষীর বিবৃতি দ্বারা এই ধারণা সমর্থিত হয়। তিনি আরও বলেন যে শারদা (প্রঃ সাঃ ৪০২) ১৩১৫ কিংবা ১৩১৬ (১৯০৮—১৯০৯) সালে একটি মৃতদেহ সংকার করিতে যায়, কিন্তু তিনি বলেন যে সেখানে কোন চালা ছিল না। ইহার অর্থ এই যে নূতন শ্মশানটি সবেমাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন শ্মশানের চালাদ্বারা নূতন শ্মশানের চালা নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে পুরাতন শ্মশান হইতে নূতন শ্মশানে যাইবার রাস্তাটি নূতন শ্মশান নির্ম্মিত হইবার পর তৈয়ার করা হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্বে ছিল না। আমি অন্যান্য যুক্তিদ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে মিঃ মর্গেনষ্টেন ভুল বলিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি স্বীকার করিয়াছেন ১৯০৭ সালে নিকটবর্ত্তী গৃহে যখন বাস করিতে আরম্ভ করেন তখন তিনি পুরাতন শ্মশান ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছেন, এবং প্রায় এক বৎসর পরে নূতন শ্মশানের ব্যবহার আরম্ভ হয়। কখন হইতে পুরাতন শ্মশান ব্যবহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারেন না। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়

জল ঝড় হইতে থাকে। এই সাক্ষীগণ প্রধানত তিন দলে বিভক্ত—শবানুগমনকারিগণ, শবযাত্রাদর্শিগণ এবং শশ্মানবন্ধুগণ। কেহ শশ্মানেই জল ঝড়ের হাতে পড়েন, কেহ শ্মশানে খাটিয়া রাখিয়া গৃহে ফিরিবার পথে এবং কেহ পদ্মিনি বাবুর ন্যায় স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরিবার পর জল ঝড় আরম্ভ হয়। প্রতিবাদী পক্ষীয় সাক্ষী ফকীরও বলিয়াছে যে, ঐ দিন ঐ সময় কালবৈশাখীর জল ঝড় আরম্ভ হয়। তখন বর্ষাকাল ছিল না, কাজেই যদি বৃষ্টি হইয়া থাকে তবে তাহা যে কালবৈশাখীরই পূর্ব্বাভাষ এই সম্বন্ধে আর কোনই ভুল হইতে পারে না। বিবাদী পক্ষ বলিতেছেন যে বৃষ্টিমান-যন্ত্রের রিপোর্টের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে যে ঐ তারিখে জল ঝড় হয় নাই। যদি তাহারা রিপোর্ট দৃষ্টে তাহা প্রতীয়মান করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমি এই জল ঝড়ের বিষয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব।

আবহাওরা কেমন ছিল

দার্জ্জিলিংয়ে সেণ্ট জোসেফ কলেজে, সেণ্টপল গীর্জ্জায়, বোটানিক্যাল গার্ডেনে, মিউনিসিপালিটীতে, এবং চা-করদের ক্লাবে বৃষ্টিমান-যন্ত্র আছে। বাদীপক্ষীয় সাক্ষী ৮৩৯ জগন্নাথকে মানমন্দিরেও উহা আছে কিনা তাহা জেরায় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল।

সেণ্টপলের বৃষ্টির রিপোর্ট গভর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে ৪ঠা মে সকাল ৮ টা হইতে ১২ই মে বিকাল ৪ টা পর্য্যন্ত কোন বৃষ্টি হয় নাই।

সম্ভবতঃ মিঃ 'লিগুসে এই রিপোর্ট দেখিয়াই বাদীর বৃষ্টির কাহিনী মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করেন।

সেণ্টজোসেফেও ১১ই তারিখ ব্যতীত এই কয়েক দিনের ভিতর কোন বৃষ্টির উল্লেখ নাই।

সেণ্টপলে ১১ই কিম্বা ১২ই কোনই বৃষ্টি হয় নাই।

কোন পক্ষই চা-কর ক্লাবের রিপোর্ট দাখিল করেন নাই। ক্লাবের তৎকালীন হেড ক্লার্ক মন্মথবাবু বলেন যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ২জন ভদ্রলোক আসিয়া ক্লাবের ১৯০৯ সালের রিপোর্ট লইয়া যান। এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছুই বলা যায় না।

ডাঃ কালভার্ট প্রমুখ সমস্ত সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছেন যে দাজ্জিলিংএ একস্থানে বৃষ্টি হইলে অন্য স্থানে বৃষ্টি নাও হইতে পারে। উপর পাহাড়ে বৃষ্টি হইলে, নীচুতে বৃষ্টি না হইতেও পারে। আবহাওয়ার এই লুকোচুরি

সেই রাত্রিতে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল ; এবং শ্মশানে ৮ই মে তারিখের রাত্রিতে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা শ্মশান অথবা আশ্রয় স্থল কিংবা বৃষ্টির সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় না। মৃতদেহ যে প্রকৃতপক্ষে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহা এই সব ঘটনা দ্বারা অবিশ্বাস করা যায়না এবং আর একটি বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। ৯ই তারিখে প্রাতঃকালে একটি শবদেহ নূতন শ্মশানে দাহ করা হইয়াছিল।

৯ই তারিখের প্রাতঃকালের শোকযাত্রা

এই প্রসঙ্গে ১৩ জন ব্যক্তির কমিশনে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং সত্য ডাক্তার আশু, বীরেন্দ্র এবং বিপিন প্রভৃতি সহবাসী ছাড়াও আরও ২২ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

বাদীপক্ষের নয়জন সাক্ষী শবযাত্রার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে।

১৯০৯ সালে গবর্ণমেণ্ট দার্জ্জিলিংয়ে ছিল, এবং সেক্রেটোরিটের কেরাণীরা কাচারী দালানে নিজেদের বাড়ীতে বাস করিত। সেই দালানটি বাজারের সামনে অবস্থিত এবং কার্টরোডের সন্নিকটে ছিল। ইহা রেলওয়ে মালগুদামের ঘর হইতে প্রায় ৩০০ গজ দূরে অবস্থিত এবং ফার্ণডেস্ রোড় ধরিয়া আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়া শ্মশানে পৌছান যায়। এই কাচারী দালানে সত্যবাবুর ভাই শ্যামাদাস থাকিত এবং এই মেস হইতে ৯ই তারিখে সকালবেলা কয়েকজন লোক মৃতদেহটিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেপ-এসাইড বাড়ীতে আসিয়াছিল। তাহারা বলে যে অন্যান্য যায়গা হইতে আরও লোক আসিয়াছিল এবং বিখ্যাত জগৎমোহিনী নার্স এবং অন্যান্য সাক্ষীগণ যে বিবৃতি দান করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

কুমার মধ্যরাত্রে মারা গিয়াছেন। রাণী সারারাত্রি মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়াছিল এবং নার্স যে ঘরে কুমার মারা গিয়াছিল সেই ঘরে তাহাকে (রাণীকে) জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। ডাক্তারেরা চলিয়া গিয়াছিলেন। সত্য বাবু বলেন যে তিনি স্যানিটোরিয়ামে তাহার বন্ধু মিঃ রাজেন্দ্র শেঠের নিকট কুমারের মৃত্যুর সম্বন্ধে চিঠিতে লিখিয়া জানান ; এবং কাচারী দালানে তাহার ভাইয়ের নিকট অনুরূপ পত্র লেখেন। প্রত্যুষে প্রায় তিনটা চারটার সময় কয়েকজন লোক আসিয়াছিল, কিন্তু প্রাতঃকালে বহুলোক আসিয়াছিল, এবং কুমারের শব পরদিন প্রাতঃকালে নামাইয়া সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনের খাটের উপর রাখা হয় এবং শবযানের উপর ফুল বিছাইবার পর শোকযাত্রা করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। দুইজন গুর্খা প্রহরী বন্দুক বিপরীতদিকে ধরিয়া অগ্রসর

ইহাদের প্রথম ছয়জন সেক্রেটারিয়েটের কেরাণী। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্যামাদাসকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং সে ছাড়া অপর সকলে এখনও চাকরী করিতেছে।

এই তের জনের সাক্ষ্য কমিশনে গ্রহণ করা হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে কোর্টে জেরা করা হয়।

প্রঃ সাঃ—১১। আর লিউস, অবসর প্রাপ্ত রেলওয়ে গার্ড।

প্রঃ সাঃ—১৬ ফ্রেড্রিক লক্স্ অবসরপ্রাপ্ত মিউসিপ্যালিটীর কর্ম্মচারী।

প্রঃ সাঃ—এ প্লিভা, দার্জ্জিলিংএর মিষ্টান্ন-ব্যবসায়ী।

প্রঃ সাঃ—৫৭ দুর্গাচন্দ্র পাল, সেক্রেটারিয়েটের এক বিভাগের হেড এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট।

প্রঃ সাঃ—দার্জ্জিলিংয়ের স্থরেন্দ্র চন্দ্র।

প্রঃ সাঃ—জলপাইগুডির নুরুল হক্।

প্রঃ সাঃ—৭১ রংপুরের মতিয়ার রহমান।

প্রঃ সাঃ—৭৩ পলমন, দার্জ্জিলিংযের।

প্রঃ সাঃ—দার্জ্জিলিংয়ের লাখী মুদী।

প্রঃ সাঃ—৭৩ কালি ছত্রী।

প্রঃ সাঃ—১০৩ ডাক্তার এস, সি, রায়, এম, বি, আর সি, পি,

প্রঃ সাঃ—১০৫ সতীশ চন্দ্র মুখাৰ্জ্জী।

প্রঃ সাঃ—১১৯ কালী ছত্রিনী।

প্রঃ সাঃ—দার্জ্জিলিংয়ের সত্যপ্রসাদ ঘোষাল।

প্রঃ সাঃ—নন্দগোপাল গরগরী।

প্রঃ সাঃ—৭১ দার্জ্জিলিংয়ের ভূতপূর্ব্ব কনেষ্টবল।

প্রঃ সাঃ—পূর্ণ ব্যানার্জ্জি, দার্জ্জিলিং।

প্রঃ সাঃ—১১৩ বালির পঞ্চানন মিত্র।

প্রঃ সাঃ—৩০৯ মিঃ হল্যাণ্ড, অবসরপ্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী

প্রঃ সাঃ—৪২০ তারাপদ ব্যানার্জী

অধিকন্তু মেজবাণী, সত্য, বীরেন্দ্র, আশু ডাক্তার, বিপিন ইহারা সকলেই সহবাসী, এবং অ্যান্থনী মরেলকেও কমিশনে জেরা করা হয়।

যে সকল সাক্ষিগণকে কোর্টে আনা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সহবাসিগণ এবং দুইজন সাক্ষী, সত্যপ্রসাদ এবং গরগরী ভিন্ন অপর কেহ শ্মশানে যায় নাই, ইহাদের কেহ কেহ কেবলমাত্র শোকযাত্রাটি চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে এবং তাহাদিগকে শুধু থর্ণরোড রাস্তার প্রসঙ্গে ডাকা হইয়াছিল।

২। স্বামী ওঙ্কারানন্দ (বাঃ সাঃ ৬০৩)। ইহার পূর্ব্বের নাম ছিল ক্ষেত্রনাথ মুখার্জ্জি এবং ইনি দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটিতে ১৯০১—১৯২৭ পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছেন।

৩। রামসিং সুবা (বাঃ সাঃ ৯৬৭) এই ব্যক্তির কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে ষ্টেপ এসাইডের মালিকের মুন্সী।

নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ডেপুটি কমিশনারের আফিস (কমিশনে)। বসন্তবাবু যে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন তাহা মোটামুটি এইরূপ। নার্স জগৎমোহিনী দাসীকে আমি চিনি। সে প্রাতঃকালে আসিয়া আমাকে খবর দিল যে ভাওয়ালের কুমার মারা গিয়াছে এবং আমার ব্রাহ্মণ হিসাবে যাওয়া উচিত। সে আমাকে 'ষ্টেপ এসাইডে' যাইতে বলিল। আমি সেখানে প্রায় সকাল আটটার সময় পৌছিয়া দেখিলাম যে মৃতদেহটি বস্ত্রাবৃত হইয়া প্রাঙ্গণস্থিত খাটের উপর শায়িত আছে। সমস্ত দেহটি বস্ত্রাবৃত ছিল বলিয়া আমি মুখ অথবা শরীরের অন্য কোন অংশ দেখিতে পাই নাই। ষ্টেপএসাইডে পৌছিবার কুড়ি পঁচিশ মিনিট পরে শোকযাত্রা বাহির হইল এবং আমি ইহার অনুগমন করি। আমি শোকযাত্রার সঙ্গে গিয়াছিলাম কিন্তু শবদাহ স্কন্ধের উপর গ্রহণ করি নাই। দেহটি লম্বা বলিয়া মনে হইল। আমার চেয়ে খাট নয়, একটু লম্বাও হইতে পারে। আমাদের দেশে মৃতদেহ অস্পৃষ্ট থাকে না, কিন্তু যদিও চত্বরের উপর অনেক লোক চলা ফেরা করিতেছিল তথাপি কেহ উহা স্পর্শ করিয়া ছিল না। একজন অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক উপরে বসিয়া রোদন করিতেছিল। সেই রাণী। অন্য কেহ কাঁদিতেছিল না। কিন্তু তাহারা সকলেই বিমর্ষ ছিল।

শোকযাত্রাটি কমার্শিয়াল রোড রাস্তা ধরিয়া, অকল্যাণ্ড রোড, রবার্টসন রোড, লয়েড রোড বরাবর চলিয়াছিল। কিন্তু থর্ণ রোড দিয়া যায় নাই।

তথাকথিত শবদাহ দৃশ্য

নূতন শ্মশানের একটি অসম্পূর্ণ চিতার উপর দেহটি রাখা হইয়াছিল—এইরূপ চিতা সেখানে সব সময়েই থাকে, এবং উহার উপর দেহটী পূর্ব্বের ন্যায় আবৃত অবস্থায় শায়িত করা হয়; সাধারণতঃ হিন্দুর মৃতদেহ স্নান করান হয়। এই দেহটিকে স্নান করান হয় নাই। ঘৃতদ্বারা দেহটিকে অনুলিপ্ত করান হয় নাই, অথবা নূতন কাপড়ও পড়ান হয় নাই। মুখাগ্নির পূর্ব্ব যে পিণ্ডপ্রদান করা হয় তাহাও দেওয়া হয় নাই।

"আমি এইভাবে কোন শবদাহ করিতে দেখি নাই—যে ভাবে এই দেহের

যিনি যাইতে পারেন নাই, তাহার নাম ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য। তিনি আসিতে অতিরিক্ত বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি শোকযাত্রার সহ-গমন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু শ্মশানে পৌছিবার পূর্ব্বে মৃতদেহ দেখিতে পান নাই। কানাই নামে আর একজন গৃহের নিকটে শোকযাত্রা দেখিতে ছিলেন, কিন্তু সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে নাই।

কোর্টের নিকট বিচারের আর একটি বিষয় এই—প্রত্যূষের অতি পূর্ব্বে চিঠি পাইয়া রাজেন্দ্র শেঠ ও বিজয়, অনুকুল ও শ্যামাপদ সমভিব্যাহার কয়েক জন লোক সেনিটারিয়াম হইতে আসিয়াছিল। যাহারা সকালে আসিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে মৃতদেহ লইয়া রওনা হওয়ার পূর্ব্বে মৃতদেহ দেখার চেয়ে শ্মশানে মৃতদেহ কি করা হইয়াছিল, তাহার উপরই: বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। বিচারকালে ইহাই খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এক্ষণের ন্যায় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে মিঃ এম, এন ব্যানার্জ্জীর স্ত্রী কাশীশ্বরী দেবী ও তাঁহার ছেলে বলেনের এ বাড়ীতে আসা প্রাতঃকালের একটি প্রধান ঘটনা। বলেন শবদেহ লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে থাকে, এবং কাশীশ্বরী দেবী শোকার্ত্তা রাণীকে দেখেন। কৌঁসিলি মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জীর পরেও দার্জ্জিলিঙে আরও দুইজন সাক্ষীর কমিশনে সাক্ষ্য লওয়া হয়। তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে—তিনি নিজে কাশীশ্বরী দেবীর অন্যতম পুত্র। তিনি ও তাঁহার ভাই বলেন দুইজনেই মৃতদেহ লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থায় যোগ দেন। এর পূর্ব্বে ইহার কথা আর কোন সাক্ষীই বলেন নাই। তাঁহার মিথ্যা প্রমাণ ফুটিয়া উঠিয়াছে ও তিনি স্থলবিশেষে বিবাদীগণের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছেন। তাঁহাকে সমর্থন করার জন্য পরবর্ত্তী সাক্ষীরূপে তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সাক্ষ্য লওয়া যায়। তাহার বয়স কম, তিনি মিঃ এম এন ব্যানার্জ্জীর পুত্রবধূ, ও বলেন ভিলাতে ছিলেন। তিনি বলেন যে যখন বলেন ভিলার পাশ দিয়া শবযাত্রা যাইতেছিল তখন ঐ শবযাত্রার সহিত মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জীকেও যাইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু শবযাত্রাটি যদি থর্ণ রোড দিয়া না যায় তাহা হইলে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? সর্ব্ববাদীসম্মত শবযাত্রার পথ লইয়া যে কেন গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়।

জগৎ মোহিনী কি করিল?

তখনকারমত এখনও মোকাদ্দমার আর একটি বিষয় হইতেছে যে নার্স জগৎমোহিনী সকালে কেবল যে লোকজন ডাকিয়াছে তাহা নহে, শ্মশানে গঙ্গাজল লইয়াও গিয়াছিল। এই গঙ্গাজল শ্মশানের অত্যাবশ্যকীয় হইয়া

এখানে তিনি হাওয়া বদল করিতে আসিয়াছেন বলেন। যে সকল বিষয় তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা হইল এই যে ১৯০৯ সালের মে মাসে যেখানে শ্মশান ছিল দার্জ্জিলিংএর শ্মশান চিরকালই ঐ এক জায়গায়ই ছিল। চালাটীও চিরকালই সেখানে আছে। ১৯০৫ কি ১৯০৬ সালে যখন তিনি রায় বাহাদুর দাসের শবদাহ করিতে গিয়াছিলেন, তখনও তিনি উহা সেখানে দেখিয়াছেন। তিনি ইহাতে ভুল করেন নাই। কারণ বিবাদীপক্ষের অপর একজন স্থানীয় সাক্ষী বলিয়াছেন যে ১৯০৫ কি ১৯০৬ সালে রায়বাহাদুর দাস মারা যান (বিবাদী সাক্ষী—৪১১) কার্য্যতঃ তিনি একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, যে সকল লোক শবদাহে যোগ দেওয়াও অপরিহার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন,—তিনিও তাঁহাদের মধ্যে একজন। (বাদী সাক্ষী (৯৮৬ মন্মথ)! তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন যে নূতন শ্মশান ১৯০৭ সালে তৈয়ারী হইয়াছিল—এবং অনুপ বাবুর (বিবাদী সাক্ষী ৪১১) মত তিনিও জানিতেন যে এখানে কোন চালা ছিল না। পুরাতন শ্মশান কোথায় ছিল তাহা তিনি জানিতেন। তিনি আদালতকে বলিয়াছেন যে, যে শ্মশানে কুমারকে দাহ করা হয় সেখানে ১৯০৫ কি ১৯০৬ সালে চালা ছিল, এবং ১৯০৯ সালেও ঠিক সেই ভাবেই তাহা দেখিয়াছেন।

ইহা ছাড়িয়া দিলেও ইহার সাক্ষ্যে আরও অনেক বাজে কথা পাওয়া যায়। যাহা সত্য নহে—এগুলি অনেকক্ষণ টিকিতে পারে নাই। মিঃ ব্যানার্জ্জি যে কথাই বলিয়াছেন তাহাতে ঘটনা বাহুল্যের ছোঁয়াচ দিয়াছেন—এবং লোকে মিথ্যা ঘটনা করা ইহার জন্য যেমন বিশদ বিবরণ দেয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনিও তেমনি দিয়াছেন। ইহার ভিতরে কতকগুলি কথা তাহার সাক্ষ্যের সত্যতা সমর্থন করে না। তিনি বলিয়াছেন যে ষ্টেপএসাইডে যাইয়া মায়ের সঙ্গে উপরে গিয়া রাণীর সহিত কথা বলিয়াছেন। কুমারকে দেখা ছাড়া কুমারের সহিত তাঁহার অন্য কোনও পরিচয় ছিল না। তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর, এবং রাণীর বয়স তখন ১৯ বৎসরের কিছু উপরে। তিনি ভাওয়ালের প্রথা জানিতেন না সেইজন্যই মনে করিয়াছিলেন যে রাণীর সঙ্গে তাঁহার এই আলাপ সত্য বলিয়া চলিয়া যাইবে। দার্জ্জিলিংএ রাণী রাত্রি ছাড়া অন্য সময় বাহির হইতেন না,—এমন কি তখনও বিশ্বস্ত ছাড়া অন্য কোনও চাকরদের সম্মুখে বাহির হইতেন না। বিপিনের বয়স সে বলে অল্প ছিল।

কুমারকে অনেকটা অসুস্থের মত দেখাইত। এই অসুখ মদ্যপান

উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় সমস্ত মিথ্যা। ইহা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে রাত্রি ৯টার পর কেহই আসেন নাই। শ্যামাপদ বলে যে—রাত্রি ১টা কি ১॥ টার সময়—"কুমার মারা গিয়াছে—শেষ কার্য্য করার জন্য ব্রাহ্মণ লইয়া আইস" এইরূপ চিঠি পান। তিনি অনুকুলের সঙ্গে আসিয়া উপরে যান—সেখানে মৃতের মুখে মুখ রাখিয়া রাণীকে কাঁদিতে দেখেন। সেখানে কোন নার্স ছিল না,—তাহারা হয়ত নীচে কোথাও ছিল, কিন্তু উপরে ছিল না। ডাক্তার নিবারণ সেখানে ছিলেন—যদিও সত্যবাবুও নিবারণ ডাক্তার সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। রাজেন্দ্র শেঠ ও বিজয় বলে যে সেনিটেরিয়ামে প্রায় ১টার সময় চিঠি পায় এবং বিজয়ের সঙ্গে বাহির হইয়া আসেন। রাস্তায় কাছারী বাড়ীতে লোক ডাকার জন্য যান এবং কয়েকজন লোক বাহিরে আসিলে, তাহাদের লইয়া তিনটার পর ষ্টেপএসাইডে আসেন। এখানে আসিয়া ভোরের পূর্ব্বে মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হইবে কিনা এই সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকে—এবং পরে স্থির হয় ভোর হইলেই লইয়া যাওয়া, কিন্তু ইহার কিছুই শেষ পর্য্যন্ত টিকে নাই। দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সত্যবাবু দোটানা ভাবে বলিয়াছেন, প্রায় রাত্রি ৩টার সময় কতকগুলি লোক আসিয়াছিল। তিনি যে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন—তাহা কেবল খবর জানানোর জন্য, মৃতদেহ বহন করার লোকের জন্য নয়। কিন্তু তাহার ডাইরীই তাহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। তারিখে তিনি কুমার রমেন্দ্র মাঝ রাত্রিতে মারা গিয়াছে বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন,—তারপর তিনি ডাক্তারদের চলিয়া যাওয়ার কথা লিখিয়াছেন। তিনি মৃতদেহ লইয়া যাওয়ার জন্য সেনিটোরিয়ামে লোক পাঠানোর কথা লিখেন ও পরে তাহার মামার কাছে লোক পাঠানের কথা লিখেন। তাহার মামার প্রায় রাত্রি তিনটায় আসার কথা লিখা আছে।

৯ই তারিখে—দেখা যায় শেঠ—সেনিটোরিয়ামের যাত্রীদের লইয়া উপস্থিত হইল,—এম, এন, ব্যানার্জীর ছেলে বলেন, ফটিক, শ্যামদাসও আসিয়াছিল। অনেক কষ্টের পর মৃতদেহটি নামান হইল,—তারপর রেশমী কাপড় শাল ফুল দিয়া সাজান হইল শ্মশানের পথে ২০০৲ টাকা ছড়ান হইল। সেজোমামা ষ্টেপ এসাইডে বিভার কাছে রহিলেন—আমি শবের সঙ্গে গেলাম। বীরেন আগুন দিল, বেলা ২টায় ফিরিলাম।

অনুকুলের আর এক নাম ফটিক। বিভা মেজরাণীর নাম। যে সকল লোক শেষরাত্রে সেখানে ছিল তাদের মধ্যে মিঃ আর, এন, ব্যানার্জ্জি কিংবা তাহার মা কেহই ছিলেন না। অন্য আর একটী ঘটনা দিয়াও এই একই সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা নীচে বলিতেছি।

দেহ মৃত্যুর পরে তিনি স্পর্শ করিয়াছেন তখন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি ভাওয়াল রাজপরিবারের কথা অবগত ছিলেন, কি না ? এবং একথা জানা গেল যে ব্রাহ্মণগণকে মৃতদেহ বহন করিতে দেওয়া রীতি ছিল না ? আসল কথা এই দাঁড়ায় যে কিজন্য সাক্ষীকে ডাকিয়া আনিয়া মৃতদেহ দেখাইয়া এবং স্পর্শ করিতে না দিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

দাহন কার্য্যে তাঁহার কোন দরকার ছিল না। কোন ডাক্তারই মৃতদেহ দেখার জন্য নিজ হইতে অত্যন্তউৎসুক হইয়া পীড়াপীড়ি করিতে পারেন না, ডাঃ আচার্য্য আপাদমস্তক ঢাকা একটী শবদেহ দেখিয়াছিলেন। খাটে শোয়ান থাকিলেও তাহা দোতালায় ছিল না।

কুমারের মৃতদেহ (?) মেজেতে পড়িয়াছিল। খাট ছিল কিনা এসম্বন্ধে ডাক্তারের স্মরণ নাই। কেবল এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় না যে মৃতদেহটী নীচে ছিল। বাড়ীর অন্যান্য লোকের জবানবন্দীতে ও যাহারা প্রাতঃকালে দেখিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের কথায় বলা হইয়াছে যে ৭॥০টা বা ৭টায় মৃতদেহটী নীচে নামান হইয়া এবং রাণী ঐ দেহটী জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। পরে তাহা তাঁহার কাছ হইতে জোর করিয়া ছিনাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। রাণী ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যকে দেখেন নাই এবং ডাক্তারের এই আগমনের কথা কেহই স্মরণ করিতে পারিতেছেন না—কিন্তু তাঁহার ওখানে যাওয়া অবিসম্বাদিত সত্য ঘটনা—এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বেলা ৮টা পর্য্যন্ত মৃতদেহটী উপরে ছিল, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা ছিনাইয়া নেওয়া না হইয়াছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাণী উহা জড়াইয়াছিলেন—এই গল্পটি একেবারেই মিথ্যা।

কমিশন সাক্ষীদের জবানবন্দীতে সত্য ঘটনার কিছু কিছু আভায পাওয়া যায়। মহেন্দ্র ব্যানার্জ্জী বলেন যে বারান্দার সংলগ্ন একটী ঘর হইতে মৃতদেহটী আনা হইয়াছিল এবং তিনি নীচের বারান্দায় ছিলেন। বিজয় ও বলে যে সে অন্য একটী ঘরে বসিয়াছিল, এবং সেই ঘরের ভিতর দিয়াই দেহটী বহন করিয়া আনা হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মৃতদেহটী নীচের একটী ঘরে ছিল। এণ্টনীমরেল বলেন যে, মৃতদেহটী নীচে নামাইয়া বারান্দায় সিঁড়ির গোড়ায় একটী খাটের উপরে রাখা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে মৃতদেহটী নীচের বারান্দা দিয়া বহন করিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় খাটের উপর রাখা হয়।

৭॥টা বা ৮টার সময় মৃতদেহটী যখন লোকজন আসিয়া লইয়া গেল ততক্ষণ

অনুরোধ করে। সাধরণতঃ এইরূপই হয়। এবং শবদাহ শেষ করিয়া না আসা পর্য্যন্ত এই অলঙ্কার খোলা কখনও হয় না—কারণ বিধবা না হওয়ার কারণ তখনও বর্ত্তমান।

এই প্রথার প্রথমে অস্বীকার করিলেও আমার প্রশ্নের উত্তর সে এই প্রথার কথা স্বীকার করিয়াছে। যখন কাশীশ্বরী দেবীর সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠুরতার কথা ভাবিতে ছিলাম—তখন তাঁহার উপর অবিচারই করিয়াছি—তাঁহার সম্বন্ধে প্রত্যেকেই উচ্চধারণা পোষণ করিতেন। রাণী সত্যসত্যই তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে নয়। রাণী সূর্য্যনারায়ণ বাবুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। সূর্য্যনারায়ণ বাবু বলেনটিলায় ভারাটে ছিলেন। সঙ্গে তাঁহার কোন পরিবার ছিল না। কাজেই তিনি রাণীকে ঐ বাড়ীর অন্য মেয়েদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। গীতা দেবী ঐ মেয়েদের অন্যতম। তিনি তখন ঐ বাড়ীর বৌ। তিনি তাহার বিবৃতিতে রাণী আসিলে কি হইল তাহা বলিয়াছেন। তখন রাণীর গায় কোনও গহনা ছিল না। তিনি একটি সাধারণ চাকরদের পরনের ন্যায় ধুতি পরিয়াছিলেন।

আমার সর্ব্বস্ব পাহাড়ে রহিল

"আমি আমার সর্ব্বস্ব পাহাড় রাখিয়া গেলাম", বলিয়া রাণী কাঁদিতে ছিলেন। তিনি চাকরদের ন্যায় একটি কাপড় পরিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরে কোনও গহনা ছিলনা। মা বল্লেন,' বাছা এখনি গহনা গুলি খুলে ফেলেছ! রাণী বলিলেন, "তিনি (কুমার) আমাকে কখনও কোন গহনা খুলতে দেন নাই —এখন কেহ খুলিতে বাধা দেয় না।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। একটু শান্ত হইলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ দুর্ঘটনা কেমন করিয়া হইল?" খুবসম্ভবতঃ রাণী বলিয়াছিলেন—ডাক্তার কালভার্ট তাহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। মা বলিলেন, "তুমি কি একা ছিলে? ভাইদের খবর দিতে পারনি?" রাণী বলিলেন, 'তাহাদের খবর দেওয়া হইয়াছিল, কালও টেলিগ্রাম আসিয়াছে—"যত টাকা লাগে ইঁহাকে রক্ষা কর।"

আমি এই সাক্ষীর প্রত্যেক কথাই বিশ্বাস করি। এখানে সত্যের রেশ্ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কাশীশ্বরী দেবীকে লইয়া ষ্টেপ এসাইডে সেদিন সকালের গল্পটি তৈয়ারী করিয়াছিল সে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কিছুই জানে না। রাণী যে সমস্ত গহনা ত্যাগ করিয়া দাসীর ন্যায় সেই বাড়ীতে আসিয়াছিলেন ইহাতেই প্রমাণ হয় যে তখন সে বাড়ীতে অপর কোনও স্ত্রীলোক ছিল না।

দার্জ্জিলিংএর আর একজন সাক্ষী শশী বাবু পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন—এই বলিয়া ভুল করিয়াছে। অন্যান্য সাক্ষীও তাহার কথা সমর্থন করিয়াছে। মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জিও তাহাদের কথা সমর্থন করিয়াছেন।

বীরেন তাহার পূর্ব্ব জবানবন্দি ঠিক রাখিতে যাইয়া পরে বলিয়াছে যে, অম্বিকা মন্ত্র পড়িয়াছে এবং শশী বাবু তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। বীরেন মুখাগ্নি করিয়াছিল কিন্তু সে স্নান করে নাই, অথবা জল আনিয়া পিণ্ড পাক করেনাই। জলের সম্বন্ধে পূর্ব্ব জবানবন্দি ঠিক রাখিতে গিয়া বাধ্য হইয়াই তাহাকে ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। সে বলে যে তখন তাহার জ্বর ছিল, ইহা মিথ্যা কথা—ইহাতে পিণ্ডের জন্য অল্প জল না আনিতে পারা বোঝা যায় না। যদি কোন পাদরী খৃষ্টানদের শেষ কার্য্য করিবার সময় হাফ্ প্যাণ্ট পরিয়া ও সার্ট গায়ে উপস্থিত হন তাহা হইলে উহা যেমন অসঙ্গত ব্যাপার হয় ইহাও তেমন অসম্ভব। ডাঃ আশুতোষ পূর্ব্বে জানিতেন না যে এই পুরোহিতটি বাঙ্গালী কি পশ্চিমা (একজিবিট-৩৯৫-১)।

তারপর শবযাত্রির দল প্রায় ১০ টায় শ্মশানে পৌছিল—তারপর পিণ্ড পাক ও অন্যান্য ব্যবস্থা হইল। একজন সাক্ষীর কথামত মৃতদেহ নামাইয়া রাখিয়া তাহারা খানিক বিশ্রাম করিল এবং ৪টা কি ৫টার সময় শ্মশান হইতে ফিরিয়া চলিল। কিন্তু সত্য বাবুর ডাইরীতে আছে যে, তিনি শ্মশান হইতে ২টার সময় ফিরিয়া আসিলেন; তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে একটার মধ্যেই সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। ফিরিবার সময় চড়াইয়ের রাস্তাও আসিতেই এক ঘণ্টার বেশী লাগিয়াছিল। অথচ মিঃ আর, এন ব্যানার্জ্জির কথামত তিনি ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে শ্মশান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। গীতা দেবীর সাক্ষ্যে দেখা যায় যে 'বলেনভিলার' পাশ দিয়া যখন শবযাত্রা যাইতেছিল তখন তিনি মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জিকে উহার সঙ্গে যাইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু ঘটনায় যাহা প্রমাণিত হয় না, তাহার সাক্ষ্যে তাহা কখনও সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। এখানে তিনি সত্য কথা বলেন নাই।

ভাওয়ালের কুমার ফিরিয়া আসিবার কথা রাষ্ট্র হইলে তাহার শাশুড়ী ও দেবর যে কথা বলাবলি করিতেন এবং বলেনবাবু বলিতেন আমি নিজে গিয়া সাক্ষীদের—তিনি (কুমার) আমার সম্মুখেই মারা গিয়াছেন। মিষ্টার আর, এন, ব্যানার্জ্জির জবানবন্দীতে দেখা যায় যে ১৯১৯এ তাঁহার মা মারা যান এবং বলেনবাবু ১৯১৮ সালে মারা যান।

কাচারী বাড়ীতে তিনি (মিঃ আর, এন, ব্যানার্জ্জি) বিশেষ পরিচিত তিনি

ইংরেজী কথার কায়দা অনুকরণ করিতে দেখিয়াছে। সত্যবাবুই কুমারের মত চলাফেরা করিতেন ; যদিও এগুলি মোরেলের মারফত ডাক্তার কালভার্টের এফিডেভিড্ অনুসারে, তিনি চৌদ্দ দিন ধরিয়া রোগ ভোগ করিতেছিলেন। তবুও বাদীর সাক্ষ্য নেওয়ার পর কুমার যে খানা খাইতেন, বিলিয়ার্ড খেলিতেন এবং খুব সুস্থ ছিলেন এই কথা প্রমাণ করা দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

৯ই তারিখ সকালে শ্মশানে কি ঘটিয়াছিল, এবং শবযাত্রাটি কি রকমের ছিল এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যে যুক্তির উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে দুইজন সাক্ষীর কথা সত্য না হইলেও এ সম্বন্ধে আমি একটি কথা বলিব।

শিক্ষিতের শিক্ষিত মিথ্যা সাক্ষ্য

হারাণচন্দ্র চাকলাদার ইঁহাদের একজন। তাঁহার সাক্ষ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ৯ই তারিখ ভোরে লোক ডাকিতে আসিলে তিনি সেনিটোরিয়াম হইতে ষ্টেপ্এসাইডে যান এবং শবযাত্রার সঙ্গে শ্মশানে গমন করেন, সেখানে শবস্নান, দাহ ইত্যাদি সমস্ত অনুষ্ঠান দেখিয়াছেন। মিষ্টার লিণ্ডসে যাহা স্বীকার করিয়াছেন—তিনি তাহা অস্বীকার করেন, যে তাঁহার নিকট যে সমস্ত প্রশ্ন করা হইয়াছিল তিনি তাহার জবাব দেন নাই। কাজেই ১৬।৯।২১ তারিখে সত্যবাবু মিষ্টার লিণ্ডসেকে তাঁহার নিকট লইয়া যান এবং মিষ্টার লিণ্ডসের নিকট তিনি একটী বিবৃতি দেন। কিন্তু সহি দেওয়া ত দূরের কথা মিষ্টার লিণ্ডসেকে তিনি ইহা লিখিয়া লইতেও দেন নাই। তিনি নিজেকে ধরাবাঁধা দিতে চান নাই। তাঁর কথামত দেখা যায় যে তখন তিনি একটী কুটীরে বাস করিতেন। মিষ্টার লিণ্ডসে ইহা লক্ষ্য করেন যে, সত্যবাবু, যিনি তাঁহাকে সাক্ষীর বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন, নিজে ঐ বাড়ীটী চিনিতেন না—যদিও তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, যে সাক্ষীর নাম সমস্ত বাংলা জুড়িয়া পরিচিত? বস্তুতঃ তিনি তেমন কিছু নহেন। **তাঁহার সাক্ষ্য মিথ্যারই পূর্ণ নিদর্শন।** তিনি কুমারকে জানিতেন না, কুমারের সঙ্গে তাঁর কাজ ছিল না, তবুও তিনি বলেন যে তিনি এমন একজন লোকের সঙ্গে গিয়াছিলেন যে এখন মৃত। তিনি বলেন যে মৃত্যুর ৫।৬ দিন পূর্ব্বে তিনি কুমারকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে কুমার শূলবেদনায় অসুস্থ, উহা তেমন সাংঘাতিক নয় এবং বাহিরের ঘরেই কুমারের দেখা পান। পূর্ব্বেও সময় সময় তিনি কুমারের পাকস্থলীর ব্যথা এই অসুখের সংবাদ শুনিয়াছেন। কুমার প্রায় সর্ব্বদাই অসুস্থ থাকিতেন—ইহা পূর্ব্ব প্রচলিত ও

চিতাভস্মে মঠ

আর এক যায়গায় দেখা যায় যে দ্বিতীয় কুমারের অস্থি গঙ্গায় পাঠান হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে মেজ কুমারের অস্থি বলিয়া কতকটা ভস্মাবশেষ আনা হইয়াছিল।

বীরেন্দ্র বলিল যে ঐ ভস্মাবশেষ হাড়ের টুকরা মাত্র। কিন্তু মিষ্টার আর, এন, বানার্জ্জির কথামত উহা নাভির দগ্ধাবশেষ—রবারের ন্যায় একটা জিনিষ ছিল। কিন্তু ইহা হইতে একটা মৃত দেহ দাহ করা হইয়াছিল ছাড়া আর কিছুই প্রমাণিত হয় না। কুমারের ভস্মাবশেষের উপর স্মৃতি মন্দির নির্ম্মাণের প্রস্তাব সম্পর্কে, মিষ্টার জে, এন, গুপ্ত আই, সি, এসের লেখা হইতে ইহাই দেখা যায় যে দ্বিতীয় কুমারের ভস্মাবশেষ আনা হয় নাই। এই সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছিল- তাহা শুনিয়াই তিনি ইহা লিখিয়াছিলেন। এটা তাঁহার অনুমানও হইতে পারে। কিন্তু আমি যে যুক্তির অবতারণা করিলাম তাহাতে এই সমস্তই খণ্ডিত হইয়া যায়—এবং ইহাই প্রমাণ করে যে কুমারের মৃত্যু রাত্রেই হইয়াছিল এবং রাত্রেই শবযাত্রা করা হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় হইতে বাদী ও কুমার যে একজন নয় তাহা বোঝা যায় না। ইহা সাক্ষ্যের ও শরীরের চিহ্নগুলির উপর নির্ভর করে। এই চিহ্নগুলি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কুমারের এই মৃত্যু সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে ঘটিয়াছিল—এবং প্রায় দশটায় মৃতদেহ শ্মশানে নেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু কখনও দাহ করা হয় নাই। সত্য বাবু বলেন যে একথা ঠিক নয় যে মৃতদেহ খুঁজিয়া আনিয়া পরদিন সকালে পুনরায় শ্মশানে আনা হইয়াছিল।

যদি ঐ দেহের পরিচয় ঠিক ভাবেই নেওয়া যাইত, তাহা হইলে পরদিন সকালে অপর শবদাহের কোন স্বার্থকতা থাকিত না। প্রত্যেকেই এই অসম্ভবটী কথার কথা জানিত, কিন্তু ইহাতে ঐ দেহের পরিচয় ও আনুসঙ্গিক ঘটনা সকল—যেমন কাশীশ্বরী দেবী—তাঁহার এ ব্যাপারে অংশ—আনুসাঙ্গিক অনুষ্ঠান—এবং বাদীর আগমনের দশ দিনের মধ্যেই সাক্ষী যোগাড়ের জন্য সত্যবাবুর বেমালুম ভাবে দার্জ্জিলিং ছুটিয়া যাওয়া—এই সমস্ত হইতেই দেখা যায় যে, ঐ শবদাহ সাধারণ রকম নয়। সত্যবাবুর পরের জবানবন্দী ও তাহার ডাইরীতে ও উহার অস্বাভাবিকতা প্রমাণ করে না। এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঝড় বৃষ্টির জন্য মৃত দেহটি শ্মশানে পরিত্যক্ত হওয়ার পরে তাহা উধাও হইয়া যাওয়াতেই ইহা প্রমাণিত হয় না যে ঐ দেহে জীবন ছিল।

সূক্ষ্মভাবে ঐ বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে না। তবু আমার মনে হয় শিখানো সাক্ষী ঘাব্‌ড়াইয়া যাইত। সে তাহা যায় নাই। সে ধীরভাবে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সমস্ত বিষয় তাহার স্মৃতি হইতে মনে করিয়া তাহার বিবরণ দিয়াছে। এই বিবরণ অশিক্ষিত লোকের স্মৃতি হইতে বিবৃত বিবরণের মতই ঘটনা বহুল।

তাহার বিবরণ এইরূপ :—সে এবং বাদীর গুরু ধরমদাস নাগা হরনামদাস পাঞ্জাবী নামক একই গুরুর চেলা। তাহারা অন্য দুইজন সন্ন্যাসীর সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে দার্জ্জিলিংএ আসিয়াছিল। এই চারিজন সন্ন্যাসী দিনের বেলায় বাজারে কাটায়। কিন্তু রাত্রে একটি নির্জ্জন জায়গায় কাটাইতে চায়। এই জন্য পুরাতন শ্মশানের পশ্চিম দিকের একটী পাথরের গুহায় স্থান নির্ব্বাচন করে। তারপর একদিন যাহা হইয়াছিল তাহা সাক্ষীর নিজের কথায়ই বলি।

নাগা সাধুর সাক্ষ্য

"দার্জ্জিলিংএ আমার যখন সেখানে ছিলাম তখন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। একদিন একপ্রহর রাত্রির পর যখন আমরা বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছিলাম তখন আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। একটু পরেই বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই সময় আমি 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। বাবা লোকনাথজী বলিলেন, 'নেকু বাহিরে যাইয়া দেখ।' তিনি আমা অপেক্ষা বড় বলিয়া আমাকে নেকু বলিয়া ডাকিতেন। বাহিরে আসিয়া অনেক লোক দেখিলাম। এই লোকদের সঙ্গে লণ্ঠনের আলো ছিল।

বাবাজি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি দেখলে?'

আমি বলিলাম, অনেক লোক। তিনি বলিলেন অনেক লোক? তুমি কি করিবে ভিতরে আইস। আমি তখন গুহার ভিতরে গেলাম। তখন জোরে বাতাস বহিতেছিল এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আমরা বসিয়া

পড়িতে অভ্যস্ত বলিয়াও মনে হয় না। ইহার বিবৃতি রূপকথার ন্যায় আশ্চর্য্যজনক। বাদী যদি ইহার সাক্ষ্যের উপরই নিজের পরিচয় প্রমাণ করিতে চাহিতেন তাহা হইতে তিনি অকৃতকার্য্য হইতেন কারণ ইহার বিবৃতিতে তিনি যে কুমার এমন কোন কথা নাই।

পরেরটুকু—অল্প কথায় বলা যায়। সন্ন্যাসীরা সেই ঘরই সেই লোকটিকে রাখেন। পরের দিন সকালে সেই কুটিরের মালিক তাহাদিগকে দেখিতে আসেন এবং কম্বল তুলিবার ও কবিরাজী ঔষধের কারখানার মত এক জায়গা হইতে তাহাদিগকে কম্বল আনিয়া দেন। কিন্তু এখানে লোকের ভিড় হওয়ার জন্য তাহারা অজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ঐ লোকটিকে লইয়া আরও নীচে অন্য এক কুটিরে চলিয়া যান।

এখানে তাঁহারা ১৪।১৫ দিন থাকেন তারপর দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করেন। উদ্ধারের ২।৩ দিন পরেই লোকটির জ্ঞান ফিরিয়া আসে। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পরে তিনি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলেও বোবার ন্যায় ব্যবহার করেন। অপর তিনজন সাক্ষীও এই অংশের পোষকতা করেন।

গিরিজাভূষণ রায় ইঁহাদের একজন—ইনি কলিকাতায় কণ্টাক্টার ও কাষ্ঠ ব্যবসায়ী। অপর দুইজন কবিরাজ শ্রীশগুপ্ত ও বিজয়—ইহার আত্মীয়। গিরিজাবাবু বলেন যে তাঁহার মামা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী। জাজ্‌বাজারে তাঁহার মামার কবিরাজী দোকান ছিল এবং ঔষধ পত্র তৈয়ারী করার জন্য সুন্দর বঙ্গ রাস্তার উপর—শ্মশানের পশ্চিমদিক চার কামরা বিশিষ্ট একটি কুটির ছিল। শ্রীশ বাবুর সঙ্গে গিরিজাবাবুর তখন কোনও আত্মীয় সম্পর্ক ছিল না। শ্রীশবাবুকে এই ঔষধের কারখানার ভার দেওয়া হইয়াছিল- -তিনি এই কুটীরের একটী ঘরে বাস করিতেন। অন্য একটী কোঠায় গিরিজাবাবুর কম্বল বোনার তাঁত ইত্যাদি ছিল। এই কুটীরের নিকট গুদামের মত আর একটী কুটির ছিল। গিরিজাবাবু ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত দার্জিলিংএ বাস করিয়াছেন। তিনি বলেন, খবর শুনিয়া সেই গুদামে গিয়া চারিজন সন্ন্যাসী ও একটী রুগ্ন

প্রথম লাইনের বামদিক হইতে—ফেনী (কুমারের ভাগিনেয়ী), বিল্লু, টেব্বু, বুদ্ধু, জব্বু (কুমারের ভাগিনেয়)। দ্বিতীয় লাইনে উপবিষ্ট —মটর, ইন্দুময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী (কুমারের ভগ্নী)। তৃতীয় লাইনে—ভাগিনেয়ী মণি, বদ্ধুর স্ত্রী, বিল্লুর স্ত্রী ও ভাগিনেয়ী কেনী। চতুর্থ লাইনে—বালক বালিকাগণ

১৯০৯ মে হইতে ১৯২০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত
সন্ন্যাসীর জীবন

এই সময় মধ্যে কুমারের নাম শোনা যায় নাই বা কোথায় আছেন তাহাও জানা যায় নাই। কুমার জীবিত আছেন এই গুজব থাকা সত্ত্বেও কেহ তাহাকে জীবিত বলিয়া মনে করে নাই। আমি উপরে এই সময়ের যে বর্ণনা দিয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে কুমারের মৃত্যু সর্ব্বজন স্বীকৃত ঘটনা। বাদী নিজের এই সময়ের যে বর্ণনা দেয় তাহা কেবল তাহার নিজের ও দর্শনদাসের কথার উপরই নির্ভর করে। ইহাতে অন্য ভাবে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি করে না। তাহার এই বর্ণনার জন্যই সে মেজ কুমার বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা নহে—সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা এইরূপ।

পাহাড়ের মধ্যে—জঙ্গলের ভিতর এক কুটীরের মধ্যে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে, এবং নিজেকে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখেন—এই চারিজন সন্ন্যাসীর নাম তিনি বলিয়াছেন। 'আমি এই স্থানে ১৫।১৬ দিন ছিলাম। এই সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয় নাই। তারপর কি হইয়াছিল তাহা আমার মনে নাই। আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই চলিলাম। আমরা হাঁটিয়া ও রেলে করিয়া গিয়াছিলাম। তারপরে যাহা আমার মনে পড়ে তাহা এই যে—আমি বারাণসীতে অসিঘাটে ছিলাম। সন্ন্যাসী চারিজন তখনও আমার সঙ্গে ছিলেন। অসিঘাটে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করিতাম। এখানে আমাদেব পশ্চিমা ও বাঙ্গালী সাধুদের সঙ্গে দেখা হয়। দুই জন বাঙ্গালী সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। আমি তাহাদের সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালাতেই কথা বলিয়াছি। পশ্চিমা সাধুর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলিয়াছি। আমি ঐ সাধু চারি জনের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলিতাম—তাঁহারা আমার সঙ্গে হিন্দিতে বলিতেন। সেই সময় আমি কে, সে স্মরণ শক্তি আমার ছিল না।

তাঁহার ভ্রাম্যমান জীবনের বাকী অংশ—এক তীর্থ হইতে অন্য তীর্থে ঘুরিয়াই কাটাইয়াছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে কাশ্মীরে অমরনাথে পৌছেন। ইহা অসিঘাটের চারি বৎসর পরে। এখানে তিনি মন্ত্র লইয়া গুরু ধরমদাস নাগার শিষ্য হন। যে চারিজন সন্ন্যাসীর সহিত তিনি ঘুরিতে ছিলেন ধরমদাস তাহাদের 'একজন। শ্রীনগর বাজারের এক উল্কী ওয়ালাকে দিয়া তাঁহার গুরুর নাম বাহুতে লিখাইয়া

লন। শ্রীনগর হইতে বহু স্থান ঘুরিয়া নেপালে আসেন। নেপালে পশুপতি নাথ হইতে তির্ব্বতে যান এবং পুনরায় নেপালে ফিরিয়া আসেন,—এখানে এক বৎসর বাস করেন। কিন্তু নেপাল ত্যাগের পূর্ব্বে ব্রাহোচ্ছত্তরে একটা কিছু ঘটনা হয়—এখানে তিনি সেই চারিজন সন্ন্যাসীর সহিত বাস করিতে ছিলেন। "এখানেই মনে হয় যে আমার বাড়ী ঢাকায়।"

এখানে তাঁহাকে এর পূর্ব্বের মানসিক অবস্থার কথা বর্ণনা করিতে বলা হইল। তিনি যাহা বলিলেন তাহা এই যে—অসিঘাট পর্য্যন্ত তিনি অজ্ঞান ছিলেন। "এমন কি অমরনাথেও আমি মনে করিতে পারি নাই যে, আমি কে, আমার বাড়ী কোথায় এবং আমার আত্মীয় স্বজনই বা কোথায়" ? মন্ত্র লওয়ার পরে তাঁহার গুরুর সঙ্গে এবিষয়ে কথা হইয়াছিল এবং তিনি (গুরু) বলিয়াছিলেন যে তাঁহাকে ভিজা অবস্থায় দার্জ্জিলিংএর শ্মশানে পাওয়া গিয়াছিল। যখন তিনি নিজে চিন্তা করিতেন তিনি কে, তাঁহার আত্মীয়েরা কোথায়, তখন তাঁহার মন আকুলিত হইয়া উঠিত এবং তিনি গুরুকে একথা বলিতেন,—তখন গুরু বলিতেন ঠিক সময় আসিলে আমি তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যদি তিনি সংসার ও বাড়ীর মায়া ত্যাগ করিয়া গুরুর কাছে ফিরিয়া যান তাহা হইলে তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া হইবে। তারপর ব্রাহোচ্ছত্তরে যখন তাঁহার এইটুকু স্মৃতি ফিরিয়া আসিল যে, তাঁহার বাড়ী ঢাকায় তখন তাঁহাকে বাড়ী যাইতে বলা হইল, এবং তিনি একাকী রওনা হইলেন। তারপর বহু স্থান ঘুরিয়া ঢাকায় পৌছেন। "যখন ঢাকা ষ্টেশনে নামিলাম তখন আমার মনে হইল যে এস্থানে আমি বহুবার যাতায়াত করিয়াছি এবং জিজ্ঞাসা না করিয়াই বাকুলাণ্ড বাঁধের রাস্তা ধরিলাম।"

তারপর যে সকল ঘটনা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—তাহা আরম্ভ হইল। জয়দেবপুরে তাঁহার প্রথম আগমনের সময়—যখন তিনি ঘুরিতে ছিলেন—"তখন আমার কাছে সমস্তই পরিচিত বোধ হইল"।

এর পূর্ব্বে বাকুলাণ্ড বাঁধে যে সমস্ত লোক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিত, 'এই ভাওয়ালের মেজোকুমার' তাহাদের কোন কোন লোককে তিনি চিনিতে পারিতেন। জয়দেবপুরে প্রথমবার যাওয়ার সময়ই তাহার পূর্ণস্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসে।

এই সমস্তই অদ্ভুত মনে হয়—কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা করিয়া তাঁহাদের প্রামাণ্যগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,

তারপর একদিন তাঁহার মনে হইল তাঁহার বাড়ী ঢাকা এবং ঢাকা আসিয়া তিনি ধীরে ধীর তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন।

মেজর টমাস মনে করেন বাদীর বিবৃতিতে এমন কতগুলি জিনিষ আছে যাহা অসম্ভব। প্রথম বৎসর দার্জ্জিলিং হইতে অসীঘাট যাওয়ার সময় তিনি যে অবস্থায় ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"জ্ঞান ছিলনা—বা এই রকম কিছু" —উহা পশ্চাদ্বর্ত্তন—উহা dissociation এবং adoptation এর সহিত একসঙ্গে চলিতে পারে না, তাহা হইলেই বলা যায় Rev. Hannaর ন্যায় তিনি শিশু হইয়া গিয়াছিলেন— Ansel Bourne এর মত তিনি দোকান করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি আশা করিতে পারেন না যে আদিম বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার স্মৃতি আরও ভালরূপে ফিরিতে পারে। তৃতীয়তঃ এইরূপ মানসিক ভাবের একত্ব (dissociation) সাধারণ রকমের নয়। প্রায়ই ইহা হিষ্টিরিয়ার ন্যায় স্নায়বিক রোগীদের হইয়া থাকে। মেজর ধুঞ্জি ভাই কার্য্যতঃ এই মতই দেন। লেঃ কঃ হিলের মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞতা আছে তিনি বলেন বাদীর বর্ণনায় কিছুই অসম্ভব নয়।

বাদী শৈশব অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এই অভিমত সম্বন্ধে বলা যায়—যদি তাহাই হইত—তাহা হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ না হইয়া অপ্রকৃতস্থ হইতেন, ইহাই টঠোলজির মত। তিনি যে শৈশবাবস্থায় ফিরিয়া ছিলেন, বাদী একথা বলেন না। সেটা যে কি অবস্থা তাহা তিনি বলিয়াছেন—তিনি ইহাকে অজ্ঞান অবস্থা বলিয়াছেন। এবং জিনিষ পত্র চিনিতে পারিতেন—পাহাড় গাছ, সন্ন্যাসী ঘাট এইরূপ জটিল পদার্থ গুলিও চিনিয়াছেন—কেবল দার্জ্জিলিং হইতে অসিঘাট পর্য্যন্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বা অন্য কেউ যে তাহার মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিতে পারেন এ আশা আমি করি না। তাঁহার বিবরণ হুবহু ও কঠোরভাবে মানিয়া লওয়া অস্বাভাবিক, তবে তিনি যে ভাবে বিবরণ দিয়াছেন ঠিক সেই ভাবে দেখিলে— ইহা যে শৈশবাবস্থাতে ফিরিয়া আসা বলা যায় না। ইহা পশ্চাদ্বর্ত্তনের শেষতম দৃষ্টান্ত। ইহাতে যে ক্রমবিভাগ নাই এ বিষয়ে আমি মেজর ধুঞ্জি ভাইয়ের সহিত একমত নহি। মেজর টমাস বলেন "স্মৃতিভ্রংশের সময়ে পারিপার্শিক ঘটনা হইতে উদাসীনতা অনেক রকমের হইতে পারে। অর্থাৎ এরূপ লোক দেখা যায়, মানসিক সুস্থতা যে ন্যূনাধিক বিশৃঙ্খল চিত্ত হইয়াও সম্পূর্ণ উদাসীন নহে, আবার এই রকম

স্মৃতিভ্রংশের কাল সম্বন্ধে আত্মজীবনী লিখিয়াছেন। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার এ ব্যবধান চিন্তা দ্বারা অতিক্রম করা যায়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে এমন কোন নিয়ম বা সূত্র নাই যাহা দ্বারা বাদীর বিবৃত ঘটনাকে অস্বিকার করা যায়। (মধ্যাকর্ষণ আছে বলিয়া বাদীর শূনে উড়িয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব এই নিয়ম এমন নহে)। সচরাচর দেখা গেলেও স্নায়বিক রোগ যে থাকিবেই এমন কোন কথা নাই, এবং কুমারের সম্বন্ধে—এ সম্বন্ধে কেহই কোনও প্রশ্ন তুলেন নাই। মিঃ চৌধুরী সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন তুলিয়া ছিলেন যে বাদীর ব্যাপারে এই সমস্ত অস্বভাবিক ঘটনা ঘটিয়া ছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কি কারণ থাকিতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, দার্জ্জিলিং হইতে এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য বাদীর যথার্থ পরিচয় করা নয়,—কিন্তু অন্যান্য ঘটনার সাহায্যে বাদীর পরিচয় যে ভাবে সাব্যস্ত হইয়াছে ইহা তাহার বিরোধী কি না?

ইহা যদি একবার প্রমাণিত হয় তাহা হইলে দার্জ্জিলিং হইতে ঢাকায় আগমন পর্য্যন্ত এমন কিছুই ঘটে নাই যাহাতে এই সিদ্ধান্ত অন্যথা হইতে পারে এবং একবার পরিচয় প্রমাণিত হইলে প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী বলিয়া তাহা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। বস্তুতঃ ইহা কোন নিয়মেরই বিরোধী নহে।

বাদী কি হিন্দুস্থানী?

আমার ইহা মনে হয় না দেখিতে মেজকুমারের মত, তাঁহারই শরীরের চিহ্নগুলি লইয়াও ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে মধ্যমকুমার কি রকম করিয়া নাম সেই করিতেন তাহা অভ্যাস করিতে থাকে। এ সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে সেইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার।

বলা হইতেছে যে বাদী একজন পাঞ্জাবী। বিবাদী পক্ষ ইহার অধিক কিছু প্রমাণ করিতে বাধ্য নহেন। বাদীর যথার্থ পরিচয় কি তাহা প্রমাণ করিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন, তবুও এই মকোদ্দমায় বাদী যে পাঞ্জাব লাহোর জেলার—আজলা গ্রামের মালসিং তাঁহার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই ব্যাপারের উপর তেমন জোর দিয়া কিছু বলা হয় নাই এবং বাদী আজলা গ্রামের মালাসিং কিনা; অথবা ধর্ম্মদাস নাগা তাহাকে সন্ন্যাসী করার পর তাহার নাম সুন্দরদাস হয় কিনা ইহা বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। এ সম্বন্ধে প্রমাণ বুঝিতে হইলে ১৯২১ সালের কি ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে

ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের ধারা মূলে এই ছয় জনের বিবৃতি লইয়াছেন এবং পুলিসের কর্ম্মচারীর হাতে দিয়াছেন।

লোক না দেখিলে এগুলিকে জমানবন্দী বলা যাইতে পারে না।

ধরমদাসের বিবৃতিতে মালসিংহের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। তার বাড়ী আজলা, সে নারাণ সিং ও লাভ সিংএর ভাইপো—ইহাতে দুজনেরই ঠিকানা আছে। ১৯১০ সালে মাল সিং ধরমদাসের চেলা হয় ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত এক সঙ্গে ছিল—এবং ১৯২৭ সালেও এলাহাবাদে কুম্ভ মেলায় দেখা হইয়াছিল। এখন ১৯২০ সালে তাহার বয়স ২০ বৎসর হইলে এখন তাহার বয়স ৪৬ বৎসর হওয়া উচিত। সে লেঃ রঘুবীর সিংএর কাছে পি—১ লেখা ফটোতে এই লোকটিকে দেখিয়াছে।

আমি বলিয়াছি—১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগা ২৬শে তারিখে ঢাকা আসেন এবং ৩০শে তারিখে চলিয়া যান। মিঃ লিণ্ডসে তাঁহাকে তাঁহার সহিত দেখা করার জন্য লিখিয়াছিলেন কিন্তু তিন চলিয়া যান। বাদী তাহার জবানবন্দীতে বলেন পুলিসের ভয়েই তিনি প্রস্থান করেন। তাহার বিবৃতিতে বাদী স্বীকার করিয়াছেন যে বিপক্ষদলের চক্রান্তে পুলিশের নিকট তিনি একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন।

মোকদ্দমার সময় বাদী, ধরমদাস ঢাকায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিতে দেওয়া হয় নাই। কারণ সাক্ষ্য দিতে না আসিলে এমন কি আসিলেও—এই বিবৃতিকে জবানবন্দি বলিয়া নেওয়া চলে না—কোন পক্ষ হইতেই তাহাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকার প্রস্তাব আসে নাই—যে দশ জন সাক্ষী তাহার ফটো দেখিয়া কমিশনারের সম্মুখে বাদী মঙ্গল সিং এই বিবৃতি দিয়াছিল কেবল তাহাদের কমিশনে জবানবন্দি নেওয়ার কথা হইয়াছিল মাত্র।

ছুটির পাঁচদিন পূর্ব্বে ২১-৯-৩৫ তারিখে একজন লোককে আমার সম্মুখে আনা হয়—এই লোক নিজেকে ধরমদাস নাগা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং বলে সেই লেঃ রঘুবীর সিং এর নিকট বিবৃতি দিয়াছিল। সে বলে—বাদী (তখন আদালতে উপস্থিত ছিলেন) আমার চেলা সুন্দরদাস। সাক্ষী কখনও দার্জ্জিলিং যায় নাই এবং বাদী লাহোর জেলার আজলা গ্রামের মালসিং।

বাদীর বক্তব্য এই যে, যে লোকটি তাহার গুরু বলিয়া পরিচয় দেয়—সে জাল। সে যে জাল এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই, তাহার জবানবন্দি

শেষ হইয়া গিয়াছিল। এবং রঘুবর সিংহের সামনে প্রদত্ত বিবৃতিতে যে আত্মীয়গণের উল্লেখ করা হইয়াছিল, সেরূপ আত্মীয় তাহার ছিলনা এই ঘটনায় ব্যাপারটী আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল এবং স্থূলকায় কথাটী ১৯২১ সালে বাদীর পক্ষে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইহা আদৌ আশ্চর্য্যজনক নহে যে মিষ্টার চৌধুরী বাদীকে সে যে অজুলার মাল সিংহ এই উক্তি আরোপ করেন নাই।

কালো চুল তেল না মাখিলেও যত্ন না লইলে কটা হইয়া যাইতে পারে। সাক্ষীগণের নিকট এই উক্তি উপস্থাপিত করিয়া—এই ব্যাপার আবার তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে ইহা স্বীকৃত হইল যে—বাদীর চুল পিঙ্গল বর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং সাক্ষীগণ স্বীকার করিল যে বাদীর চুল দ্বিতীয় কুমারের চুলের মত।

বাদীকে কোন প্রশ্ন না করিয়া সে যে মালসিংহ ইহা প্রমাণ করা—এবং তাহাকে সর্ব্বপ্রকার স্থানে স্থাপন করা এবং তাহার মুখে সর্ব্ব প্রকার উক্তি আরোপ করা—প্রতিবাদীর পক্ষে যে সম্ভব হইতে পারে উহা আমার নিকট অদ্ভূত বোধ হয়, কিন্তু তৎ সত্ত্বেও এই ব্যাপারের গুরুত্ব দেখিয়া আমি- সাক্ষ্য সমুদয় বিবেচনা করিয়াছি। এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই মালসিংহের আদৌ কোন আত্মীয় নাই, তাহার পূর্ব্ব আবাসের কোন খবর নাই—কারণ আমি ইহা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি যে—মেন্দুলওয়ালীতে তাহার এক আত্মীয় ভ্রাতা আছে। কারণ সেরূপ হইলে তাহাকে সাক্ষী ডাকা হইত। এবং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে লাহোরের সাক্ষীগণ—একদল কৃষক এবং তাহাদিগকে আনা হইয়াছিল যে ফটো সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানিত না সেবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এবং তাহাদিগের দ্বারায় এমন কতকগুলি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে বাদীর সনাক্ত নির্দ্ধারিত হয়। ধর্ম্মদাস নাগা (প্রঃ সাঃ ৩২৭) যে মোকদ্দমা বাস্তবিক পক্ষে শেষ হইয়া গিয়াছিল তাহাই পুনর্জীবিত করিবার জন্য আদালতে আসিয়াছিল। অজুলার সাক্ষীগণ যাহা বলিয়াছে; রঘুবর সিংহের নিকটে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং যে প্রকৃত ধর্ম্মদাস নাগা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় আসিয়াছিলেন তাঁহার কার্য্যাবলী এই সমস্ত গুলির সহিত যাহা মিল খাইবে এইরূপ বিবরণ এই সাক্ষীকে দিতে হইয়াছে।

এই লোকটীকে কিরূপে যোগাড় করা হইল—এ সম্বন্ধে একটী চমৎকার বিবরণ আছে। ইনস্পেক্টর মমতাজ উদ্দিনকে পাঞ্জাবে গিয়া—এই সাধুকে

সে কেবল মাত্র পাঞ্জাবী ভাষা বুঝিত। যদি ইহা ছল না হইবে তাহা হইলে যে ধরমদাস রঘুবর সিংহের সামনে বিবৃতি দিয়াছেন বলে
সে ধরমদাস হইবে না, কেবলমাত্র এই সংক্ষিপ্ত কারণ এই যে ধরমদাস সহজ উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার বিবৃতি দিয়াছিলেন এবং ঐ ভাষা বড় সহরে যে বাস করে এরূপ বাঙালী বুঝিতে পারিত; এবং যখনই ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে সুরেন্দ্রনাথ একজন ঢাকার লোক, তাহার রিপোর্টে অনেক সংবাদ দিয়াছিল যাহা, সে ১৯২১ সালে সাংগ্রাতে ধরমদাসের সহিত সাক্ষাতের ফলে জানিতে পারিয়াছিল, এখনই কেসটী এইরূপ দাঁড়াইল যে এই ধরমদাস (প্রঃ সাঃ ২২৭) সুরেন্দ্রের বিবৃতিমত সাংগ্রাতে এইরূপ আধ হিন্দী আধা বাংলায় কথা বলিয়াছিল যাহাতে সে তাহার কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। আপাততঃ এরূপ আশা করা হইয়াছিল যে পাঞ্জাবী ভাষা ও তাহার ব্যখ্যারূপ অন্তরায় এবং ছুটীর পূর্ব্বে পাঁচদিন এবং তাহাও আবার একটী রবিবার দ্বারা সংক্ষিপ্ত হইবে এবং অসুখের অজুহাতে তাহার বাড়ীতে সাক্ষীগ্রহণ এই সকলের দ্বারা সে রক্ষা পাইবে। কিন্তু ইহা তাহাকে রক্ষা করে নাই।

সে প্রথমে এই বলিল যে সে রঘুবর সিংহের সম্মুখে বিবৃতি দান করিয়াছে এবং তাঁহার সামনে এ (২৪) নং ফটো ও উহার একটী কপিতে তাহার চেলা সুন্দরদাসের ফটো বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে। ফটোটীর উপরে রঘুবর সিংহের দ্বারা প্রদত্ত একজিবিট পি (১) এই চিহ্নটা নাই, এবং ফটো না দেখাইলে বিবৃতির কোনই মূল্য নাই। আমি জিজ্ঞাসা করায় মিঃ চৌধুরী বলিলেন যে রঘুবর সাক্ষীকে যে ফটোর দেখাইয়াছিলেন তাহা উহার কাছে নাই কিন্তু তিনি ইন্‌সপেক্টার মমতাজউদ্দিন ও সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট এই উপদেশ পাইয়াছেন যে ২৭।৬।২১ তারিখে রঘুবর সিংহের সামনে সাক্ষীদের যে ফটো দেখান হইয়াছিল এ ২৪নং একজিবিট সেই ফটোর একখানি কপি (২৫।৯।৩৫ তারিখের ১২৪৩ নং অর্ডার দ্রষ্টব্য) সেই ব্যাপারের সহিত মিল রাখিয়া ধরমদাস বলিয়াছে যে—রঘুবর সিংহের সম্মুখে এ (২৪) ফটো দেখান হইয়াছিল। এই ফটোতে বাদী একটী লুঙ্গি পরিয়া বসিয়া আছে। প্রতিবাদীপক্ষের কে একজন যেন লক্ষ্য করিয়াছিল যে, সুরেন্দ্রবাবুর রিপোর্ট আছে যে রঘুবর সিংহের সামনে সাক্ষীদিগকে যে ফটো দেখান হইয়াছিল উহা খাড়া ফটো (দণ্ডায়মান ফটো)। ইহা পরে এবং খুব দেরীতেই লক্ষ্য করা হইয়াছিল কিন্তু সাক্ষী তখনও কাঠগড়ায় ছিল এবং সে বলিল যে—রঘুবীর সিংহের সামনে তাহাকে যে ফটো

হইয়াছে। বিবৃতিটি পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু ফটোটি পাওয়া যাইতেছে না। যে ফটোটী দেখান হইয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তে এই যে অপর একটী ফটো স্থাপন ইহাকে আমি কেবলমাত্র অতি জঘন্য ধরণের কৌশল বলিনা, ইহাকে জুয়াচুরী বলি।

যে ধর্ম্মদাস বিবৃতি দান করিয়াছেন তাঁহাকে যে ফটো দেখান হইয়াছিল সেই ফটো ব্যতীত বিবৃতির কোনই দাম নাই এবং এটী উপস্থিত না করা এবং তাহার পরিবর্ত্তে জুয়াচুরী করিয়া অন্য ফটো স্থাপনের চেষ্টা করা এবং উহা ব্যহত হইলে তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করা এই সমস্ত হইতেই এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে—ফটোর লোকটী সুন্দরদাস, এই বিবৃতি বাদীর ফটোর পরিবর্ত্তে অন্যের ফটো দেখাইয়া লাভ করা হইয়াছিল, এবং বাদীকে যে পরে সুন্দরদাস বলা হইয়াছে এই সুন্দরদাস নামের উৎপত্তি উক্তরূপে ঘটিয়াছিল।

বিবৃতিটি গেল বটে কিন্তু লোকটি রহিল। যে যদি রঘুবর সিংহের সামনে বিবৃতিদান না করিয়া থাকে তাহা হইলে সে বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগা নহে। নিম্নলিখিত বিবেচনা মতে মাত্র একটী সিদ্ধান্ত সম্ভব।

১। ইহা স্বীকার হইয়াছে যে ২৭।৬।২১ তারিখে এ (২৪) একজিবিট বিবৃতিকারীকে দেখান হয় নাই, কিন্তু এই লোকটী জুয়াচুরীর মতলবের একটী অংশ স্বরূপ হলফ করিতেছে যে উহা দেখান হইয়াছিল। সে পরে হলফ করিতেছে যে খাড়া ফটোটী দেখান হইয়াছিল, যাহা আদৌ দেখান হয় নাই, সেরূপ হইলে উহাতে একজিবিট চিহ্ন থাকিত।

২। সে যদি সেই একই লোক হইত, তাহা একজিবিট মার্ক বিশিষ্ট ফটোটি উপস্থিত করা হইত।

৩। অজুলার সাক্ষীগণ যে ভুল করিয়াছিল যে সে ভুল করিবে না। সে বলিতেছে যে মালাসিংহ স্থূলকায় ছিল না। তাহার চুল আমার মত সোনালি ছিল—যেমন পাঞ্জাব হইতে আহূত একজন সাক্ষী বলিয়াছিল যে তাহার চুল ছিল 'কাক্কা ভুরা' এবং আর একজন সাক্ষী বলিয়াছিল কাক্কা অর্থাৎ তাহার ব্যাখ্যা মতে ফিকে সোনালী।

৪। এই বিবৃতিকারী বলিয়াছে যে তাহার পেশা সেবাদার অর্থাৎ সে এক গুরুদ্বারের পুরোহিতের ব্যবসাধারী। এই সাক্ষী বলিতেছে যে সে কোন স্থানে সেবাদার নহে এবং সে সেবাদার এ কথা কখনও বলে নাই। দেবদাস সহ পাঁচজন সাক্ষী রঘুবর সিংহের সামনে ২৭।৬।২১ তারিখে বিবৃতি দিয়াছিল কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত ঘটনা জানে না। অবশ্য সে বিবৃতির মধ্যে এই বর্ণনা

করিতেছে কিন্তু নারায়ণ সিং ব্যতীত কোন আত্মীয়ের উল্লেখ করিতে সাহস করিতেছে না। সে বলিতেছে যে অজুলার সাক্ষীগণ মিথ্যা প্রমাণিত করিতেছে। সে বলিতেছে যে বহুবর্ষ পূর্ব্বে একদিন এক বাঙালী বাবু—ও একটী পুলিশের লোক তাহার কাছে গিয়াছিল এবং তাহাকে একটী ফটো দেখাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—সে কে? তাহারা আসিয়াছিল বেলা ৩টার সময় যখন সে ছোট সংস্রার সংলগ্ন গ্রামে গুরুকাবাস মন্দিরে অবস্থান কবিতেছিল। তাহারা তাহাকে একটী ফটো দেখাইয়াছিল, যে ফটোটি আদালতে তাহাকে দেখান হইল—একজিবিট এ (২১)—এবং পরে খাড়া ফটো। সে ফটো দিখিয়া বলিয়াছিল—আমার চেলা সুন্দরদাসকি হ্যায়। আমার চেলা সুন্দরদাসের ফটো। আগন্তুকেরা ইহা লিখিয়া লইল এবং আর কোন কথা বলি ন। তারারা গুরুকাবাসে রাত্রি যাপন করিল এবং পরদিন প্রাতে তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রের নিকট লইয়া গেল এবং তথায় সে এই বিবৃতি করিল। ছুটীর পূর্ব্বে উহাই ছিল সমগ্র বিবরণ, এই বিবৃতি লইবার পূর্ব্বে ফটো দেখান ছাড়া আর কোন কথা হয় নাই এবং "উ লেক কে চুপ্"। ধরমদাসের সহিত সুরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল সে তাহার চেলা সেবাদাসের সহিত ফটোটা চিনিয়াছিল এবং তাহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সুতরাং সে যে সংবাদ আনয়ন করিতেছিল তাহার সবটা না হইলেও কতকটা ধরমদাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ছুটীর পরে ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ কিছু কিছু কথা আরম্ভ করিল এবং রাত্রে দেবদাসের নিকট আসিল সুতরাং এরূপ বলা যাইতে পারে যে দেবদাস তথায় এবং তাঁহার সহিত ফটো দেখিয়াছিল। সে বলিতেছে যে তাহার সর্ব্বসমেত ৪।৫ জন চেলা আছে এবং পূর্ব্বে সর্ব্বসমেত ১২ জন চেলা ছিল এবং টাকা পাঠানের কথা দূরে থাকুক তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত না। তাহার সাক্ষ্যে যে সব মিথ্যার ছাপ রহিয়াছে সেগুলি নির্দ্দেশ করা বিরক্তিকর। একজিবিট পি (১) এর পরিবর্ত্তে অন্য একটা ফটো স্থাপন করিবার চেষ্টা এবং উহা ব্যাহত হইলে তৃতীয় ফটো স্থাপনের চেষ্টায় সে সহযোগিতা করিয়াছিল এবং উহাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিতেছে যে—একজিবিট পি (১) তাহাকে নষ্ট করিবে। রঘুবীর সিংহের সম্মানে যে বিবৃতি দান করিয়াছিল সে সে-লোক নহে, সুতরাং বাদীর গুরু নহে।

তাহার সাক্ষ্য শেষ হইলে তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করা হইয়াছিল। একজন উকিল বরাবর পঞ্জাব গিয়াছিল, তাহাকে

তাহা বলিয়া দিত এবং এই ধরণের লোক আদালতে কিছুতেই এই লোকটাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

এই দলের সহিত আর দুইজন লোক আসিয়া ছিল, উহাদিগকেও শিখ উকিল আনিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজনের ধরমদাসের গুরু হরনাম দাস। তিনি ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ ধরমদাসের ফটোকে তাহার দেশী ধরমদাস বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিলেন এবং বাদীকে তাহার চেলা চেলা সুন্দরদাস বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। ধরমদাস ও হরনাম দাসের সমস্ত বিবরণ বাদীর সাক্ষী দর্শনদাসের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু একটী কথা পাওয়া যাইতেছে না। দর্শনদাস বলিয়াছেন যে তাঁহার গুরু লুধিয়ানা জেলার বিলু নামক স্থানের এক গৌর ব্রাহ্মণ। লোকটী দর্শনদাস ওরফে গোপালদাসকে চেনা বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, দিলুকে গ্রহণ করিতেছে কিন্তু সে জানেনা যে সে একজন গৌর ব্রাহ্মণ। সে বলিতেছে যে ধরমদাস ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বে সুন্দরদাসকে তাহার চেলা করিয়াছিল এবং সে নিজে ধরমদাসকে ২০ বৎসর পূর্ব্বে দীক্ষা দিয়াছিল। সে যখন বলিয়াছেন যে সে বাকী দলের সঙ্গে আসে নাই, পরন্তু ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে প্রায় তিনদিন কলিকাতায় ছিল তখন সে ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা বলিয়াছিল। গুর্জ্জর সিং ও চন্দন সিং তাহাকে লুকাইতে ছিল কিন্তু ভগত স্বীকার করিতেছিল যে এই লোকটী সমেত সমস্ত দল কোথাও না থামিয়া একসঙ্গে ঢাকায় আসিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে জালসা দেওয়ানের লোক অর্জ্জুন সিং এই জাল ধরমদাস নাগাকে সংগ্রহ করিয়াছিল, যাহাতে সে আসিয়া বলিতে পারে যে সে ব্যক্তি ১৯২১ সালে রঘুবর সিংহের সমক্ষে বিবৃতি দিয়াছিল সে সেই লোক। সে আসিল এবং তারপর এই বিবৃত যাহাতে বাদীর বিপক্ষে যায় ফটো বদলাইয়া সেই চেষ্টা আরম্ভ হইল। এবং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভান করিবার জন্য যে ইনসপেকটার মমতাজ উদ্দিন পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন এবং যে সাক্ষী দিতে আসিবার পূর্ব্বে কখনও তাহাকে দেখে নাই—তাঁহাকেই আসিতে হইল এবং তিনি ১৯২১ সালে যে সাধুকে দেখিয়াছিলেন সেই সাধু বলিয়া এই লোকটাকে সনাক্ত করিতে হইল এবং কৌশুলীকে ফটোটী উপবিষ্ট ফটো পরামর্শ দেওয়ার পর বলিতে হইল যে তাহাকে খাড়া ফটো দেখান হইয়াছিল। ইহাকে ভুল হইয়াছিল বলা চলে না, পরন্তু রঘুবর সিং যে ফটোটীতে একজিবিট পি (১) চিহ্ন দিয়াছিলেন সেইটীর পরিবর্ত্তে বাদীর একটী ফটো স্থাপন করার নীচ ষড়যন্ত্রের অংশ বলা চলে।

কথাটি দেখিয়াছিলাম (একজিবিট টি) ফণীবাবুর জয়দেবপুরের বাড়ীর নাম নয়াবাড়ী। যদি উহা জানা না থাকিত এবং বাদী যদি বাড়ীটীকে নয়াবাড়ী বলিত তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হিন্দুস্থানী বলিয়া ধরা হইত। কথার উপর সিদ্ধান্ত করা বিপজ্জনক।

এরূপ করিবার প্রয়োজনও নাই। কারণ এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে বাদী হিন্দী বলিয়া ফেলিত এবং উহা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিত। সে ইংরাজিও বলিয়া ফেলিত—৫০এর অধিক ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল-- যথা বিস্কুট, বডিগার্ড, জেলী, রুল, জজ ইত্যাদি। আমার ধারণা এমন কোন ভারতবাসী নাই যে কতকগুলি ইংরাজী কথা জানে না, যথা ট্যাক্স, ট্রেণ, রেলওয়ে, গার্ড, ডাবস্ এবং যাহারা ইংরাজী জানে তাহারা তর্কের খাতিরে না হইলে পাঁচ মিনিট ধরিয়া ইংরাজী কথার ব্যবহার না করিয়া বাংলায় কথা বলিতে পারে না।

সুতরাং বাদী যখন সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে ১২ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছিল এবং হিন্দী ব্যতীত কিছুই বলে নাই, এবং তাহাদের মত জীবনযাপন করিতেছিল উলঙ্গভাবে—বেড়াইতেছিল, খোলা ভূমিতে শয়ন করিত, বালিশের পরিবর্ত্তে কাঠের গুঁড়ি মাথায় দিত এবং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিত এবং এই সমস্তই তাহার যৌবনের প্রথম অবস্থায় করিয়াছিল, তখন আমি আশা করি যে সে তাহার মাতৃভাষার মতই হিন্দী বলিবে এবং তাহাদের কথার টান ও উচ্চারণ ভঙ্গিলাভ করিবে, সুতরাং সে যখন আবার বাংলা বলিতে আরম্ভ করিল তখন আমি আশা করি না যে সে মধ্যে মধ্যে বাংলা বলিবে না, বা আদৌ হিন্দী বলিবে না বলিয়া সম্ভাবনা করিবে।

কেহই এমন কথা বলে না এবং ইহা বলাও বোকামি হইবে যে যেমন সে আত্মপরিচয় ঘোষণা করিল অমনি সে যেমন লোকে কাপড় ছাড়িয়া ফেলে অমনি সে হিন্দীভাষা পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং ইহা দেখিতে হইবে যে এই হিন্দীসুর ও মধ্যে মধ্যে এই হিন্দীবুলীর এবং হিন্দীসুরে ভাওয়ালীবুলী ভাওয়ালীর মত না বলা ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় যে—একজন হিন্দুস্থানী বাংলা বলিতে শিখিয়াছে, না একজন বাঙালী কথা বলিবার হিন্দী ধরণ অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে দুইটী জিনিস অবিলম্বে বর্জ্জন করা ভাল. তাহাদের মধ্যে একটী হইতেছে এই মত যে, কোন বাঙালী যতদিনই হিন্দীভাষী

একজন পাঞ্জাবী। ১৯২৫ সালে তিনি ৭নং বোস-পার্কে বাস করিতে বাদীর সহিত প্রায়ই হিন্দীতে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত। তিনি এই অস্পষ্টতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে বাদীর হিন্দী হইতেছে বাঙালীর হিন্দী। সে বাংলা কথা খিশাইয়া কথা বলিত এবং তাহার মতে পাঞ্জাবীর পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব হইত। আমি এই সাক্ষীকে বিশ্বাস করি।

আমি এবিষয়ে এক মত নই যে বাদীকে তাহার বাক্যের এই বিশেষ লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে নচেৎ অন্য উপায়ে লব্ধ-সনাক্ত নষ্ট হইবে।

যদি ইহা জন্মগত না হয় তাহা হইলে যে সনাক্ত অন্যভাবে পরিষ্কার তাহা ইহা দ্বারা অদৌ নষ্ট হয় না। তাহার জিহ্বার তলস্থ পুংকোষের দ্বারা এরূপ হইতে পারে কিংবা ইহা তাহার জন্য নয় এবং বাদী বা অন্য কেহ বিষ বা অন্য কোন কারণের উল্লেখ করিতে পারিত এবং আসল কথা এই হইতে পারে যে কেহই ইহার কারণ জানে না। কিন্তু এইরূপ হইয়াছে। এইরূপ ঘটা যদি অসম্ভব হইত, তাহা হইলে হয়ত।সনাক্ত করণের সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকিত, কিন্তু পুংকোষ সিফিলিস, জিহ্বার উপরের দাগ এবং অজ্ঞাত অন্য কোন কারণের কথা বিবেচনা করিলে কেন যে ইহা ঘটা সম্ভব নয় তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। এবিষয়ে জল্পনা কল্পনা করা নিরর্থক—যেরূপ জল্পনা কল্পনা বাদীর বা তাহার অপর লোকে করিয়াছে—কিন্তু অসম্ভবের কথা বলিতে গেলে উভয় পক্ষে কোন বিশেষজ্ঞ একথা বলে নাই যে ইহা অর্জ্জন করা যায় না কিংবা বাকযন্ত্রের যথেষ্টরূপ দোষ না থাকিলে যথা চেরা জিহ্বা না হইলে ইহা ইহা হইতে পারে না। অসম্ভব সম্বন্ধে বলিতে গেলে ডাক্তার টমাসের —Reading in abnormal Psychology নামক পুস্তকে ৩৯১—৩৯৪ পৃষ্ঠায় বাক বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে একটি অধ্যায় আছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উহাও লিখিত আছে যে মহাযুদ্ধের সময় যে সকল সৈন্যগণের স্নায়বিক অবসাদ ঘটে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের বাক্‌দোষ রোগ দেখা গিয়াছিল—ইহা ছিল এক রকম তোতলান এবং ইহার নাম হইয়াছিল 'যুদ্ধ-তোতলান'। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকদিনের মধ্যেই—কথা বলিবার অবস্থা ভাল হইয়া গিয়াছিল কিন্তু শতকরা ৫টী ক্ষেত্রে এই অবস্থা বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং এখনও এমন অনেক সমর প্রত্যাগত সৈনিক আছে যাহাদের বাক্য-কথনে বিশৃঙ্খলা রহিয়া গিয়াছে। (পৃষ্ঠা ৩৯২)

পারিত না এবং তিনি এক্ষণে যে সাক্ষাৎকারের কথা বলিতেছেন ঐ সকল সাক্ষাৎকার পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং পূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হয় না এইরূপ হিন্দী কথাও বলা হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই—এই মন্তব্যের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বাদীকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কিন্তু প্রমাণ করা যায় পূর্ব্বে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিত না।"

১৯।৫।২১ তারিখে জয়দেবপুরে থানার রেজেষ্টারীতে নিম্নলিখিত বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

বৈকাল ৪টা। গতরাত্রে এক প্রবল ঝড় হইয়াছিল এবং তাহাতে বাসার বেড়া উড়িয়া গিয়াছে। এই এলাকায় কোন শান্তিভঙ্গের বা—সংক্রামক রোগের খবর নাই। লোকে দলে দলে সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিতেছে এবং বলিতেছে যে 'সে কুমার' এবং সন্ন্যাসী—লোকের সহিত বাংলায় কথা বলিতেছে। টাকায় ৬ সের চাউল বিক্রয় হইতেছে। সাবইনস্‌পেক্টার আবদুল করিম (প্রঃ সঃ ১০২৮) তাহার কার্য্যকালে রেজেষ্টারীতে এই বিষয়টা লিখিয়াছে এবং—বাদীর সাক্ষ্যরূপে তাহাকে ডাকা হইয়াছিল, সে এখনও চাকরী করিতেলিছ—এবং সে কুমারের হইয়া কারও সঙ্গে একটী কথাও বেশী বলিত না। ১৯১১ সালের ৫ই মে তারিখে যখন রায়সাহেব মোহিনী বাবু, সাবরেজেষ্টার গৌরাঙ্গ বাবু ও অপর কতিপয় ব্যক্তি বাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছিল, এবং তাহাকে পরীক্ষা করিতেছিল এবং যে দিন তাহাকে পাখী মারা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় এবং যাহার বিবরণ মোহিনী বাবুর ৬।৫।২১ তারিখে রিপোর্টে দেখায়, সেই দিন আব্দুল হামিদ লিখিয়াছে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই আব্দুল হামিদই মানহানির মোকদ্দমায় তাহার বিবৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে ও বলিতেছে:—

এই মোকদ্দমায় বাদীকে আমি দেখিয়াছি। আমি তাহাকে কথা বলিতে শুনিয়াছি। সে হিন্দীটানে বাংলা বলেন, আমি যখন ১৯২১ সালের মে মাসে জয়দেবপুরের অফিসার ছিলাম যেন আমি তাহাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়াছি। আমি তাহার কথায় আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া ছিলাম। উহা অস্পষ্ট ছিল। জেরার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে বাঙ্গলায় বাঙালীর পক্ষে বাংলা কথা বলা আশ্চর্য্য কিনা। সে বলিয়াছিল, না। ডাইরীতে উহা লিপিবদ্ধ—করার কি প্রয়োজন হইয়াছিল প্রশ্ন করায় সে বলিয়াছিল—বোধ হয় সম্ভবতঃ সে পূর্ব্বে বাংলা বলিতেছিল না। সে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে

বার্ত্তা হইল। সন্ন্যাসীর সহিত আমার বাংলায় কথাবার্ত্তা হইল। এই সাক্ষাৎকার প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া চলিয়াছিল। বাদী কি ধরণের বাংলা বলিয়াছিল প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন—"প্রশ্ন বা উত্তরের ঠিক কথাগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে কিন্তু আমার এই ঠিক ধারণা আছে যে সন্ন্যাসী হিন্দী ও বাংলা মিলাইয়া বলিয়াছিল এবং বাংলা ভাষা পশ্চিমের লোকের বাংলা ভাষার মত দোষ হইতেছে।" আর একটী প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে "ব্যাকরণ ও শব্দরূপগুলি সবই ভুল ছিল।" সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে বাদী বাংলা বলিতেছেন এবং উহা যদি হিন্দীটানে ভাওয়ালী বাংলা হয় কিংবা আগন্তুক পূর্ব্ববঙ্গের লোক নহে বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্মানার্থ হিন্দী-টানে কলিকাতার বাংলা বলিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ১১ বৎসর পরে স্মৃতি যে ধারণা জন্মাইয়া তুলিয়াছিল মনের মধ্যে সেই ধারণা রাখিবার পক্ষে উহা যথেষ্ট ছিল।

এই ক্ষেত্রে মিঃ চন্দ্রকে হিন্দী বলিতে হয় নাই, এবং বাদী যখন পরে কলিকাতায় মিঃ ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন যে তিনি বাংলা বলিতে পারে নাই, বলা হইয়াছে এই সাক্ষী তাহার উত্তরস্বরূপ। ইহা ১৯২৪ সালে জুলাই মাসের কাছাকাছি কলিকাতায় হইয়াছিল। সে তাহার সহিত কয়েক দিন পর সাক্ষাৎ করিয়াছিল। তিনি কথাগুলি লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দীটান লক্ষ্য করেন নাই। বাদী এই বৎসর বড় রাণীর (২ নং প্রতিবাদীর) সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। বাদী কি ভাষার কথা বলিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। ১৯২৫ সালে বাদী রেভিনিউ বোর্ডে তদানীন্তন মেম্বার মিঃ জে, এন, গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করে। মিঃ জে, এন, গুপ্ত দুই এক মিনিট তাহার সহিত কথা বলেন, তাহার 'খোট্টা টান' লক্ষ্য করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে একজন পশ্চিমদেশীয় প্রতারক, সে আদৌ বাংলা বলিতে পারিতনা, এবং সে যে বাংলা কথাগুলি ব্যবহার করিত সেগুলি 'খোট্টা-টান' বিশিষ্ট ছিল। অন্য কথাগুলি কোন ভাষায় ছিল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতে পারেন নাই, "আমরা কয়েকটী কথামাত্র বলিয়াছিলাম।"

কথা হইতেছে হিন্দীটানে কথা বলিলে তাহার বিরুদ্ধে লোকের মনে যে বিরুদ্ধভাবের সঞ্চার হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। প্রতিবাদীগণ উহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তাহাকে চিনিত তাহাদের পক্ষে উহা কিছুই করিতে পারে নাই, এবং সম্পূর্ণ অনুসন্ধানের পর সনাক্ত

উহা জানেনা এবং ব্লড অর্থটা তাহার মনে ছিল। ইহার ব্যাখ্যা অতি সুস্পষ্ট, এইরূপ বলা হইতেছিল সে ব্যঞ্জন শব্দের অর্থ পাঞ্জাবীতে 'বেগুণ' যতক্ষণ না মিঃ রামরতন সিবা (বাঃ সাঃ ৯৩৯) নামক এক পাঞ্জাবী এই ব্যাপারের সমাধা করিলেন।

শ্লেষোক্তির দ্বারা উপস্থাপিত না হইলেও ব্যঞ্জনবর্ণ শব্দটীর অজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিতে গেলে এমন লোক আছে যে a. b. d. ইত্যাদি জানে অথচ consonent কথাটি জানেনা।

অধিকাংশ অজ্ঞতাই এইরূপ কথার উপর মারপ্যাচের দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট ভাগ আমি এক নিরক্ষর বাঙালীর পক্ষে আশা করিতে পারিতাম। এই দ্বর্থক বাক্যগুলির আলোচনা করিতে গেলে অনর্থক সময় নষ্ট হইবে এবং আমি বিশ্বাস করি না যে প্রতিবাদীপক্ষ বাদীকে বাস্তবিকই যদি হিন্দুস্থানী বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে উহা সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিবার অন্য কোন উপায় ভাবিতে পারিত না। হিন্দুস্থানীর মনের এরূপ একটা গঠন আছে যে যাহা বাংলা দেশে বহুকাল বাস করিলেও নষ্ট হয় না, বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না, এবং উহা বাহির করিয়া ফেলিতেও খুব বেশী কৌশলেরও প্রয়োজন হয় না, বিশেষতঃ যখন ইহা জানা ছিল যে বাদী নিরক্ষর এবং জড়বুদ্ধি সম্পন্ন।

ভাষা জ্ঞানের পরীক্ষা।

এ বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র চেষ্টা করা হইয়াছিল, বাদীকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, এক লাইন বাংলা গান বলিতে পারে কিনা এবং সে ছেলে-ভুলানো ছড়া জানিত কিনা। সে বলিয়াছিল যে সে পারে না এবং ছেলে ভুলানো ছড়া সম্বন্ধে বলিয়াছিল: "স্ত্রীলোকেরা এইগুলি আবৃত্তি করে।" আমি পূর্ব্বেই এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছি—এই গানের বিষয়ে। শিক্ষিত না হইলে এবং শিক্ষিতের মত মানসিক নিঃসঙ্গতা অর্জ্জন না করিলে খুব অল্প বাঙালীই অনেক লোকের মধ্যে স্বীকার করিবে যে সে গান জানে, গান করার কথাত দূরে থাকুক, আর ছেলে ভুলানো ছড়ার সম্বন্ধে নিরক্ষর লোকে ভাবিবে যে স্ত্রীলোকেরই উহা আবৃত্তি করে এবং পুরুষের উহা জানা উচিত নহে। মিষ্টার চৌধুরী অবশ্য একটী ছড়া আবৃত্তি করিয়া গ্রাম্য হওয়ার ভয় ঘুচাইয়া" দিয়াছিলেন

বৈশিষ্ট সমুদয়ের মিথ্যা কাহিনী সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, ১৯২১ সালের ৪ঠা মে তারিখে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে কুমারের ভগিনী ও ভাগিনেয়গণ সৎ বিশ্বাস প্রণোদিত হইয়াই সাধুকে কুমার বলিয়া চিনিয়াছিল। তিনি যদি নিজে উহা বিশ্বাস না করিতেন,তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না,কারণ তিনি নিজে সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি অপর সকলের ন্যায় কুমারকেও চিনিতেন। মিষ্টার নিডহামের রিপোর্ট বাস্তবিক পক্ষে তদ্বিরকারকের রিপোর্ট। সুতরাং উহাও একজন বিশ্বাসকারীর রিপোর্ট। আমি যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি এবং যে সকল বিচার বিবেচনার উল্লেখ করিয়াছি সেই সকল হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে হঠাৎ কোন ষড়যন্ত্র করা হয় নাই, এবং হঠাৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ভাষা ভাষী এক পাঞ্জাবীকে কুমারের ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য সহসা গ্রহণ করা হয় নাই—সেদিন যে ঘটনার উদয় হইয়াছিল তাহার কারণ দর্শাইতে প্রতিবাদী পক্ষের এই একটীমাত্র মতবাদ রহিয়াছে। যদিও উহা দ্বারা কিছুই পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন হয় না, যদি না ধরিয়া লওয়া হয় যে ভগিনীরও তাঁহার সহিত পরগণার বাকী সকলেরই মাথা খারাপ হইয়াছিল।
ভগিনী যদি সৎবুদ্ধি প্রণোদিতা হয় অন্যান্য সাক্ষীগণও সেরূপ সৎবুদ্ধি প্রণোদিত ছিল।

আর একটী পরীক্ষা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জনক। সেটী হইতেছে দেহের সনাক্ত। শরীরের বিশেষরূপ বৈশিষ্ট্য দ্বারা এবং অন্য সাধারণ শারীরিক চিহ্নদ্বারা এই সনাক্ত সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদিত এবং গণিতের মত নিশ্চয়তার সহিত প্রমাণিত হইয়াছে এবং উহা কাহারও বিশ্বাস—প্রবণতার উপর নির্ভর করে না। এই বৈশিষ্ট্য ও চিহ্নগুলি সমগ্র ভাবে কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্ট হইতে পারে না এবং এই চিহ্ন সকলের মধ্যে অর্দ্ধেক গুলি না থাকিলেও চাকা চাকা দাগযুক্ত পাদ এবং বাম পায়ের বাহির গোড়ালির উপরি ভাগে অসমান পদাচিহ্ন এবং তৎসঙ্গ শারীরিক বৈশিষ্ট্য সমুদয় অনুরূপ নিশ্চয়তার সহিত সনাক্ত বজায় রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কোন ব্যক্তি বিশেষ কতকগুলি অর্জ্জিত বিশেষ গুণের সমবায় এবং এই গুণাবলী—একত্রে আর ও কোথা দেখা যায় না এবং এই গুলিই সেই ব্যক্তি বিশেষকে অনন্য সাধারণ করে।

বাদীর মনেও এমন কিছু নাই যাহা এই সিদ্ধান্ত বিচলিত করিতে পারে। প্রতিবাদী পক্ষ উহার যতটা—সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে সাহস

ছিল, সেই সময়েও সত্যেন্দ্রবাবু জানিতেন যে, বাদীর মৃত্যু সম্বন্ধে একাগ্র হওয়াই এই বিপদে তাঁহার রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মিঃ লেথব্রিজের নিকট উপস্থিত হন, তাঁহাকে বলেন যে মৃত্যু-প্রমাণ সুরক্ষিত করিতে হইবে। সেই মৃত্যু-সংক্রান্ত যে এফিডেভিটগুলি তিনি স্বয়ং সংরক্ষিত করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। তিনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং যান, এবং সে সকল সাক্ষী দ্বিধাহীন চিত্তে শবদাহে যোগদান করিয়াছিল সেই সকল সাক্ষীকে একটা চুক্তিতে আটকাইয়া রাখিতে যান। তিনি মিঃ লিণ্ডসের নিকট মৃত্যুর এফিডেভিট ও শবদাহের প্রমাণ প্রেরণের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং মিঃ লিণ্ডসে কুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া এই ঘোষণা প্রচারিত করিয়াছিলেন যে বাদী একটা ভণ্ড প্রতারক। অতি অল্প সংখ্যক প্রতারকই এই ঘোষণার পর টিকিয়া থাকিতে পারিত। ইহাতে বহু সাক্ষীর মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, এই মামলা ১ম প্রতিবাদিনী ও বাদীর মধ্যে নহে, পরন্তু বাদীও সরকারের মধ্যে। বাদীর এই ঘোষণা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও টিকিয়া রহিলেন। তিনি এখানে সেখানে গিয়া লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে ও যাহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন, এবং পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদন্তের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মিথ্যা আশ্বাস প্রদান

তাঁহার এই প্রার্থনায় মিঃ লিণ্ডসে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং ১৯২৩ অব্দে মিঃ কে, সি, দে, তাঁহাকে মিথ্যা আশা দিয়াছিলেন।

মিঃ চৌধুরী এই সকল ঘটনা উপেক্ষা করিয়াই মামলা রুজু করিবার বিলম্বের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এই ইঙ্গিত করিতেছিলেন, যে অভিনয়ের প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে বাদীর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। বাদী তাঁহার স্বরূপতা ঘোষণা করিবার ২৪ দিন পরে মিঃ লিণ্ডসের নিকট তদন্তের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভগিনী আরও পূর্ব্বে তদন্তের জন্য আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখনও বাদী সকল সময়ের মতই মুখোমুখী হইয়া জেরার জবাব দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তদন্ত যে করা হইবে না; একথা তাহাকে কোনদিন বলা হয় নাই, এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহাকে বলা হয় নাই যে আদালত খোলা আছে (অর্থাৎ সে দরকার বোধ করিলে

উপস্থাপিত বা প্রমাণিত হইল না, কেবল ৬নং জুতা উপস্থাপিত হইয়াছিল, এবং উহাও কৌঁশুলীর পরামর্শ মত করেন নাই। ভুলক্রমে করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বাদীর জুতা বড় বলিয়া বোধ হইতেছে। বাদীর এজাহার শেষ হইলে এই অদ্ভুত অনুযোগ করা হইয়াছিল যে তিনি ইহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন যে বাদী লেখাপড়া জানেন কিন্তু এই লোকটীর যে অক্ষর পরিচয় আছে এই কঠিন ব্যাপার এক্ষণে প্রমাণ করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে কুমার যতটা লেখাপড়া জানিতেন, তাহা অপেক্ষা খুব বেশী করিয়া ধরা হইয়াছিল, অথচ এতদিনের অনভ্যাসে—তিনি যে অনেক ভুলিয়া যাইবেন তাহা ধরাই হয় নাই। সর্ব্বশেষে জেরার সময় স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে বাদীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, বলা হইয়াছিল যে এ বিষয়ে বাদীকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আমি পূর্ব্বেই ইহার আলোচনা করিয়াছি এবং এখন ইহা বলিবার প্রয়োজন হইবেনা যে তাহাকে কোনরূপ প্রশ্ন না করার প্রাচীন পদ্ধতি আদালতে পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছিল। এই অজুহাত ১৯২১ সালে বলা চলিত না, এবং একথা কেহ কখনও শোনে নাই যে, শেখান পড়ান হইয়াছে বলিয়া সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। ফাঁদকে ভয় করিবার কিছুই ছিলনা, ভয় করিবার ছিল সত্য ঘটনাকে। জটিল মামলার ঘটনাবলী আপনাআপনি বাহির হইয়া পড়িয়া কল্পনাকে ধ্বংস করে, এরূপ ক্ষেত্রে কাহারও মাথা খারাপ না হইলে সে কখনও সত্যকে অধিক দিন বাধা দিতে পারেনা, এবং প্রতিবাদী-পক্ষের কোন এক ব্যক্তির মাথা খারাপ হইয়াছিল এবং সম্ভাব্য বিষয়ের সমস্ত জ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। বাদীর চেহারা সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ ছিল। বিদেশী ভাষায় কথা বলিত। ভগ্নিগণ তাহাকে যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন, এক ভগ্নী তাহার দিকে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। কেহই তাহাকে যোগাড় করিয়া আনে নাই, কিন্তু সে দৈবক্রমে ঔষধ দিতে আসিয়াছিল এবং নিজেকে কুমার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল; এবং পরিবারবর্গ অবাক হইয়া তাহাকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে কোনরূপে প্রস্তুত না হইয়া ভগিনী হঠাৎ প্রকাশ্যে তাহাকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কালেক্টারের নিকট তাহাকে সম্পত্তি দাবী করিতে পাঠালেন। এই ধরণের একটীর পর একটী ঘটনা খাড়া করা হইল, যাহা কিছুদিন টিঁকিল এবং সত্য ঘটনার চাপে পড়িয়া নষ্ট হইল। সুবিস্তৃত এবং সযত্নে গঠিত ঘটনাগুলি—যাহা দার্জ্জিলিংয়ে অসুখ ও মৃত্যুসংক্রান্ত ঘটনা কেবল যে অন্তর্নিহিত মিথ্যার লক্ষণ দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে

করিয়াছেন। এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করার কোন প্রয়োজনও নাই কারণ ইস্যু কেবলমাত্র এই পরিচ্ছেদের উপর ধার্য্য হইয়াছে।

আমি এই রায় দিতেছি যে এই পরিচ্ছেদ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে তিনি যে প্রতিবিধান দাবী করিয়াছেন তাহার স্বত্ব ব্যাহত হয় না।

৯ নং ইস্যু

আর্জ্জি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে এই ইস্যু আদৌ উঠে না।

ইস্যু নং ২

তামাদি সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য যে বাদী যে সম্পত্তির দাবী করিতেছেন তাহাতে—১৯০৯ সালের ৮ই মে পর্য্যন্ত তাঁহার দখল ছিল, এবং সেই সময়ে তিনি অন্তর্হিত হন এবং মৃত বলিয়া অনুমিত হন। তাঁহার পত্নী তাঁহার বিধবা-রূপে ঐ সম্পত্তি উত্তরাধিকারিণী হন এবং হিন্দু আইন মতে বিধবার সম্পত্তি রূপে উহার অধিকারিনী হন। প্রতিবাদী পক্ষে এই তর্ক উপস্থিত করা হইয়াছেন ১৯০৯ সালের মে মাস হইতে উহা তাহার দখলে আছে, এবং—মামলা দায়েরের পূর্ব্বে ১২ বৎসরের উর্দ্ধ কাল উহা তাহার দখলে আছে সুতরাং এই মামলা তামাদি দোষে বারিত। বাদীর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি হিন্দু বিধবারূপে সম্পত্তি দখল করিতেছিলেন এবং ১৯২১ অব্দের ৪ঠা মে তারিখে অর্থাৎ যেদিন বাদী নিজেকে কুমার বলিয়া ঘোষণা করিলেন কিন্তু সম্পত্তি হইতে বেদখল হিলেন সেই দিন তাঁহার অধিকারে বাধা উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঐ তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে মামলা রুজু হইয়াছিল। এইরূপ ধারণা করা অসম্ভব হইবে যে বাদীর নিরুদ্দেশ অবস্থায় মেজরাণী এই সমস্ত কাল ধরিয়া বাদীকে মৃত জানিয়া তাহার বিরুদ্ধ স্বত্বে বিধবার সম্পত্তি, দখল করিয়া আসিতেছিলেন। বিধবার সম্পত্তি বলিয়া উহাতে তাঁহার যে দাবী ছিল তাহার অধিক কোন কথা তিনি বলেন নাই—এবং যখনই তিনি উহা স্বীকার করিতেছেন যখন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে তিনি স্বামীর হইয়া উহা দখল করিতেছেন—ইহাই হিন্দু আইনের সিদ্ধান্ত, এবং এই সিদ্ধান্তে আরও বলিতেছে যে তাঁহার মৃত্যুর পর, স্বামী যদি তৎপূর্ব্বেই মরিয়া থাকেন তাহা হইলে স্বামীর উত্তরাধিকারিগণ উত্তরাধিকারী হইবে (শরৎ চন্দ্র বনাম চারুশীলা দাসী ৫৫ থানিঃ—৯১৮) স্বামীর হইয়াই তিনি দখল করিতেছেন সুতরাং—সম্পত্তির প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার বিরুদ্ধ স্বত্ব একটা অসম্ভব ধারণা। ইহা হইতে

এই ডিক্রী ২নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা করা হইল এবং অবশিষ্ট,—প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দেওয়া হইল।

বাদী প্রতিযোগী প্রতিবাদিগণের নিকট—হইতে—বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা সুদ সহ তাঁহার খরচা পাইবেন।

(স্বাক্ষর) পান্নালাল বসু

এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট জজ

ঢাকা

২৪শে আগষ্ট ১৯৩৬।

বলিয়া অভিহিত করে উক্ত সম্পত্তি বাদী এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের জমিদারী পত্তনী ইত্যাদি স্বত্ব দখলিয় হইতেছে। বাদীর পিতা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় উক্ত সম্পত্তির মালিক দখিলকার থাকা কালে তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার দেহান্তে বন্দোবস্ত জন্য তাঁহার পত্নী রাণী বিলাসমণি দেবীকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া যান। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং রাণী বিলাসমণি দেবীর মৃত্যুর পর স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বাদী, কুমার রনেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায় উক্ত ভাওয়াল রাজ্যে সম অংশে স্বত্ববান ও দখিলকার হয়েন। দাবীকৃত সম্পত্তির পরিচয় নিম্ন তপসিলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

২। গত ১৯০৯ সনের এপ্রিল মাসে বাদী তাঁহার পত্নী ১নং বিবাদিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী এবং কতিপয় আত্মীয় ও কর্ম্মচারী সহযোগে দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন। দার্জ্জিলিংএ অবস্থান কালে বাদীর শরীর অসুস্থ হইলে,বাদীর চিকিৎসাকালে বিষপ্রয়োগ নিবন্ধন বাদী অচেতন হইলে বাদীকে মৃত জ্ঞানে ১৯০৯ সালের ৮ই মে তারিখে রাত্রিকালে বাদীকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। শ্মশানে বাদীর দেহ-বাহকগণ শ্মশানে বাদীর দেহ রাখিয়া স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া বাদীর মৃত দেহ শ্মশানে না পাইয়া ফিরিয়া চলিয়া যান। ঐ ঘটনার কয়েক দিবস পরে বাদী চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি আপনাকে নাগাসন্ন্যাসীগণের মধ্যে দেখিতে পান। এবং সন্ন্যাসীগণের সেবা ও শুশ্রূষাতে বাদী কতক পরিমাণে সুস্থ হইলে উক্ত সন্ন্যাসীগণের সহিত বাস করিতে থাকেন। তৎকালে বিষ প্রয়োগের ফলে বাদীর পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসীদের সহিত তাহাদের দলভুক্তের ন্যায় দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। বাদী তৎকালে সন্ন্যাসী জীবনে অভ্যস্ত হইয়া সংসারে বিতৃষ্ণ হন।

৩। বাদীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া বাদী মৃত উল্লেখে বাদীর পত্নী ১নং বিবাদিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী হিন্দু আইনের বিধান অনুসারে বাদীর অংশের জমীদারী প্রভৃতি ভোগ করিতে থাকেন। বাদী বর্ণনা করেন যে ১নং বিবাদিনার উক্তরূপ ভোগ বাদীর জীবিত কালে বাদীর দখল বলিয়া পরিগণিত হইবে। পরে ১৯১১ সালের ২৮এ এপ্রিল তারিখে ১নং বিবাদিনীকে disqualified proprietress declare করিয়া বাদীর অংশ Court of Wards charge লয়েন।

করিয়া আপত্তি দাখিল করেন। উক্ত মোকদ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাদীর এজাহার গ্রহণকালে বাদী অন্যান্য বর্ণনার সহিত নিম্নলিখিত বর্ণনা করেন :—

আমি ভাওয়াল সম্পত্তি দাবী করি, ইহা আমার পৈত্রিক। বাঙ্গলা ১৩১৬ সালে আমি জয়দেবপুর পরিত্যাগ করি এবং ১২ বৎসর পরে জয়দেবপুরে ফিরিয়া আসি, কাশিমপুর জমিদার মহাশয় আমাকে সেখানে লইয়া গিয়েছিলেন। সেখান হইতে যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক জয়দেবপুরে আনীত হই, তিনি আমার জন্য হস্তী পাঠাইয়াছিলেন। আমি প্রজাদিগের নিকট হইতে নজরআনা পাইয়াছিলাম, তাহারা স্বেচ্ছায় এখনকার মত আমাকে তাহা দিয়াছিল। এমন কি এখনও আমি নজরআনা পাই। তাহারা নিজে আসিয়া নজরআনা দেয়, তাহারা ঢাকাতে আসিয়া আমাকে ইহা দেয়। সকল প্রজাই আমাকে কুমার বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা স্বেচ্ছায় আমাকে খাজনা দিতেছে, আমি খাজনা দিবার জন্য তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করি না।

আমি পৈত্রিক সম্পত্তির দাবী ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি। খাজানা গ্রহণ বন্ধ করিতেও ইচ্ছুক নহি। আমি এখন সম্পত্তি জয়দেবপুরে যাইতে ইচ্ছা করি।

৮। পরে Magistrate সাহেব উক্ত ১৪৪ ধারার হুকুম ৩০।৫।২৯ তারিখে খারিজ করেন। উক্ত হুকুম হওয়ার পরে বিবাদী পক্ষের লোকের উক্তি ও ব্যবহারে বাদী আশঙ্কা করেন যে তিনি জয়দেবপুর গেলে তাঁহার উক্তস্থানে যাওয়ার পক্ষে বিঘ্ন ও বাধা জন্মাইবে। এবং উক্ত কারণে বাদী ইচ্ছাসত্বেও জয়দেবপুর যাইতে আশঙ্কা করেন।

৯। পরে বাদী আপন অংশের সম্পত্তির খাজনা প্রজাগণ বাদীর পত্নী বিভাবতী দেবীকে বা তাহার পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজারকে না দেয় এই মর্ম্মে ভাওয়াল প্রজাসাধারণের মধ্যে গত ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নোটিশ প্রচার করেন।

উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রজাসাধারণ বাদীর অংশের দেয় খাজানা বাদীকে পূর্ব্বানুরূপ দিতেছেন এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজারকে ঐ অংশের খাজনা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন; এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। এমতে বাদী আপন অংশের জমিদারী প্রভৃতিতে সম্পূর্ণরূপে দখিলকার আছেন। কিন্তু ১নং বিবাদিনীর তরফ হইতে মহালের স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ করিয়া বাদীকে খাজনা না দেওয়ার জন্য নানারূপ

বাধা ও বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাদীর খাজানা আদায়ের বিঘ্ন প্রদান করিবার জন্য এবং প্রজাদের নির্য্যাতন ও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য ১নং বিবাদিনী এবং তাহার পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার অবৈধভাবে প্রতিবাদিগণের তরফ বেআইনী এবং illegal certificate জারী করিতেছেন। আনন্দকুমারী দেবীর তরফ হইতে যে certificate জারী হইতেছে তাহা আদৌ without Jurisdiction ultravires এবং invalid. উক্ত সার্টিফিকেট জারী সত্ত্বেও বাদীর দখল অক্ষুণ্ণ আছে।

১০। বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে ১নং বিবাদিনী এক্ষণে অন্যায় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এবং অসৎ লোকের পরামর্শে বাদীকে না দেখা সত্ত্বেও বাদীর identity অস্বীকার করিতেছেন, এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডের সাহায্যে বাদীর দখল এবং বাদীর বসতবাটী জয়দেবপুরে বাওয়ার সম্বন্ধে বিঘ্ন ও বাধা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ২নং বিবাদিনী স্বয়ং বাদীর identity স্বীকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে থাকায় তাঁহার ম্যানেজার মিঃ E. Bignold বাদীর identity অস্বীকার করিয়া বাদীর খাজানা আদায়ে বাধা প্রদানের চেষ্টা করায় তাহাকে পক্ষভুক্ত করা গেল। ৩নং প্রতিবাদী বাদীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের পোষ্য পুত্র উল্লেখে কতক কতক সম্পত্তি দখল করিতেছে, এবং ৪নং বিবাদিনী শ্রীমতি আনন্দকুমারী দেবী উক্ত কুমার রবীন্দ্র নারায়ণের বিধবা পত্নী হইতেছেন। বাদী উক্ত পোষ্য পুত্র বৈধ কি অবৈধ জানেন না। কিন্তু বাদী অবগত হইয়াছেন, যে উক্ত পোষ্যপুত্র রদ সম্বন্ধে ঢাকার ২য় সবজজ আদালতে ১৯২৫ সালের ২১৬নং মোকদ্দমা দায়ের আছে। উক্ত পোষ্য পুত্র বৈধ কি অবৈধ বর্ত্তমান মোকদ্দমায় তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ৩।৪নং বিবাদী বাদীর identity প্রকাশ্যভাবে deny না করিলেও তাহাদের কার্য্যকলাপে এবং তাহাদের পক্ষীয় লোক ও কর্ম্মচারীগণের উক্তি ও ব্যবহারে তাহারাও বাদীর identity ভাবতঃ অস্বীকার করা অনুমিত হইতেছে বলিয়া তাহাদের সাক্ষাতে বর্ত্তমান মোকদ্দমা বিচার হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় তাহাদিগকে পক্ষ করা গেল। তাহারা বাদীর দাবীর বিরুদ্ধে উত্তরদাতা হইলে তাহাদিগকেও মুল বিবাদীগণের বাদী তাহাদের বিরুদ্ধেও আরজির প্রার্থিত প্রতিকার দাবী করিতেছেন।

১১। বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে উপরোক্ত অবস্থাধীনে বাদীর statu-

২। বাদীর দাবী তামাদিতে বারিত বটে।

৩। আরজির বর্ণিত ও দাবীকৃত সম্পত্তির বাজার মূল্য অন্যূন মঃ ৫০০০০০০৲ লক্ষ টাকা বটে। উক্ত মূল্যের উপর advalorem কোর্ট-ফি না দিয়া এবং দাবীকৃত সম্পত্তিতে স্বত্বসাব্যস্থ পূর্ব্বক দখলের প্রার্থনা না করিয়া বাদীর বর্ত্তমান দাবী আইনতঃ চলিতে পারে না বিধায়, বর্ত্তমান আর্জিমূলে বাদী কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহে।

৪। আর্জিতে বাদীর যে নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এই বিবাদিনী তৎসমস্ত দৃঢ়রূপে অস্বীকার করিতেছে। বাদী রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র রমেন্দ্রনারায়ণ রায় থাকা কি হওয়ার উক্তি সমূলে মিথ্যা, বানোয়টী ও ফেরেবী বটে।

৫। ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার ৺রমেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় তাঁহার স্ত্রী অর্থাৎ ১নং বিবাদিনীর সহিত স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন জন্য দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। তৎব্যতীত আর্জির ২য় দফায় বর্ণিত অন্য সমস্ত উক্তি সম্পূর্ণ অলিক বটে। এই বিবাদিনী বিশ্বাস করে যে উক্ত দ্বিতীয় কুমার দার্জ্জিলিং যাইবার অল্পকাল পরে তথায় পরলোক গমন করিয়াছিলেন। এই বিবাদিনী অবগত আছে যে তদনন্তর জয়দেবপুর রাজবাটীতে তাহার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম যথাশাস্ত্র নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

৬। আর্জির ৪র্থ দফায় বাদী তাহাকে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বলিয়া অনেকে চিনিতে পারা প্রভৃতি যে সমস্ত উক্তি করিয়াছে, তাহা বিবাদিনী সত্য বলিয়া স্বীকার করে না, এবং তৎসমস্ত মিথ্যা বলিয়া এই বিবাদিনী বিশ্বাস করে। ভাওয়ালের প্রজাবর্গ কিম্বা ভাওয়াল রাজ পরিবারের আত্মীয় স্বজন কেহই বাদীকে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। পরন্তু এই বিবাদিনী অবগত হইয়াছে ও বিশ্বাস করে, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের মাতা ৺স্বর্গীয়া রাণী সত্যভামা দেবী এবং তাহার মধ্যমা কন্যা শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যিনি উক্ত কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের বয়োজ্যেষ্ঠা বটেন, তাঁহারা উভয়ে বাদী যে সময়ে জয়দেবপুরে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই সময়ে তাহাকে টাকা দিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন এবং বাদী তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। বাদী দুরভিসন্ধি মূলে উক্ত ঘটনা গোপন করিয়াছে। বাদীকে অধুনা কোনও ব্যক্তি তাহাকে মধ্যম কুমার বলিয়া চিনিতে পারা বা তদ্রূপ ব্যবহার করা প্রভৃতি যে উক্তি করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৭। আজির ৫ম ৬ষ্ঠ ও ৭ম দফার বর্ণিত বিবরণ সমূহ কিছুই এই বিবাদিনী অবগত নহে এবং ৮ম ও ৯ম দফার বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করে না।

৮। আজির ১০ম দফার উক্তি সমূলে মিথ্যা ও অভিসন্ধি মূলক। ১নং বিবাদিনী বাদীকে দেখিয়াছেন এবং তাহাকে প্রতারক বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বাদী যে উক্তি করিয়াছে যে, ২নং বিবাদিনী বাদীর identity স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা এই বিবাদিনী অবগত নহে ও সত্য বলিয়া স্বীকার করে না, ৩নং বিবাদিকে এই বিবাদিনী ও তাহার দত্তক গ্রহণ করা সম্বন্ধে এবং অন্যান্য কারণে এই বিবাদিনী ও তাহার দত্তক পুত্র ৩নং বিবাদীর সহিত ২নং বিবাদিনী শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবীর মনোবাদ হইয়াছিল এবং তদবধি এই বিবাদিনী ও ৩নং বিবাদীর সহিত উক্ত ২নং বিবাদিনী নানারূপ বিরোধ ও শত্রুতা চলিয়া আসিতেছে। এই বিবাদিনী অনুমান করে যে ৩নং বিবাদীর ভাবি স্বত্ত্ব নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত ২নং বিবাদিনী বাদীর সহিত যোগদান করা সম্ভব। বাদী এই বিবাদিনী সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছে তদুত্তরে এই বিবাদিনী নিবেদন করে যে এই বিবাদিনী বাদীকে দেখিয়াছে এবং বাদী যে ভাওয়ালের কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় নহে তাহার সম্পূর্ণ প্রতীত হইয়াছে।

৯। ভাওয়াল রাজ ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের শাসনাধীনে হওয়ার পূর্বে ভাওয়াল রাজ পরিবারের অনেক আত্মীয়-স্বজন এবং দূরসম্পর্কিত ও নিসম্পর্কিত লোক ভাওয়াল ষ্টেট হইতে অন্ন বস্ত্র ও নানারূপ সাহায্য পাইয়া আসিতেছিল কিন্তু ভাওয়াল রাজ ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের শাসনাধীন হওয়ার পর হইতে ঐ সমস্ত আত্মীয় স্বজন ও নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ পূর্বের ন্যায় সাহায্য পাওয়া হইতে বঞ্চিত হয়, এবং তদ্দরুণ উক্ত ব্যক্তিবর্গ নিতান্ত মনক্ষুন্ন হয়। বিশেষতঃ ১৯১১ সনে ১নং বিবাদিনীর ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডে যাওয়ার পর হইতে ১নং বিবাদিনী নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কলিকাতা বাস করিতেছেন এবং পূর্বোক্ত আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় লোক, গুরু পুরোহিতকে তিথি পার্ব্বণ ও ক্রিয়া কলাপে নিমন্ত্রণ এবং লৌকিকতা কিংবা কোনরূপ সাহায্যাদি না করায় ১নং প্রতিবাদিনী তাহাদের কতকের বিশেষ বিরাগভাজন হইয়াছেন।

১০। স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর তদীয় কন্যা ৺কৃপাময়ী দেবীকে কতক সম্পত্তি জীবনস্বত্ত্ব-মূলক মিয়াদে বন্দোবস্ত দিয়াছিলেন। গত ১৩২৭ সনে বৈশাখ মাসে নিঃসন্তান অবস্থায় কৃপাময়ী দেবী পরলোক গমন করায় উক্ত বন্দোবস্তের পাট্টা সমূহের সর্ত্তানুসারে ভাওয়াল রাজ ষ্টেটের

(৭) সম্পত্তির সমুদয় তালিকা কিংবা বিবরণ না দেওয়ায় মোকদ্দমা অচল।

(৮) মোকদ্দামায় সম্পত্তির নিয়মিত মূল্যে নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং ঠিকভাবে কোর্ট ফি দেওয়া হয় নাই।

(৯) বাদী ঢাকা জয়দেবপুরের কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং বাদী কিংবা তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ ভাওয়াল ষ্টেট কখনও দখল করিতেন বা তাহাদের যেমন আছে তেমনি থাকা উক্তিগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা, এবং প্রতিবাদীরা ইহা অস্বীকার করেন। বাদীর ভাওয়াল ষ্টেটের অংশের কোন ভোগ দখলে থাকা বা কোন অংশ ছিল, উক্তিসকল সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি বাঙ্গালী নহেন এবং ভাওয়াল রাজপরিবার-বর্গের একজন পরিবার হওয়া দূরের কথা কখনও বাঙ্গলা ভাষা জানিতেন না এবং এমন কি এখনও পর্য্যন্ত ১৯২১ সন হইতে প্রায় দশ বৎসর কঠোর চেষ্টায় এবং ষড়যন্ত্র-পরায়ণ ব্যক্তিগণ, যাহারা তাহাদের স্বার্থের জন্য এই মোকদ্দমা তাহার নামে গঠিত করিয়া দাখিল করিয়াছে, তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন কিংবা এমনকি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেও একজন বাঙ্গালীর মত ভাষায় সঠিক কথা কহিতে পারেন না।

(১০) বাদীর নিজের স্বীকারোক্তিতে সন্ন্যাসী হইয়াছে এবং আইন-চক্ষে সংসার পরিহার করায় তাঁহার কথিত স্বত্বগুলি হারাইয়াছেন এবং মোকদ্দমায় প্রতিকারের কোন দাবী করিতে উপযুক্ত নহে।

(১১) আর্জির ২ দফায় উল্লিখিত উক্তিগুলি ঈর্ষ্যামূলক ও মিথ্যা এবং বাদীও তাহা জানেন।

(১২) ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার কিছুকাল যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিলেন এবং ১৯০৯ সালে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ গিয়াছিলেন। সেখানে কয়েকটী সুদক্ষ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছিলেন এবং হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিং যাইতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তৎপরে গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং শীঘ্রই তাঁহার পত্নী ১নং প্রতিবাদী, তাঁহার শ্যালক সত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৃহ চিকিৎসক ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত, তাহার স্বকীয় সেক্রেটারী ৺মুকুন্দলাল গুপ্ত, তাঁহার কর্ম্মচারী এবং আত্মীয়? বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কয়েকটী অন্যান্য কর্ম্মচারী, ভৃত্যগণ সমবিভ্যাহারে দার্জ্জিলিং গমন করেন। পিত্তশূলের তীব্র আক্রমণে কিছুকাল ভুগিতেছিলেন

বলিয় তথাকার সিভিল সার্জ্জন্ কর্ণেল যে, টি, ক্যালভার্ট আই, এম্, এস্ এবং তখনকার নিবারণচন্দ্র রায় বাহাদুর সহকারী সারজেনের চিকিৎসাধীনে রহিলেন। চিকিৎসায় কোন ফল হইল না এবং তাঁহার জীবন-রক্ষার্থে পত্নীর, আত্মীয় বন্ধুদের এবং চিকিৎসকাদির বহু চেষ্টা সত্বেও ১৯০৯ সালে ৮ই মে তারিখে প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

১৩। পূর্ব্ব কথিত ১৯০৯ সালে ৮ই মে তারিখে কুমার মরিয়া গেলেন এবং ১০ই মে Calvert জয়দেবপুরে ২নং বিবাদীনীর স্বামী বড় কুমার রণেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের নিকট শোক প্রকাশক নিম্নলিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন :—

প্রিয় কুমার—

আপনার ভ্রাতার মৃত্যুতে আপনার যে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আমার মনে হয় পীড়ার স্বভাব সম্বন্ধে এবং ইহার সম্ভবপর আরোগ্যের উপর তাহার দৃঢ় বিশ্বাসই তাহার পক্ষে এই হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। প্রাতঃকালে আমাকে ডাকা হইলে তিনি নিজেকে এত ভাল অনুভব করিয়াছিলেন যে মৎ-নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার বন্ধুদের এবং নিজের সেক্রেটারির আন্তরিক প্রার্থনা এবং তাড়না (যাহারা তাহার অবস্থা সম্বন্ধে খুব ব্যগ্র ছিল) তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দিনের শেষ ভাগে তাঁহার যন্ত্রণা আবার খুব তীব্র ভাবে দেখা দিল। তাঁহার সেক্রেটারির আগ্রহান্বিত চেষ্টায় যখন তিনি আমাকে আমার পরিভ্রমণ অবস্থায় দেখিলেন তখনই এই ঘটনার প্রতি আমার প্রথম মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। এই সময় মধ্যম কুমার সেক্রেটারি এবং বন্ধুবর্গের পরামর্শ শুনিলেন এবং আমাকে নিয়মিত চিকিৎসা করিতে আদেশ দিলেন। ইনজেকসন্ করায় যন্ত্রণা থামিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সময়ের মধ্যে তাহার অবস্থা এমন একটা আতঙ্কজনক হইল যে সকলে ইহাতে অভিভূত হইল এবং সকলের চেষ্টা সত্ত্বেও হিমাঙ্গ হইয়া মরিয়া গেলেন। আপনার ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিতে সম্ভবপর সমস্তই করা হইয়াছিল এবং তাহার কাছে যাহারা ছিল তাহাদের সকলেরই মনোযোগ এবং যত্ন পাইয়াছিল। তাঁহার নিকটে আপনারা থাকিলে তাহা সুখের হইত কিন্তু তাহার পীড়ায় আধিক্য এত হঠাৎ হইল এবং এত শীঘ্র শেষ হইল যে ইহা ভাবা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আপনার বিশ্বাস ভাজন—

স্বাক্ষর— যে, টি, ক্যালভার্ট"

তাহাদের খরচাদি বহন করিত। এই সুবিধা আর রহিল না, ফলে তাহারা সকলে নিজেরা পৃথক হইল, এবং ভগ্নীরা প্রত্যেকে মৃত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের উইল অনুসারে মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তি পাইত। কিছু কিছু দয়ার দান যাহা রাজা এবং কুমারদের আমলে গরীব এবং দূরবর্ত্তী আত্মীয়দিগকে এবং রাজ পরিবারবর্গের অধীনগণকে দেওয়া হইত, তাহা অনেক স্থলে বন্ধ করা হইয়াছিল, এবং অন্যান্যস্থলে অনেক পরিমাণে কমান হইয়াছিল। সংক্ষেপে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পরিত্যক্ত উইল কিংবা ট্রাষ্টডিডে যে সমুদয় বৃত্তি, দান, এবং অন্যান্য সুবিধা লিখিত ছিলনা, তাহা কোর্ট অফ্ ওয়ার্ড্‌সকে বন্ধ করিতে হইয়াছিল, ফলে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ড্‌স্ কর্তৃক সম্পত্তির পরিচালনা কুমারদের অধীন ব্যক্তিগণের এবং আত্মীয়গণের নিকট অতি অপ্রিয় হইল।

তাহা ছাড়া কুমারদের প্রশস্ত জমিদারী সম্পত্তি, পৈত্রিক বসত বাটীর অংশ এবং অন্যান্য ঘটনা লইয়া কুমারদের ভগ্নীগণের এবং কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডের মধ্যে অনেক মোকদ্দমা এবং গোলমাল হইল।

১৮। ষ্টেটের ভাওয়াল পরগণার মধ্যে অনেক বড় বড় বন আছে এবং কোর্ট অফ্ ওয়ার্ড্‌স্ ইহার ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ষ্টেটের প্রজারা কেবলমাত্র সামান্য মূল্য দিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আদৌ না দিয়া ঐ বন হইতে স্বাধীনভাবে গাছ কাঁটিত এবং যদিও এইরূপ ভাবে গাছ কাটিবার প্রজাদিগের কোনও প্রথামূলক বা অন্য কোন স্বত্ব ছিল না, ভাওয়াল ষ্টেট্ এইরূপ অবৈধ কর্ত্তনে প্রায়ই হস্তক্ষেপ করিত না। তাহারা কেবলমাত্র জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য নিজেদের দরকারের জন্য গাছ কাটিত না, কিন্তু অনেকে অবৈধভাবে গাছ কাটিয়া এবং কাঠ বিক্রয় করিয়া জীবিকা চালাইত।

কোর্ট অব ওয়ার্ড ভার গ্রহণ করিয়া বনস্থিতি এবং রক্ষণের জন্য একটী বনবিভাগ স্থাপন করিল, ফলে কেবলমাত্র অবৈধ কর্ত্তন এবং বিক্রয় বন্ধ হইল যে তাহা নহে, কিন্তু প্রজাদিগের এমন কি তাহাদের জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য এক্ষণে উক্ত বন হইতে

গুলি নামঞ্জুর হইতেছে সে অনেকগুলি সার্টিফিকেট্ সম্পূর্ণ তুচ্ছ এবং বিরক্তিকর কারণে নষ্ট হইবার জন্য অনেকগুলি মোকদ্দমা দাখিল করাইয়াছে। ইহা মিথ্যা যে ৪নং প্রতিবাদীর পক্ষে সার্টিফিকেট্গুলি অন্যান্য আদালত বহির্ভূত বা আর্জির নবম দফায় কথিত এলাকা বহির্ভূত। ৩নং প্রতিবাদী ৪নং এর ন্যায়তঃ পোষ্যপুত্র হইতেছে।

২৬। ১নং প্রতিবাদী তাহার স্বামীর মৃত্যু সময়ে উপস্থিত ছিল এবং এমন কি কলিকাতায় তাহাকে অনেকবার দেখার পর ও সে মনে ধারণা করে এবং নিঃসন্দেহ মনে করিতে পারে যে বাদী একজন শঠ প্রতারক।

২৭। প্রতিবাদীগণ ২নং প্রতিবাদী স্বীকৃত ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারের সহিত বাদীর স্বরূপত্ব অস্বীকার করে এবং প্রতিবাদিগণ আরও বলে যে ২নং প্রতিবাদী যে স্বীকার হইয়াছে, তাহা অনুনয়াদির ফলে বা বাদী এবং তাহার পৃষ্ঠপোষকদের চাপে বা ভুলক্রমে। অধিকন্তু অন্যান্য প্রতিবাদীগণের প্রতি তাহার মনের ভাব ধরিলে এবং মৃত কুমারদের ভগ্নীগণের কোর্ট অফ ওয়ার্ডস সহিত মোকদ্দমাতে সে যে কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত ভাবে অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে বাদীর স্বরূপত্ব সম্বন্ধে তাহার কোন উক্তি বা স্বীকার মূল্যবান নহে এবং বাদীর মোকদ্দমায় সাপক্ষে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

২৮। বাদী স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা পাইতে পারে না এবং নিষেধাজ্ঞায় কোন ঘটনা প্রকাশ পায় নাই।

২৯। এই লিখিত জবাবে যাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইল না, তাহা বিবাদী অস্বীকার করিল বিবেচিত হইবে।

৩০। বাদী আর্জির প্রার্থিত কোন প্রতীকার পাইতে স্বত্ববান নহে এবং মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজ হইবে।

আই, ঈ, বিগ্নেল্ড ম্যানেজার ভাওয়াল ষ্টেট ব্রতদ্বারা স্বীকার করেন যে লিখিত জবাবের তৃতীয় দফায় উক্তিগুলি আমার জ্ঞানতঃ সত্য এবং ৯, ১১,

হইতে ২২ এবং ২৪ হইতে ২৭ দফায় বিবরণ আমার জ্ঞান, বিশ্বাস এবং অনুসন্ধান মতে সত্য এবং অবশিষ্টগুলি কোর্টের নিকট সবিনয়ে নিবেদন এবং জয়দেবপুরে আমার কার্য্যালয়ে অদ্য ১৯৩০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি ইহাতে দস্তখত করিলাম।

স্বাক্ষর—ঈ, বীগ্‌নল্‌

করেন, তবে পরীক্ষা করাইতে পারেন। তৃতীয় চিহ্নটা **যদি থেকে থাকে, তবে তাহা স্বামী ছাড়া অন্য কাহারও জানা সম্ভব নয়।**

প্র—আপনি আপনার আইনজীবিদের এরকম খবর পাঠিয়েছিলেন যে, আপনি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন ? উ—আমি যে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলাম এই খবর জানিয়েছিলাম। প্র—আপনি যে আজ সাক্ষ্য দিলেন, তাতে একথা বুঝা যায় নাকি যে, আপনি সত্যি সত্যি অন্তঃসত্ত্বা হন নাই ? উ—আমি ত সে রকম বলি নাই। প্র—তখন আপনাদের পরিবারে খুব আনন্দের ব্যাপার হয়েছিল না কি ? উ—একথার কি আমাকে উত্তর দিতে হবে ? প্র—হাঁ, নিশ্চয়ই ! এই প্রশ্ন করতে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। উ—আমার শাশুড়ী এই বিষয়ে বলাবলি করিতেন। খুব আনন্দের সহিত তিনি অনেকের সঙ্গে বলাবলি করিতেন যে, "**মেজ বউর ছেলে হবে।**" প্র—এই তিনমাস ঋতু বন্ধ থাকাতে আপনার কোন চিহ্ন হয়েছিল কি ? উ—না।

প্র—আপনি কাল বলেছেন যে, শনিবার ১২—১২॥ টাতে কুমারের পিত্তশূল বেদনা বাড়ে এবং বাহ্যের সঙ্গে রক্ত ও আম দেখা যায়—এই বাহ্যটা কি পাতলা হয়েছিল ? উঃ—পাতলা বাহ্য হয়েছিল, কিন্তু কমোডে বাহ্য করার সেটা ভাল বুঝা যায় নাই। প্রঃ—মুকুন্দ গুণ জয়দেবপুর একটা টেলিগ্রাম করেছিল যে, "কুমারের ঘন ঘন জলের মত দাস্ত হচ্ছে—সঙ্গে রক্তও পড়ছে।" একথা কি সে ঠিক লিখেছিল ? উ—পাতলা দাস্তই হয়েছিল, তবে জলের মত পাতলা নয়। প্র—আপনি কি বলতে চান যে, যখন মুকুন্দ গুণ সেই টেলিগ্রাম পাঠায়, তখন তাহার মিথ্যা খবর পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল ? উঃ—না ? প্র—এই মোকদ্দমায় দার্জ্জিলিংএর এক ঘটনা সম্বন্ধে রাণী শুনেছেন ? উঃ—কতকটা শুনেছি। আমি ভাইয়ের সঙ্গে নিশ্চয় সে বিষয়ে আলাপ করেছি। আমার উকীল বাবুদের সঙ্গে সেই বিষয়ে মুখোমুখি কথা হয় নাই। বাদীর জবানবন্দী খবরের কাগজে পড়েছি, আনন্দবাজার ও বসুমতীতে পড়েছি। অন্যান্য সাক্ষীর জবানবন্দীও পত্রিকাতে পড়েছি।

বাদীর বক্তব্য

প্রঃ—এটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, বাদীর Case হচ্ছে যে, তাকে দার্জ্জিলিংএ আর্সেনিক খাইয়েছিল। উঃ—হাঁ। প্র—আর আপনি বলেন যে মেজকুমারের পিত্তশূলের বেদনা খুব বেড়েছিল তারপর এবং হাইপোডার্মিক

ইঞ্জেকশনে তাঁহার বেদনা কমেছিল? কুমার যে অপ্রত্যাশিতভাবে মারা যাবেন আপনারা বা ডাক্তাররা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা? তবে আমার কাছে মৃত্যু অপ্রত্যাশিত ছিল। আমি আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই যে, ক্যালভার্ট সাহেবের নিকট কুমারের মৃত্যু অপ্রত্যাশিত ছিল। ক্যালভার্ট সাহেব বিলাতে যাহা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা শুনিয়াছি। আমাকে সে সাক্ষ্য আগাগোড়া পড়িয়া শোনান হয় নাই', তবে আমি মোটামুটি শুনেছি। প্রঃ—তাহলে আজ আপনি আমার নিকট প্রথম শুনেছেন যে, কুমারের মৃত্যু ক্যালভার্ট সাহেবের নিকট অপ্রত্যাশিত ছিল? উ—না, একথা আগেই শুনেছি।

প্র—আমি এই কথা বলছি না, যে আপনি নিজ হাতে কুমারকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন, বা আপনি বিষ প্রয়োগের কথা জানিতেন,—এই কথাও আমি বলছি না; সুতরাং আমার কথাগুলি ধীরভাবে বিবেচনা করে উত্তর দিবেন। আপনি কি জানেন যে পিত্তশূলের ব্যথাতে মৃত্যু খুব বিরল? একথা আপনি মেনে নিতে রাজি আছেন কি? উ—হ্যাঁ। প্র—আপনি বলেছেন যে, তাঁকে হাইপোডামিক ইঞ্জেকসন দেওয়া হল, তাতে ব্যথা কমিল; কিন্তু তিনি ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়লেন—আর এটাও দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণতঃ যখন এই অসুখে মৃত্যু হয় না, তখন এই ইঞ্জেকসনের পরে কুমারের উচিত ছিল সেরে উঠা; তাহলে এটা বেশ বোঝা যায় না কি যে পিত্তশূল ছাড়া কুমারের এমন একটা কিছু ঘটেছিল, যাতে ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরেও কুমারের মৃত্যু ঘটে? উঃ—একথা আমি কি করে বলব—আমি কি ডাক্তার? প্রঃ—আপনি এটা শুনেছেন কি যে, যদি জলের মত পাতলা বাহ্য থাকে এবং তার মধ্যে যদি রক্ত ও আম থাকে তাহলে সেটা আর্সেনিকের একটা লক্ষণ? উঃ—না, একথা আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। প্র—আপনাকে বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কেহ বলে নাই যে, পিত্তশূলের ব্যথাতে কোন রোগী জলের মত রক্ত ও আম বাহ্য করে না? উঃ—না। প্রঃ—আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, পিত্তশূলে রক্ত বাহ্য হয় না এবং আর্সেনিক খাওয়ালে রক্ত বাহ্য হয়। এখন আপনি বুঝতে পাচ্ছেন কিনা যে আপনার স্বামীকে আর্সেনিক খাওয়ান হয়েছিল? উঃ—কি করে বুঝব? প্রঃ—আপনি নিজে কখনও তলিয়ে ভেবে দেখেছেন কি যে সত্যই আপনার স্বামীকে আর্সেনিক খাওয়ান হইয়াছিল? উঃ—আমি জানি ওটা মিথ্যা কথা। প্র—আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল না। (কোর্ট এই প্রশ্ন অগ্রাহ্য করেন) উ—আমার ভাববার দরকার হয় নাই, কারণ ঐ কথা মিথ্যা।

বলে থাকেন যে, এই ব্যবস্থাপত্রের কথা সাহেব জানিতেন :না তবে যে কথা আপনি মেনে নিতে রাজি আছেন? উ—হাঁ। প্র—এটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছেন যে কুমারের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর একটা কারণ ছিল? উ—অসুখই কারণ। প্র—এখন আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের লক্ষণ শুনে বুঝতে পাচ্ছেন কি যে কুমারের তথাকথিত মৃত্যু আর্সেনিকে হইয়াছিল? উ—কি করে বলব? আপনার কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি। প্র—আপনি জানেন যে ক্যালভার্ট সাহেব যখন একই ঘটনা সম্পর্কে অন্য কথা বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কোনও গলদ ছিল? (কোর্ট এই প্রশ্ন অগ্রাহ্য করেন) প্র—একথা যদি কেহ বলে, "কুমার ইঞ্জেকসন লইলেন না—সে জন্য তঁহার মৃত্যু হইল, তাহলে সে কথা কি সত্য হবে? উ—না। প্র—আপনি কি জানেন ক্যালভার্ট সাহেব লিণ্ডসে সাহেবকে চিঠি লিখেছেন যে, কুমার কিছুতেই ইঞ্জেকসন গ্রহণ করে নাই উ—না, শুনি নাই। এই সময় মিঃ চৌধুরী এই সব প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাহাতে মিঃ চাটার্জ্জি বলেন, আমার মনে হয় যে, কর্নেল ক্যালভার্ট বলেছেন, এই সব বলে আপনি সাক্ষীকে ভয় দেখাতে চান।" তাহাতে মিঃ চাটার্জ্জি বলেন, "কোনও ভদ্র মহিলাকে আমি ভয় দেখাতে চাই না, আমার বক্তব্য এই যে, এই মহিলার নিকট হইতে সমস্ত কথা গোপন রাখা হইয়াছে।" প্র—আপনার দাদা কি কুমারের মৃত্যু শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন? উ—কান্নাকাটি করেছিলেন বৈকি। প্র—ক্যালভার্ট সাহেবের নিকট হইতে ১০ই মে সোমবার ১৯০৯ তারিখে একটা প্রশংসাপত্র যোগাড় করা হইয়াছিল—সে বিষয়ে আপনি কিছু জানেন? উ—কিসের প্রশংসাপত্র? প্র—সেদিন কালভার্ট সাহেবের নিকট হইতে একখানা চিঠি নেওয়া হইয়াছিলেন—তা আপনি জানেন কি? উ—আমি কিছুই জানি না। আমি আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই যে বাড়ীর কাহারও দ্বারা ক্যালভার্ট সাহেবের নিকট হইতে একখানা চিঠি নেওয়া হইয়াছিল। প্র—আপনি বোর্ড অব রেভিনিউর নিকটে ক্যালভার্ট সাহেবের ১৯০৯ সালের ১০ই মে তারিখে চিঠি পেয়েছিলেন সে বিষয়ে কিছু মনে পড়ে? উ—কি বিষয় বলুন। প্র—ক্যালভার্ট সাহেবের কোন চিঠি পেয়েছিলেন? উ—আমার মনে পড়ে. ক্যালভার্ট সাহেব বড় কুমারের নিকট যে চিঠি লিখেছিলেন, বাদী আসার পর তাহার একখানা নকল বোর্ড অব রেভেনিউ সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়া দেই। সেই

চিঠিখানার ভাষা ও বৃত্তান্ত দেখে মনে হচ্ছে যে আমার বোনের লেখা। প্রভা ছোটকালে আমাকে চিঠি লিখত। প্র—আমি ধরে নিতে পারি যে, ওই চিঠিখানা প্রভাবতীর লেখা? উ—তার লেখা কিনা বুঝতে পাচ্ছি না। কথাগুলো দেখে মনে হয় যে, তার এই চিঠি। লেখাটা তার হাতের কিনা বুঝতে পাচ্ছি না। কোর্ট—তা হ'লে ছোটবেলার লেখা কি বলেছেন? উ—তাহার ছোট বয়সের লেখা ভুলে গিয়েছি। প্র—তাহ'লে ইহা প্রভার চিঠি, তাহা আপনি অস্বীকার কর্ত্তে পারেন না? উ—না। প্র—আপনি সাক্ষ্য দিতে আসার সময় এই স্থির করে এসেছেন কি যে কাহারও চিঠি আপনি প্রমাণ করবেন না? (হাস্য) উ—না। ওই চিঠি প্রভার হইতেও পারে, প্র—কোন কারণে আপনার সন্দেহ হয় যে ইহা প্রভার চিঠি নয়? উ—তাহার ছোটকালের লেখা ভুলিয়া গিয়াছি। আপনি দিচ্ছেন বলে এই চিঠির সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে—তাহা বলিতেছি না। প্র—ঐ চিঠিতে এমন কোন লেখা আছে, যাতে আপনার সন্দেহ হয় যে, ইহা তার লেখা নয়? উ—না। প্র—তাহ'লে আপনার কথা হইল যে তার ছেলে বেলার চিঠি আপনার মনে নাই? ইহা ছাড়া এই চিঠি সন্দেহ করিবার আপনার আর কোন কারণ নাই? উ—না। আমি আমার মার লেখা চিনি। প্র—আপনি বিবাহের পরে যে সব চিঠি লিখেছেন তাতে এমন ভাব দেখিয়াছিলেন না কি যে, "আপনি যেন অশোক বনে সীতা?" উ—মনে নাই। প্র—আপনার মনে পড়ে কিনা যে আপনার নাম লিখতেন নিজেকে "হতভাগিনী" বলে। উ—মনে পড়ে না। প্র—(একখানা চিঠি দেখাইয়া) দেখুনত এখানা আপনার মার চিঠি কি না? উ—চিঠিখানা মার লেখা বলেই মনে হচ্ছে। (চিঠিখানা আদালতে দাখিল করা হয়)। এই চিঠি আমার নিকট লেখা। শ্বশুর বাড়ী এসে আমি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু বই টই পড়িতাম। প্র—আপনার মনে আছে যে আপনার ছোট বোন প্রভা আপনাকে লিখেছিলেন, "তুমি ইংরেজী পড়া ছেড়ো না।" উ—হতে পারে—লিখতে পারে। প্র—(একখানা চিঠি দেখাইয়া) দেখুন এই চিঠিখানা প্রভাবতী দেবী আপনাকে লিখেছিলেন কি না? উ—চিঠিখানা তারই—তবে কার লেখা বলিতে পাচ্ছি না। প্র—এই দেখুন আর একখানা চিঠি। উ—চিঠিখানা তারই তবে কার লেখা বলতে পাচ্ছি না। প্র—আপনার বিবাহের পরে যখন জয়দেবপুর এলেন, তখন আপনার কি একথা মনে হয়েছিল যে আপনি। একটা "অকাট মূর্খ ও দুশ্চরিত্র লোকের হাতে পড়েছেন?—"

না? ধর্ম্মসাক্ষী করে বলুন দেখি যে, আপনার স্বামী আপনার সঙ্গে শুতেন না বলে আপনার ভাষণ দুঃখ হয়েছিল কি? উ—না, দুঃখ হয় নাই। প্র—আপনার কি মনে পড়ে যে, আপনার মা বলে পাঠিয়েছিলেন যে, "বিভা যেন চেষ্টা করে যাতে তার স্বামী তার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়?" উ—পাঠাতে পারেন। অতঃপর মিঃ চাটার্জ্জি বলেন, আচ্ছা এখন আমরা পুনঃ দার্জ্জিলিং ফিরে যাই। প্র—আপনি বলেন যে, শনিবার বেলা ১২টা ১২৷৷টার সময় কুমারের রক্ত বাহ্য আরম্ভ হয়; এতদিন পরে আপনার সে কথা কি একেবারে ঠিক মনে আছে। উ—সময়ের একটু আধটু এদিক ওদিক হতে পারে। আশু ডাক্তারকে আমার বিবাহের পর থেকেই জানি। তাকে সৎলোক বলেই জানি। প্র—আশুবাবু মানহানি মোকদ্দমায় বলেছেন যে, শনিবার সকাল ৮টা হইতে কুমারের বাহ্য আরম্ভ হয়। উ—বলেছিলেন কি না মনে নাই। প্র—তিনি য'দ বলে থাকেন, তা'হলে অসৎ অভিপ্রায়ে সে কথা বলেছেন আপনি তাহা বলিতে পারেন না? উ—তিনি ভুল বলিতে পারেন! আমার ভুল হতে পারে না এই কথা বলি না। তবে আমার যতদূর মনে হয় এটা আমার ঠিক মনেই আছে। কুমারের যখন দার্জ্জিলিংএ অসুখ হয়, তখন আশুবাবু যথাসাধ্য করেছিলেন; প্র—আপনি যখন এই মোকদ্দমায় জবাব দাখিল করেছিলেন তাহাতে ডাক্তার ক্যালভার্টের দেওয়া মৃত্যুর সার্টিফিকেট উদ্ধৃত করে দিয়েছিলেন, তাহা জানেন কি? উ—জানি না। প্রঃ—ডাক্তার ক্যালভার্ট যে মৃত্যু সার্টিফিকেটে কি লিখেছিলেন, তাহা মনে আছে কি? উঃ—আমাকে পড়ে শুনানো হয়েছিল মোটামুটি শুনেছি তবে উহার ভাবটা মনে নাই। পড়ে শোনান হয় নাই—তবে ডাক্তার ক্যালভার্ট সার্টিফিকেট দিয়েছে, তাহা শুনে ছিলুম। আমি আজ পর্যান্ত জানি না যে ক্যালভার্ট সাহেব সেই সার্টিফিকেট লিখেছিলেন যে, শনিবার দিন সকাল বেলা কুমারের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হয় ক্যালভার্ট সাহেবের নিকট হইতে সার্টিফিকেট কে আনিয়াছিল তাহা আমি জানি। আমার ষ্টেটের ম্যানেজারকে দিয়ে আনান হইয়াছিল। —শিশির বাবু বা হরিমোহন চন্দকে দিয়ে আনান হয়েছিল কি না জানি না। প্রঃ—আপনি এটা জানেন কি যে বড কুমারের যত চিঠি পত্র দলিল ছিল সব কোর্ট অব ওয়ার্ডস বড় রাণীকে পাঠিয়ে দিয়েছিল? উঃ—শুনেছি। প্র—বাদী যে জয়দেবপুরে আত্মপরিচয় দিয়ে ছিলেন তাহা শুনেছেন? উঃ—শুনেছি। বাদীর আসার কথা শুনেছি।

সে যদি বড় কুমারের ন্যায় একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত তবে আমি যে কত সুখী হইতাম তাহা বলিতে পারি না।

শুনিলাম তোমার ভাসুর ঠাকুরও তাহাকে এখানে আনিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আসিবে না বলিয়াই যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আসা দূরে থাক্ সেতো কখন আমাদের একখানা পত্রও লিখিতে চায় না। ছেলে-মানুষ বলিয়া এতদিন তাহার ব্যবহারে আমি কিছু মনে করি নাই; কিন্তু ক্রমশঃই বড় হইতেছে সুতরাং তাহার এই প্রকার ব্যবহার আমার পক্ষে অতীব মর্ম্মান্তিক হয়। আমি আর কতদিনই বা বাঁচিয়া থাকিব? যে কয়দিন বাঁচিয়া আছি মধ্যে মধ্যে যদি তোমাদিগকে দেখিতে না পাই তবে আমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। অবশ্য আজ আমি নিতান্ত বিপন্ন বলিয়া তাহার উপযুক্ত আদর যত্ন করা দূরে থাক আপন কর্ত্তব্যই সম্পন্ন করিতে পারি না. তাই সেও আমাদের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না। কিন্তু এখানে কে তাহার আদর করিবে? সে তাহার উপযুক্ত আদর যত্ন করিতে পারিত সে ত বহুদিন চলিয়া গিয়াছে।

বিভারাণী! এই সকল কষ্ট দুঃখ একত্রে আমার স্মৃতিতে আসিয়া আমাকে বড়ই ব্যাকুল করিয়া তুলে। তুমি ছেলে মানুষ তাই বুঝিতে পার না যে, কি ভয়ানক মনোকষ্টই আমি সহ্য করিতেছি।

তোমার তাবিজ যদি পাঠাইতে হয় তবে তোমার হাতের মাপ ও টাকা পাঠাইয়া দিও। সোনার চেনে গাঁথা হইলে বোধ হয় ৬০০৲ টাকারও অধিক লাগিবে। কারণ ২৩৷২৪ ভরি সোনার কম চেনে গাঁথা হইবে না। যাহা হউক হাতের মাপ পাইলে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা সকলেই ভাল আছি, তোমাদের কুশল লিখিয়া সুখী করিবে।

তোমার "মা"

(২)

Ex 293 (4)

উত্তরপাড়া, ৬ই কার্ত্তিক।

বিভু ধন!

গতকল্য তোমার একখানি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তোমার দাদার একটা টেলিগ্রাম পাইয়াছিলাম তাহাতেই জানিলাম, সে শিলং রওনা হইয়াছে।

অসহায় বালককে সুবুদ্ধি দিবার সৎপরামর্শ দিবারও কেহ নাই। সুতরাং তাহাদের জন্য আমি বড় কাতর আছি। বতীর বিবাহের এখনও কিছু ঠিক হয় নাই যেখানে ভাল পাত্র দেখিয়া আমরা পছন্দ করি সেইখানেই বতী বরের সহিত মাথায় সমান হইতেছে। সুতরাং ইহার বিবাহ হইতেছে না। কিন্তু ইহার বিবাহের জন্য আমি বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি কারণ আমি যদি মরিয়া যাই তাহা হইলে এখানে থাকা বতীর পক্ষে কত কষ্টকর হইবে তাহা বোধ হয় তুমিও বুঝিতে পারিতেছ। ইহার অদৃষ্টে বোধ হয় অনেক কষ্ট আছে নতুবা আমরা সকল চেষ্টা ভাসিয়া যাইতেছে কেন? তোমার দাদাকে জয়দেবপুর যাইতে লিখিয়াছ কিন্তু আমার অসুখের জন্য ২।৩ বার জয়দেবপুর যাওয়ায় তাহার কিছুই পড়া হয় নাই। তাহার পরীক্ষার সময় নিকটে আসিয়াছে, সুতরাং তাহাকে এ সময় পাঠাইতে পারিলাম না। অতএব তুমি কিছু মনে করিবে না। আমি যদি মরিয়া যাই তবে তোমার দাদার সহিতই কেবল তোমার সম্বন্ধ থাকিবে। রমেন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। তাহার মুখখানি দেখিলে যে আমি কত শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করি তাহা লিখিয়া কি জানাইব। কিন্তু সে এখন কলিকাতায় আসিবে না? তোমাদের কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। আজ আর লিখিতে পারি না। তোমার "মা"

(৩)

Ex 293 (2)

২৪শে কার্ত্তিক, উত্তরপাড়া।

মা ইন্দু! আমি ক্রমান্বয়ে তোমার ২।৩ খানি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু ঐ সময় ভ্রাতা সূর্য্যনারায়ণ অত্যন্ত পীড়িত থাকায় তাহার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, ভরসা করি এজন্য তুমি কিছু মনে করিবে না। শ্রীমতী বিভারাণীর পত্রে তোমার জর হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছি পত্রের উত্তরে তোমার শারীরিক কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। শ্রীমান রমেন্দ্রনারায়ণ বাবাজীবনের শরীর ভাল নাই, বহু দিবস হইতেই সে জর ভোগ করিতেছে, এই সময় তাহাকে কিছুদিনের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইলে ভাল হয়; নতুবা জয়দেবপুরে থাকিয়া সে কখনই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না। শুনিতে পাইতেছি তাহার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইয়া পড়িতেছে—এ সময় রোগ অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়া থাকা কখনই সুবিবেচনার কার্য্য নয়। অতএব

তুমি তোমার ঠাকুর মাতা ঠাকুরাণীকে সম্মত করিয়া তাহাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থানান্তরিত করলে—আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব, এ বয়সে যতদূর জ্ঞানলাভ করা উচিত, দুঃখের বিষয় রমেন্দ্রের সেরূপ জ্ঞান কিছু জন্মিল না। এখনও সে আপনার হিতাহিত চিন্তা করিতে শিখিল না, এই যে এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া জ্বরে কষ্ট পাইতেছে তাহারও কোন প্রতিকার করিতে চায় না। কোন বিষয়েই ত আমি তাহার বিবেকবুদ্ধি, আত্মনির্ভরতা কিছুই দেখিতে পাই না। আজিও সে বালকের ন্যায় হাসিয়া খেলিয়া শিকার লইয়া থাকে মাত্র। পিতামাতা বর্ত্তমানে এরূপ বালকের উচিত কার্য্য করিলে একদিন শোভা পাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের অবর্ত্তমানে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এরূপ ভাবে দিন কাটাইলে ভবিষ্যৎ জীবনের সার আত্ম-উন্নতি ও আত্মা নষ্ট হয়। এই সকল কারণে উহার জন্য আমি সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত আছি।

জ্যোতির্ম্ময়ী মাতা, মটর, ও অপরাপর সকলে কেমন আছে? তাহাদিগকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবে। এখানকার সমস্তই মঙ্গল—তোমাদিগের কুশল লিখিয়া সুখী করিবে।

আশীর্ব্বাদিকা—

ফুলকুমারী দেবী।

মিঃ পার্শি ব্রাউন

গত ১৩ই মার্চ্চ বুধবার রাণী বিভাবতীর জেরা স্থগিত থাকে এবং বিবাদিনী পক্ষের অন্যতম সাক্ষী মিঃ পার্শি ব্রাউনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। মিঃ পার্শি ব্রাউনের বয়স ৬৮; তিনি কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হলের তদানীন্তন সেক্রেটারী এবং কিউরেটর।

মিঃ এ, এন, চৌধুরীর প্রশ্নে সাক্ষী বলেন:—আমি লণ্ডনের সাউথ রয়েল আর্ট কলেজে চিত্র-শিল্পীদের শিক্ষা দিয়াছি। আমি উক্ত আর্ট কলেজের এসোসিয়েট। আমি বিলাতে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানেই চিত্রকলা শিক্ষা দিয়াছি। অতঃপর দুই বৎসর কাল আমি লণ্ডনের রয়েল আর্ট কলেজের চিত্র অধ্যাপক ছিলাম। আমি ভারতে ১০ বৎসর লাহোর গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলাম এবং কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ১৮ বৎসর প্রিন্সিপাল

প্র—আপনি যে কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে আপনার ষ্টেট আনিবার দরখাস্ত নেড্‌হাম সাহেবের একখানা চিঠি গাঁথিয়া দিয়াছিলেন ?

উঃ—আমার মনে নাই।

জেরার উত্তরে বলেন—দরখাস্ত দেওয়া হয়েছিল, তাহা মনে আছে। খুটী-নাটী কথা আমি বলিতে পারিব না। আমার ভাই বলিতে পারিবেন কিনা তাহা কি করিয়া বলিব ?

প্র—১৯০৯ সনের ডিসেম্বর মাসে নলগোলায় বাসার বাড়ীতে ছিলেন ?

উ—হাঁ। তখন আমার ভাই কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া-ছিলেন কিনা মনে নাই। আমার স্মৃতিশক্তি কেমন ঠিক বলিতে পারি না।

প্র—আপনি তখন চিঠিতে লিখেন যে দুই কুমারও আপনার বিপথগামী স্বামীর মত ভুলপথের চলিতেছেন ?

উ—এই কথা লিখিবার কোন কারণ দেখি না। লিখিয়াছি কিনা আমার মনে নাই।

প্র—আপনার মেয়ার সাহেবের কথা মনে পড়ে ?

উ—হাঁ।

প্র—আপনার ভাই বোন যখন কলিকাতায় গেলেন তখন রাজপরিবারের ও অফিসারদের ভিতরে কোনও কথা হয় ?

উ—জানি না।

প্র—১৯১১ অব্দে আপনার সঙ্গে ছোট কুমারের কিরূপ ভাব ছিল ? সং ভাব, না অসদ্ভাব ?

উ—অসদ্ভাব কিছু ছিল না।

প্র—১৩১৭।১৮ সনে ছোট কুমারের সঙ্গে কি সং ভাব ছিল, না অসদ্ভাব ছিল ?

উঃ—কোনও অসদ্ভাব ছিল না।

আপনি কি এই কথা জানেন ১৩১৭ সনে চৈত্রমাসে ছোট কুমার ষ্টেট্ কোর্ট অব ওয়ার্ডসে ষ্টেট দিতে চাহেন ?

উঃ—হাঁ আমার মনে আছে। আমার কলিকাতায় যাওয়ার কয়েকদিন পর শুনিয়াছিলাম।

-আপনার মনে আছে, এই ষ্টেট কোট অব ওয়ার্ডে যাওয়ার আগে এই

রকম কথা হয় যে সত্যবাবু আপনাকে দিয়া একটা জীবনস্বত্ব লিখাইয়া লইবেন ?

উ—শুনি নাই, জানিও না।

প্র—কোর্ট অব ওয়ার্ডস ষ্টেট যে লইলেন তাহার প্রধান কারণ হইতেছে ইহাই যে, তাঁহারা ভয় করিয়াছিলেন যে, সত্যবাবু আপনার অংশ হাত করিয়া লইবে ?

উ—আমি জানি না।

প্র—আপনি যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইতে আপনার অংশ পাইবার দরখাস্ত করেন তখন ছোট কুমার আপত্তি করিয়াছিলেন আপনার মনে আছে ?

উঃ—জানি না।

প্রঃ—আপনি জানেন সত্যবাবু আপনার পরিবারে একটা বিসম্বাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে ?

উঃ—না।

প্রঃ—ছোট কুমার একথা প্রমাণ করিতে রাজি ছিলেন যে, সত্যবাবু দ্বারা ষ্টেটের ক্ষতি হইয়াছে ও হইবে, একথা আপনি জানেন ?

প্র—আপনি ন্যাথেন সাহেবের চিঠিতে লিখেন যে, দিগেন বাবু ও অশ্বিনী বাবুর চাকুরী থাকা উচিত নহে ?

উ—মনে নাই।

প্র—ছোট কুমার এই কথাও কি বলেছিলেন যে, সত্যবাবু পারিবারিক ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করেন ?

উ—আমি জানি না।

প্র—যদি আপনার ভাইয়ের ডায়েরী হইতে দেখা যায় যে, রাজপরিবারে বিসম্বাদে তাহারও একটু উৎসাহ আছে, তাহা হইলেও কি আপনি বলিবেন মিথ্যা ?

উঃ—আমি কখনও তাহার উৎসাহ দেখিনি।

প্রঃ—তাহার সে রকম উৎসাহ থাকিলে আপনার অজানিত ছিল ?

উঃ—আমি এরূপ ভাব কখনও দেখি নাই।

প্র—আপনি কি এই রকম বলিতেছেন যে, কলেক্টর কমিশনার, ম্যানেজার ছোটকুমার সবাই আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন ?

উ—আমি শুনি নাই। আমি নিজেও কোন কথা বলতে চাই।”

থেকে তোলা ? উ—এটাই আসল ফটো। প্র—আমি বলি একটা গ্রুপ ফটো থেকে পৃথক করে নিয়ে এটা তোলা হয়। উ—না এটা একটা ভিন্ন ফটো। গ্রুপ ফটোও একটা ছিল, সেখানে আমি ও ইন্দুময়ী দেবী ছিলাম। কুমারই সেটা তুলেন। সে ফটো এনলার্জ্জ করা আছে। প্র—কর্ম্মচারী যামিনী বাবুকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীরা যামিনী কাকা বলে ডাকতেন, তাঁর কথা মনে আছে ? উ—যামিনী বাবুর নাম শুনেছি, তবে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীরা তাঁকে যামিনী কাকা বলতেন কিনা জানি না। প্র—এ মামলায় যামিনী চক্রবর্ত্তী সাক্ষ্য দিয়েছেন শুনেছেন ? উ—বলিতে পারি না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্যে ঐ নাম পড়েছি কিনা মনে নাই। অশ্বিনী দে নামে ফটোগ্রাফার জয়দেবপুরে থেকে নিয়ে যাই। সে আসল ফটোগ্রাফার ছিল। এনলার্জ্জ করা ফটোটা আমি জয়দেবপুরে থেকে নিয়ে যাই। আসল ফটোটা নাই। প্র—আপনি এনলার্জ্জ করা ফটোর কথা বলেছেন, (একটী এনলার্জ্জ করা ফটো দিয়া) এটা কি তাই নহে ? উ—হাঁ এটাও সেই ভাবের নকল। (ফটোখানা কোর্টে দাখিল করা হইল।) প্র—এটা দেখে বলুন, ইন্দুময়ী দেবী কি এইরূপ আপনার ডান পাশেই ছিলেন ? উ—যতদূর মনে হয় এইরূপই ছিলেন। প্র—এই ভাবেই যদি বসা হয়ে থাকে তবে হয় চেয়ারটা ঘুরিয়ে আনা হয়েছিল অথবা আপনিই অন্য দিকে গিয়ে ছিলেন। হাঁ। প্র—আপনি এটা নিশ্চয়ই শুনেছেন, আপনার মামী সরোজিনী দেবী এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন ? উ—হাঁ, তিনি বিবাহের পর, আমি জয়দেবপুর কতদিন ছিলাম সে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুধু ভুল নয়—মিথ্যা। প্র—বিয়ের আগে বিবাহের জন্য একটা শুভদিন ধার্য্য হয়েছিল ইহা ঠিক না কি ?—হাঁ। প্র—শুভদিন ধার্য্যের ব্যাপারটা মনে পড়ে কি ? উ—কে ধার্য্য করেছিল মনে নহে, তবে বিয়ের আগে শুভদিন ধার্য্য হয়ই। সেই ব্যাপারটা আমার মনে নাই। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন ধার্য্য হয় তবে ইহা আমি হলপ করে বলতে পারি না।

প্রঃ—বিবাহের তারিখটা আপনার ঠিক মনে না থাকা অস্বাভাবিক নয় কি ? উ—স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক বলিতে পারি না। বিবাহের সময় আমার ১৩ বৎসর বয়স ছিল। প্র—বিবাহের দিন ধার্য্যের সময় কি কি কথাবার্ত্তা হয় তাহা মনে আছে ? উ—না। বিবাহের আগের দিন জয়দেবপুরে এসে পৌছাই। প্রঃ—কখন আপনি উত্তরপাড়া থেকে রওনা হলেন ? উ—সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে। প্র—ভাল সময় দেখে রওনা হয়েছিলাম। প্র—যদি একথা

বলা হয় যে, আপনার বিয়ে ৮ই জ্যৈষ্ঠ হয়েছিল, তবে কি আপনি হলপ করে তাহা অস্বীকার করতে পারেন ? উ—আমি হলপ করে বলিতে পারি না, তবে আমার মনে হয় ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বিয়ে হয়। প্র—আপনার মনে হয় কি যে আপনার শ্বশুর বাড়ীতে আপনার বিয়ের দিন ঠিক করে আপনার বাড়ী খবর দেওয়া হয় ? উ—হাঁ লোক গিয়েছিল। দ্বারিকা মাষ্টার অন্যান্য লোক আশীর্ব্বাদ দিতে গিয়েছিল। বিবাহের দিন ধার্য্য করে পত্র দেওয়া হয় কি লোক গিয়েছিল অথবা দ্বারিকা মাষ্টারই দিন ধার্য্যের খবর লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা মনে নাই। মিঃ চাটার্জ্জি—আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না। উ—আমি প্রশ্ন বুঝিতেছি না। মিঃ চাটার্জ্জি—আপনি ইচ্ছা ক'রে আমার প্রশ্ন বুঝছেন না। (এই কথায় রায় বাহাদুর আপত্তি করেন)। প্র—বিবাহের পর জয়দেবপুর হতে কোন মাসে ফিরে আসেন ? উ—জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্র—জ্যৈষ্ঠ মাসের কোন অংশে হবে ? উ—যদি ৮ই তারিখ বিয়ে হয়ে থাকে, তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি ১৭ই তারিখ বিয়ে হলে শেষভাগে ফিরে গিয়াছিলাম।

প্র—আপনি কি বলতে চান, বিবাহের দিন ঠিক মনে না থাকলেও তাঁহা যে এক সপ্তাহ পরে গিয়াছিলেন, তাহা আপনি হলপ ক'রে বলতে পারেন ? উ—হাঁ। প্র—রাণী জয়মণি দেবী আপনার বিয়ের সময় জীবিত ছিলেন কি ? উ—হাঁ। প্র—একখানা (তাং ৫ই মে ১৯০২) টেলিগ্রামে দেখা যাচ্ছে, জয়দেবপুর থেকে রাণী জয়মণি দেবী উত্তর পাড়ার প্রতাপনারায়ণের নিকট টেলিগ্রাম কচ্ছেন যে ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বিবাহের দিন ধার্য্য হইল, তবে তাহা কি আপনি অস্বীকার করেন ? উ—এরূপ টেলিগ্রাম আসা অসম্ভব নয়), (টেলিগ্রাম কোর্টে দাখিল করা হইল)। প্র—রাণীদের মধ্যে জয়মণি দেবীই জ্যেষ্ঠ ছিলেন ? উ—হাঁ। প্র—তাহার পক্ষে এমন খবর পাঠান তবে অসঙ্গত অথবা অস্বাভাবিক নয় ? (একখানা চিঠি দেখাইয়া) প্রথম পাতার লেখাটী কি আপনার চেনা ? উ—না। প্র—নীচে "শ্রীবিলাসমণি দেবী' লেখা নয় কি ? উ—হতে পারে। এখানে বিবাহের দিনের কথা উল্লেখ আছে এবং ৪ঠা রাত্রে দিন ভাল ঐ সময় পাত্রী লইয়া রওনা হইবে' ইহা লিখা আছে। প্র—চিঠি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আছে ? উ—ইহা লেখা হইতে পারে। তবে আমি জানি না। প্র—ইহা প্রকৃত কিনা সে বিষয়ে আপনার কোনও সন্দেহ আছে ? উ—তাহা বলিতে পারি না। ইন্দুময়ী দেবীর লেখা

কুমারের লেখার চেয়ে পাকা লেখা। উ—আমার ত মনে হয়, সেই সেট তাঁর হাতের লেখা হতে পারে না। প্র—আপনি কি কাজ পর্য্যন্ত অবগত আছেন, প্রফেসার রাধাকুমুদ মুখার্জ্জি, প্রফেসার হীরালাল রায়, প্রফেসার স্থরেন্দ্র মৈত্র এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেরা এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তাহাদের কাছে একদিন রাত্রে দার্জ্জিলিংএ ডিনার খাওয়ার আগে খবর এসেছিল যে মেজকুমার মারা গেছেন, এ খবর রাখেন কি? উ—হঁ।। আমি কাগজে পড়েছি। প্র—আপনি কি কোর্টকে এই কথা বল্‌তে চান যে তাঁর, যে ডিনার খাওয়ার আগে মেজকুমারের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন তা মিথ্যা কথা? উ—আমি বলছি না যে তাঁরা মিথ্যা কথা বলেছেন। তারা ভুল করছেন। প্র—আমি কি আপনাকে বল্‌তে পারি যে আপনার স্বামী বিষয়ে ১৯০৮ সনে মে মাসে স্মৃতি যে রকম তাজা ছিল এখনও সেই রকম তাজা আছে? উ—হঁা, আমার তো তাই ধারণা। খুঁটিনাটি সব মনে নাও থাক্‌তে পারে। 'আপনি কি বল্‌তে পারেন ১৯০৮ সনের ৮ই মে শনিবার নিবারণ বাবুর প্রথম কখন এলেন? উ—সকাল বেলা, ৮।৯ টায়। ডাক্তার সাহেবের একটু আগেও আসতে পারেন, একটু পরেও আসতে পারেন, আমি ঠিক বল্‌তে পারবনা, তবে দুজনের একত্র দেখা হয়েছিল। প্র—আপান কি মনে করে বলতে পারেন কে আগে এসেছিল?—না। প্র—আপনি কি বলতে চান ডাক্তার সাহেব ও নিবারণ বাবুকে একসঙ্গে দেখেছেন? উ—হঁা, একসঙ্গে দেখেছিলেম। প্র—আপনি কি এই বল্‌তে চান দুজনের দেখা হওয়ার আগে একজন নীচে ছিলেন? উ—আমার মনেহয় আমি দুজনকেই একত্র দেখেছি উপরে স্বামীর ঘরে। প্র—আপনি কি ঠিক করে এই কথা বলতে পারেন? উ—এতদিনের কথা ঠিক নিশ্চিত করে বলা কঠিন তবে যতদূর মনে হয় একসঙ্গে দেখেছি। প্র—তাঁরা দুইজনই কি একসঙ্গে ঘর থেকে গিয়াছেন? উ—হঁা তারা ৫।৭।১০ মিনিট ঘরে ছিলেন। প্র—আপনি কি হলপ করে বলতে চান আধঘন্টা সেখানে ছিলেন না? উ—তারা আধ ঘন্টা ছিলেন না? প্র—তাঁরা যখন ছিলেন তখন কুমার বসা ছিলেন না শোওয়া ছিলেন? উ—খাট থেকে যদি নামিয়ে মেজের পাতা ছিল। প্র—ডাক্তাররা যখন এলেন তখন আপনি ছাড়া ঐখানে আর কেউ ছিল? উ—তাঁরা এলে আশুবাবু বা অন্য কেউ খবর দিল যে ডাক্তার সাহেব আসচেন, এ কথা শুনে আমি পাশে দাঁড়ালুম। আশুবাবু, দাদা, মুকুন্দ গুপ্ত ও চাকর বাকর

সেগুলিও এই ঘটনা অপেক্ষা কম অদ্ভুত নয়। যুদ্ধের পর এই রকম রোগীর চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। এইগুলিকে ওয়ার নিউরোসিস নামে অভিহিত করা হয়। বসন্ত বা চুলকানি প্রভৃতি রোগে যেমন কোনও রহস্য নাই ইহাতে তেমনি কোনও রহস্য নাই। উভয় পক্ষ হইতেই এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিকিৎসক আনা হইয়াছে। বাদীর পক্ষে রাঁচীর ইউরোপীয় পাগলা গারদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লেঃ কঃ হিল, আই এম, এস, এম, ডি, এম, এ, জবানবন্দী দিয়াছেন যে তিনি ত্রিশ বছর ধরিয়া মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছেন। বিবাদিপক্ষে মেজর ধুনজি ভাই আই, এম, এস, এম-বি, বি, এস, (বোম্বাই) এবং মেজর টমাস আই. এম, এস, জবানবন্দি দিয়াছেন। শেষোক্ত জনের কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি ইংলণ্ডে শেল 'শকের' অনেক রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন। মেজর ধুঞ্জি ভাই যে সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে একখানা Dr. Taylor's Reading in Abnormal Psychology and Mental Hygiene (১৯২৭ সংস্করণ)। এই বইএর কথা উভয় পক্ষই বলিয়াছেন এবং ইহাতে বিপুল পর্য্যবেক্ষকের দেখা অনেকগুলি দৃষ্টান্তের কথা আছে। এই বই হইতে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি একত্র করা দরকার দেখিনা। কারণ যে সকল বিশেষজ্ঞকে এখানে জেরা করা হইয়াছে—তাহাদের মতানৈক্য দেখা যায় না। যেখানে তাঁহারা একমত নন সেইগুলিই আমি দেখাইব। এই স্মৃতিভ্রংশদোষ বা এ্যাম্‌নেসিয়ার কোন বাহিক বা শারীরিক হানি না করিয়াও ঘটিতে পারে। •এই গোলমালটাকে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে,—ইহা অসংখ্য প্রকারের। ইহার গবেষণা পর্য্যবেক্ষণে ছাড়াইয়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। ইহার কতকগুলি ব্যাবহারিক শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। ইহার এমন কোন মূল সূত্র নাই যাহাদ্বারা পূর্ব্বে হইতেই বলা যাইতে পারে যে কোন একটি অস্বাভাবিক মানসিক বিকৃতি—কিরূপে আরম্ভ হইবে, বৃদ্ধি পাইবে ও শেষ হইবে।

তবে কতকগুলি বিভাগ মোটামুটি ভাবে দেখা যায়। এইগুলি (১) Regression or পশ্চাদ্বর্ত্তন (২) Double or multiple personality অর্থাৎ একই লোকের বিভিন্ন সময়ে দুই বা ততোধিক লোক বলিয়া ভ্রান্তি। প্রথমোক্তটির সুপরিচিত দৃষ্টান্ত রেভারেণ্ড্ 'হানা'র (Hanna) ঘটনা। একদিন সকালে উঠিয়া তিনি মনে করিলেন যে তিনি সদ্যপ্রসুত শিশু। স্নান·

কাল পাত্রের সমস্ত ধারণাই তাহার চলিয়া গেল। ইহাকে Baby state বা শৈশবাবস্থা—প্রাপ্তি বলা যাইতে পার। এই ঘটনাটি Sidis and Goodheart's Multiple Personality তে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। পুনরায় সদ্যপ্রসূত শিশু অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন, সম্পূর্ণ স্মৃতি ভ্রংশের একটি দৃষ্টান্ত। এইরূপ ঘটনা খুবই বিরল এবং বোধ হয় এই একটি দৃষ্টান্তই এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় রকমটিকে দ্বৈতীভাব বা double personality বলা যাইতে পারে। ইহাও এক রকমের পশ্চাদ্বর্ত্তনই বটে। ইহাতে মানুষ সাধারণতঃ স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করে—কিন্তু সে যে কে তাহা ভুলিয়া যায়। ইহার পরিচিত দৃষ্টান্ত রেভারেণ্ড এনসেল বোর্ণ (Rev. Ansel Bourne) এবং শেলশকের কতকগুলি রোগী। ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে আমরা দেখিতে পাই এই লোক এক সময় মনে করে যে সে একজন, আবার অন্য সময় মনে করে সে আর একজন। কিন্তু এই যে কল্পিত দুইজন ইহাদের কেহই কাহাকে চিনেনা; জেমসের Principle of psychologyতে কেলিডা লিওলিনের ঘটনা ডাঃ প্রেথের গ্রন্থে মিস্ রোকাম্পএর ঘটনা এই রকম ব্যাপার। এই সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিলেও মেজর টমাসের অভিমত এই যে বাদীর ব্যাপারটা তাঁহার নিজের বর্ণনা অনুসারে double personalityর ব্যাপার—অর্থাৎ তিনি অন্য অন্য ব্যাপারে স্বাভাবিকই ছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তিনি কে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। Rev. Ansel Bourne একদিন হঠাৎ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, এবং দুই মাস পর Pensylvania সহরে Brown নামে এক দোকান খুলিয়া বসিলেন। (Morton Princeএর Dissociation of Personality র ১৮৬ পৃঃ) ঐ গ্রন্থেরই ২৩৪ ও ২৩৫ পৃষ্ঠায় মিঃ চার্লসের ঘটনা উল্লিখিত আছে। তিনি একটি ট্রেণ সংঘর্ষের ১৭ বৎসর পরে (যখন তিনি বিবাহিত ও ৪টি সন্তানের পিতা) কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না যে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর নয়। (২৪ বৎসর বয়সে এই রেলওয়ে একসিডেণ্ট হইয়াছিল) Tennetএর বইয়ে আছে Roy যথার্থ কে তাহা ভুলিয়া গেল এবং নানা রকম কাজকর্ম্ম করিয়া ৪ মাস পর তাহার জ্ঞান হইল। বাদীর বিবরণ এই যে তিনি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হইয়া ১২ বৎসর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাস করিলেন;

তারপর একদিন তাঁহার মনে হইল তাঁহার বাড়ী ঢাকা এবং ঢাকা আসিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন।

মেজর টমাস মনে করেন বাদীর বিবৃতিতে এমন কতগুলি জিনিষ আছে যাহা অসম্ভব। প্রথম বৎসর দার্জ্জিলিং হইতে অসীঘাট যাওয়ার সময় তিনি যে অবস্থায় ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"জ্ঞান ছিলনা—বা এই রকম কিছু" —উহা পশ্চাদ্বর্ত্তন—উহা dissociation এবং adoptation এর সহিত একসঙ্গে চলিতে পারে না, তাহা হইলেই বলা যায় Rev. Hannaর ন্যায় তিনি শিশু হইয়া গিয়াছিলেন— Ansel Bourne এর মত তিনি দোকান করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি আশা করিতে পারেন না যে আদিম বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার স্মৃতি আরও ভালরূপে ফিরিতে পারে। তৃতীয়তঃ এইরূপ মানসিক ভাবের একত্য (dissociation) সাধারণ রকমের নয়। প্রায়ই ইহা হিষ্টিরিয়ার ন্যায় স্নায়বিক রোগীদের হইয়া থাকে। মেজর ধুঞ্জি ভাই কার্য্যতঃ এই মতই দেন। লেঃ কঃ হিলের মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞতা আছে তিনি বলেন বাদীর বর্ণনায় কিছুই অসম্ভব নয়।

বাদী শৈশব অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এই অভিমত সম্বন্ধে বলা যায়—যদি তাহাই হইত—তাহা হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ না হইয়া অপ্রকৃতস্থ হইতেন, ইহাই টঠোলজির মত। তিনি যে শৈশবাবস্থায় ফিরিয়া ছিলেন, বাদী একথা বলেন না। সেটা যে কি অবস্থা তাহা তিনি বলিয়াছেন - তিনি ইহাকে অজ্ঞান অবস্থা বলিয়াছেন। এবং জিনিষ পত্র চিনিতে পারিতেন—পাহাড় গাছ, সন্ন্যাসী ঘাট এইরূপ জটিল পদার্থ গুলিও চিনিয়াছেন—কেবল দার্জ্জিলিং হইতে অসিঘাট পর্যন্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বা অন্য কেউ যে তাহার মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিতে পারেন এ আশা আমি করি না। তাঁহার বিবরণ হুবহু ও কঠোরভাবে মানিয়া লওয়া অস্বাভাবিক, তবে তিনি যে ভাবে বিবরণ দিয়াছেন ঠিক সেই ভাবে দেখিলে— ইহা যে শৈশবাবস্থাতে ফিরিয়া আসা বলা যায় না। ইহা পশ্চাদ্বর্ত্তনের শেষতম দৃষ্টান্ত। ইহাতে যে ক্রমবিভাগ নাই এ বিষয়ে আমি মেজর ধুঞ্জি ভাইয়ের সহিত একমত নহি। মেজর টমাস বলেন "স্মৃতিভ্রংশের সময়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনা হইতে উদাসীনতা অনেক রকমের হইতে পারে। অর্থাৎ এরূপ লোক দেখা যায়, মানসিক সুস্থতা যে ন্যূনাধিক বিশৃঙ্খল চিত্ত হইয়াও সম্পূর্ণ উদাসীন নহে, আবার এই রকম

নোটিস। বাদীর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া যে তার করা হইয়াছিল তাহার কারণ মমতাজ উদ্দিন—১।৭।২১ তারিখে আজলা গিয়া বাদী মালাসিং বলিয়া—ধরমদাস ২৭।৬।২১ তারিখে যে খবর দিয়াছিল তাহার সত্যতা করিয়া আসিয়াছেন। এই টেলিগ্রামের পরেও ইহা কিছুতেই বলা চলে না যে সত্যবাবু এই তদন্তের কথা কিছু জানিতেন না। তাঁহার নিকটই তদন্তের ফল প্রথম আসিয়াছিল—আর ইহা অস্বাভাবিকও নয়।

২৭।৬।২১ তারিখে ধরমদাস নাগা নামে একজন লোক (ইহাকে আমি ২নং ধরমদাস বলিব—এবং বাদীর গুরুকে ১নং ধরমদাস বলিব) অমৃত সহরের ৭।৮ মাইল দূরে রাজাসংসী নামক স্থানে লেঃ রঘুবীর সিংহ নামক একজন অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছে :

হরনাম দাসের চেলা ধরমদাস—সম্প্রদায় উদাসী, বয়স ৪৫—ঠিকানা সংসার, ব্যবসা সেবাদার। আমি অমৃতসহর জেলায় আজলা থানায় সংসার মৌজায় বাস করি। যে ছবি আমাকে দেখান হইয়াছে তাহা আমার চেলা সুন্দরদাসের ছবি—আগে তাহার নাম ছিল মালসিং। সে লাহোর জেলার আজলা মৌজায় বাস করিত। তাহার খুড়তুত ভাই নারায়ণ সিং মণ্টগোমারী জেলার ৪৭ নং চকে বাস করে। প্রায় ১১ বৎসর পূর্ব্বে সে মাল সিংকে লইয়া নান্‌কানা সাহেব'এ আমার সঙ্গে দেখা করে। তখন মাল সিং-এর বয়স ২০ বৎসর। মালসিং-এর 'পর বারেশ'—(যাহারা তাহাকে লালনপালন করিয়াছিল) অজিলা-গ্রামের তাহার কাকা মঙ্গল সিং ও লাভসিং ছয় বৎসর পূর্ব্বে সুন্দর দাস আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। সুন্দরদাসের চোখ "বিল্লি" ও রং কবুর্না। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি তাহাকে প্রয়াগে কুম্ভ মেলায় দেখিয়াছি। তার পরে আর তাহাকে দেখি নাই। এই তস্‌বীর (একজিবিট্‌ পি—১) আমার চেলা সুন্দরদাসের তসবীর (ফটো) (পড়িয়া শোনান হইল এবং ঠিক বলিয়া স্বীকৃত হইল।

২৭-৬-২১

লেঃ রঘুবীর সিং এই বিবৃতি প্রমাণ করিয়াছেন। এবং ইহা যে ২৭-৬-২১ তারিখে (পি ১নং লেখা ফটো) দেখিয়া রঘুবীর সিংহের সম্মুখে ধরমদাসের বিবৃতি এ সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই। ঐ সময় ও ঐস্থানে ঐ ফটো দেখিয়া আরও তিনজন লোক বিবৃতি দিয়াছে—তাহারা সংসারের দেবদাস, কালা সিং, ভগত সিং ও কর্ত্তার সিং। সাবইনস্‌পেক্টার মমতাজ উদ্দিন এই কয়জনের নাম দিয়া একটি দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই দরখাস্ত ১৬৪

ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের ধারা মূলে এই ছয় জনের বিবৃতি লইয়াছেন এবং পুলিসের কর্ম্মচারীর হাতে দিয়াছেন।

লোক না দেখিলে এগুলিকে জমানবন্দী বলা যাইতে পারে না।

ধরমদাসের বিবৃতিতে মালসিংহের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। তার বাড়ী আজলা, সে নারাণ সিং ও লাভ সিংএর ভাইপো—ইহাতে দুজনেরই ঠিকানা আছে। ১৯১০ সালে মাল সিং ধরমদাসের চেলা হয় ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত এক সঙ্গে ছিল—এবং ১৯২৭ সালেও এলাহাবাদে কুম্ভ মেলায় দেখা হইয়াছিল। এখন ১৯২০ সালে তাহার বয়স ২০ বৎসর হইলে এখন তাহার বয়স ৪৬ বৎসর হওয়া উচিৎ। সে লেঃ রঘুবীর সিংএর কাছে পি—১ লেখা ফটোতে এই লোকটিকে দেখিয়াছে।

আমি বলিয়াছি—১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগা ২৬শে তারিখে ঢাকা আসেন এবং ৩০শে তারিখে চলিয়া যান। মিঃ লিণ্ডসে তাঁহাকে তাঁহার সহিত দেখা করার জন্য লিখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি চলিয়া যান। বাদী তাহার জবানবন্দীতে বলেন পুলিসের ভয়েই তিনি প্রস্থান করেন। তাহার বিবৃতিতে বাদী স্বীকার করিয়াছেন যে বিপক্ষদলের চক্রান্তে পুলিশের নিকট তিনি একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন।

মোকদ্দমার সময় বাদী, ধরমদাস ঢাকায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিতে দেওয়া হয় নাই। কারণ সাক্ষ্য দিতে না আসিলে এমন কি আসিলেও—এই বিবৃতিকে জবানবন্দি বলিয়া নেওয়া চলে না—কোন পক্ষ হইতেই তাহাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকার প্রস্তাব আসে নাই—যে দশ জন সাক্ষী তাহার ফটো দেখিয়া কমিশনারের সম্মুখে বাদী মঙ্গল সিং এই বিবৃতি দিয়াছিল কেবল তাহাদের কমিশনে জবানবন্দি নেওয়ার কথা হইয়াছিল না।

ছুটির পাঁচদিন পূর্ব্বে ২৯-৯-৩৫ তারিখে একজন লোককে আমার সম্মুখে আনা হয়—এই লোক নিজেকে ধরমদাস নাগা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং বলে সেই লেঃ রঘুবীর সিং এর নিকট বিবৃতি দিয়াছিল। সে বলে—বাদী (তখন আদালতে উপস্থিত ছিলেন) আমার চেলা সুন্দরদাস। সাক্ষী কখনও দার্জ্জিলিং যায় নাই এবং বাদী লাহোর জেলার আজলা গ্রামের মালসিং।

বাদীর বক্তব্য এই যে, যে লোকটি তাহার গুরু বলিয়া পরিচয় দেয়—সে জাল। সে যে জাল এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই, তাহার জবানবন্দি

শেষ হইয়া গিয়াছিল। এবং রঘুবর সিংহের সামনে প্রদত্ত বিবৃতিতে যে আত্মীয়গণের উল্লেখ করা হইয়াছিল, সেরূপ আত্মীয় তাহার ছিলনা এই ঘটনায় ব্যাপারটী আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল এবং স্থূলকায় কথাটী ১৯২১ সালে বাদীর পক্ষে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইহা আদৌ আশ্চর্য্যজনক নহে যে মিষ্টার চৌধুরী বাদীকে সে যে অজ্লার মাল সিংহ এই উক্তি আরোপ করেন নাই।

কালো চুল তেল না মাখিলে ও যত্ন না লইলে কটা হইয়া যাইতে পারে। সাক্ষীগণের নিকট এই উক্তি উপস্থাপিত করিয়া—এই ব্যাপার আবার তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে ইহা স্বীকৃত হইল যে—বাদীর চুল পিঙ্গল বর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং সাক্ষীগণ স্বীকার করিল যে বাদীর চুল দ্বিতীয় কুমারের চুলের মত।

বাদীকে কোন প্রশ্ন না করিয়া সে যে মালসিংহ ইহা প্রমাণ করা—এবং তাহাকে সর্ব্বপ্রকার স্থানে স্থাপন করা এবং তাহার মুখে সর্ব্ব প্রকার উক্তি আরোপ করা—প্রতিবাদীর পক্ষে যে সম্ভব হইতে পারে উহা আমার নিকট অদ্ভূত বোধ হয়, কিন্তু তৎ সত্ত্বেও এই ব্যাপারের গুরুত্ব দেখিয়া আমি—সাক্ষ্য সমুদয় বিবেচনা করিয়াছি। এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই মালসিংহের আদৌ কোন আত্মীয় নাই, তাহার পূর্ব্ব আবাসের কোন খবর নাই—কারণ আমি ইহা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি যে—মেন্দুলওয়ালীতে তাহার এক আত্মীয় ভ্রাতা আছে। কারণ সেরূপ হইলে তাহাকে সাক্ষী ডাকা হইত। এবং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে লাহোরের সাক্ষীগণ—একদল কৃষক এবং তাহাদিগকে আনা হইয়াছিল যে ফটো সম্বন্ধে তাহারা কিছই জানিত না সেবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এবং তাহাদিগের দ্বারায় এমন কতকগুলি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে বাদীর সনাক্ত নির্দ্ধারিত হয়। ধর্ম্মদাস নাগা (প্রঃ সাঃ ৩১৭) যে মোকদ্দমা বাস্তবিক পক্ষে শেষ হইয়া গিয়াছিল তাহাই পুনর্জীবিত করিবার জন্য আদালতে আসিয়াছিল। অজ্লার সাক্ষীগণ যাহা বলিয়াছে; রঘুবর সিংহের নিকটে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং যে প্রকৃত ধর্ম্মদাস নাগা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় আসিয়াছিলেন তাঁহার কার্য্যাবলী এই সমস্ত গুলির সহিত যাহা মিল খাইবে এইরূপ বিবরণ এই সাক্ষীকে দিতে হইয়াছে।

এই লোকটীকে কিরূপে যোগাড় করা হইল—এ সম্বন্ধে একটী চমৎকার বিবরণ আছে।' ইনস্পেক্টর মমতাজ উদ্দিনকে পাঞ্জাবে গিয়া—এই সাধুকে

দেখান হইয়াছিল তাহা আদৌ বসিয়া থাকা ফটো নহে দণ্ডায়মান অবস্থার ফটো। পূর্ব্বে সে এ (২৪) নং বসিয়া থাকা ফটোটীর সম্বন্ধে হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে কি না প্রশ্ন করায় সে বলিল যে সে উহা বলে নাই, অধিকন্তু আরও বলিল যে তাহার সাক্ষ্য লইবার উদ্দেশ্যে এক উকিল যখন তাহার বিবৃতি লইয়াছিল তখন তাহাকে এই ফটো দেখান হইয়াছিল এবং রঘুবর সিংহের সামনে যে এই ফটো দেখান হইয়াছিল—ইহা সে অস্বীকার করিয়াছিল। অর্থাৎ ইহা সত্বেও তাহার প্রামাণিক জবানবন্দীতে সাক্ষী তাহাকে এ (২৪) ফটো দেখান হইয়াছিল এবং সে স্বীকার করিয়াছিল যে এই ফটোই তাহাকে দেখান হইয়াছিল; এবং মিঃ এ. চৌধুরী এই পরামর্শ পাইয়াছিলেন যে এ (২৪) ফটো ২৭৬'২১ তারিখে প্রদর্শিত ফটোর একটী কপি।

আসল ব্যাপার কি ঘটিয়াছিল, তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। রঘুবর সিংহের নিকটে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছিল তাহাকে বিবৃতিকারীর কোনও সহি বা টিপসহি নাই। ফটো না দেখাইলে উহার কোন মানেই নাই, এবং ঐ ফটোতে রঘুবর সিংহের একজিবিট পি (১) এবং তাহার সহি ছিল এবং খুব সম্ভবতঃ বিবৃতিকারীর টিপসহি ছিল অথচ তাহাতে সহি বা টিপসহি লওয়া হয় নাই। সাব ইন্‌স্‌পেক্টার মম্‌তাজউদ্দিন্ অবশ্যই উহা লইত এবং সাধারণ ভাবে উহা সূচিত করে। একজিবিট পি ৮ সম্বলিত ফটো অন্য কোন লোকের ফটো হইবে, নিশ্চয়ই বাদীর ফটো নহে, কিংবা উহা ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ ধর্ম্মদাস নাগার না হইয়া অন্য কোন লোকের সহি বা টিপসহি সংযুক্ত হইবে কিংবা একজিবিট্ এই ফটো সরাইয়া না লইলে বিবৃতিদ্বারা বাদীর কোন ক্ষতি হইবে না, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা বিবৃতির অংশ স্বরূপ ফটো যোগার করা হইয়াছিল। একজিবিট এ (২৪) এক উদ্দেশ্যে উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল কিন্তু সুরেন্দ্রের রিপোর্ট দ্বারা উহা ব্যাহত হইল এবং তখন এই গল্প সৃষ্টি হইল যে দাঁড়ান ছবি দেখান হইয়াছিল।

আমি বিশ্বাস করি না যে—পি (১) চিহ্ন কারা ফটো হারাইয়া গিয়াছে, এমনকি ২৫।৯।৩৫ তারিখেও উহা বলা হয় নাই; উহা কৌঁসুলীর অধিকারে ছিল না। পরবর্ত্তীকালে কোন সাক্ষীর দ্বারা নহে পরন্তু কৌঁসুলীর দ্বারা উক্ত হইয়াছিল যে উহা পাওয়া যাইতেছে না। যদিও ইন্‌সপেক্টার মম্‌তাজউদ্দিন বলিয়াছেন যে তিনি বিবৃতি ও ফটো মিঃ লিণ্ডসেকে প্রদান করিয়াছেন, এবং ইহা সকলেই জানে যে সাধু-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র বিশেষ ফাইলে রাখা

হইয়াছে। বিবৃতিটি পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু ফটোটি পাওয়া যাইতেছে না। যে ফটোটী দেখান হইয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তে এই যে অপর একটী ফটো স্থাপন ইহাকে আমি কেবলমাত্র অতি জঘন্য ধরণের কৌশল বলিনা, ইহাকে জুয়াচুরী বলি।

যে ধর্ম্মদাস বিবৃতি দান করিয়াছেন তাঁহাকে যে ফটো দেখান হইয়াছিল সেই ফটো ব্যতীত বিবৃতির কোনই দাম নাই এবং এটী উপস্থিত না করা এবং তাহার পরিবর্ত্তে জুয়াচুরী করিয়া অন্য ফটো স্থাপনের চেষ্টা করা এবং উহা ব্যহত হইলে তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করা এই সমস্ত হইতেই এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে—ফটোর লোকটী সুন্দরদাস, এই বিবৃতি বাদীর ফটোর পরিবর্ত্তে অন্যের ফটো দেখাইয়া লাভ করা হইয়াছিল, এবং বাদীকে যে পরে সুন্দরদাস বলা হইয়াছে এই সুন্দরদাস নামের উৎপত্তি উক্তরূপে ঘটিয়াছিল।

বিবৃতিটি গেল বটে কিন্তু লোকটি রহিল। যে যদি রঘুবর সিংহের সামনে বিবৃতিদান না করিয়া থাকে তাহা হইলে সে বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগা নহে। নিম্নলিখিত বিবেচনা মতে মাত্র একটী সিদ্ধান্ত সম্ভব।

১। ইহা স্বীকার হইয়াছে যে ২৭।৮।২১ তারিখে এ (২৪) একজিবিট বিবৃতিকারীকে দেখান হয় নাই, কিন্তু এই লোকটী জুয়াচুরীর মতলবের একটী অংশ স্বরূপ হলফ করিতেছে যে উহা দেখান হইয়াছিল। সে পরে হলফ করিতেছে যে খাড়া ফটোটী দেখান হইয়াছিল, যাহা আদৌ দেখান হয় নাই, সেরূপ হইলে উহাতে একজিবিটি চিহ্ন থাকিত।

২। সে যদি সেই একই লোক হইত, তাহা একজিবিটি মার্ক বিশিষ্ট ফটোটি উপস্থিত করা হইত।

৩। অজুলার সাক্ষীগণ যে ভুল করিয়াছিল যে সে ভুল করিবে না। সে বলিতেছে যে মালাসিংহ স্থূলকায় ছিল না। তাহার চুল আমার মত সোনালি ছিল—যেমন পাঞ্জাব হইতে আহূত একজন সাক্ষী বলিয়াছিল যে তাহার চুল ছিল 'কাক্‌কা ভুরা' এবং আর একজন সাক্ষী বলিয়াছিল কাক্‌কা অর্থাৎ তাহার ব্যাখ্যা মতে ফিকে সোনালী।

৪। এই বিবৃতিকারী বলিয়াছে যে তাহার পেশা সেবাদার অর্থাৎ সে এক গুরুদ্বারের পুরোহিতের ব্যবসাধারী। এই সাক্ষী বলিতেছে যে সে কোন স্থানে সেবাদার নহে এবং সে সেবাদার এ কথা কখনও বলে নাই। দেবদাস সহ পাঁচজন সাক্ষী রঘুবর সিংহের সামনে ২৭।৬।২১ তারিখে বিবৃতি দিয়াছিল কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত ঘটনা জানে না। অবশ্য সে বিবৃতির মধ্যে এই বর্ণনা

শিখ উকিল আবার সাংগ্রায় ছুটিলেন এবং গুজ্জর সিং, চন্দ্র সিং, বুর সিং ও ভগত সিং নামে চারজন সাক্ষীযোগাড় করিয়া আনিলেন, সে যে ২৭।৬।২১ তারিখে সাংগ্রায় ছিল তাই সামঞ্জস্য করিতে, এবং বহু পরে আসিলেন ইন্‌সপেকটার মমতাজুদ্দীন ও সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তাঁহারা যে বিবরণ দিতেছেন তাহা এই ইনস্‌পেক্টার ও সুরেন্দ্র ২৬শে জুন তারিখে সংগ্রারায় গেলেন এবং গুজ্জর সিং নামক তৎকালীন এক ডাক্তারের ছাত্র, এক দোভাষী ও তাহার পিতার সহিত গুরুকাবাদে ধরমদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তারপর সেই রাত্রি ধরমদাস সাংগ্রারায় গুরুদ্বারে গমন করিলেন। তথায় দেবদাস সেবাদার ছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে—তিনি বিবৃতি করিবার নিমিত্ত একা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে গেলেন এবং তারপর অন্যান্য সাক্ষীরা গেল, সুতরাং তিনি বাকী সকলকে দেখেন নাই। এমনকি তাঁহার চেলাকেও দেখেন নাই। সুরেন্দ্র বাবু তাহাকে দেখার পর তাঁহার বিবৃতি আরম্ভ করিলেন এবং তাহাকে খাড়া ফটো দেখান হইয়াছে, দেখিয়া তিনি জুন মাসের গরমে পাঞ্জাবে চলিয়া গেলেন এবং অমৃতসর হইতে ৮ মাইল দূর হইতে একদল সাক্ষী পাঠাইলেন এবং তাহাদের বিবৃতি অনুমান করিয়া তাহার রিপোর্ট পাঠাইলেন কিন্তু উহা ঘটিল না। আমি এই বিবরণের একটা কথাও বিশ্বাস করিনা, কারণ প্রঃ সাঃ ৩২৬ ধরমদাস যে যে বিষয়ে অজ্ঞতা দেখাইয়াছিল সেই সকল জ্ঞান ধরমদাসের ছিল না ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য এবং অগত্যা একবার তাহাকে দেবদাসের সংস্পর্শে আনিবার জন্য যাহাতে তাহারা একসঙ্গে ফটোটা দেখিতে পায় এই সকল উদ্দেশ্যে রিপোর্টটা বুদ্ধি. করিয়া রচিত হইয়াছিল, কিন্তু রিপোর্ট অনুসারে তাহাকে নির্ব্বাক করিয়া রাখাও সম্ভবপর ছিলনা। এই দেবদাস ছোট সাংগ্রারার সেবাদার। এই ছোট সাংগ্রার হইতে যে সাক্ষীগুলি আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ভগত সিং একজন। ভগত সিং বলিতেছে যে সে সেই ভগত সিং যে একটা অপরিচিত ফটো দেখিয়া রঘুবরের সম্মুখে বিবৃতি দিয়াছে এবং সে সুন্দর দাসকে জানিত বলিয়া প্রকাশ করিতেছে, কারণ ধরমদাস নাগা তাহার চেলা দেবদাসকে দেখিতে ছোট সাংগ্রায় আসিতেন। দেবদাস ২০ বৎসর ধরিয়া সেই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। শিখ উকিল এই একদল সাক্ষী আনিতে গেল কিন্তু তথাকার গুরুদ্বারে সেবাদার দেবদাসকে আনিলনা, ইহা বোধ হইতেছে যে দেবদাস রঘুবর সিংহের সামনে কি ফটো দেখান হইয়াছিল

তাহা বলিয়া দিত এবং এই ধরণের লোক আদাসতে কিছুতেই এই লোকটাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

এই দলের সহিত আর দুইজন লোক আসিয়া ছিল, উহাদিগকেও শিখ উকিল আনিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজনের ধরমদাসের গুরু হরনাম দাস। তিনি ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ ধরমদাসের ফটোকে তাহার দেশী ধরমদাস বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিলেন এবং বাদীকে তাহার চেলা চেলা সুন্দরদাস বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। ধরমদাস ও হরনাম দাসের সমস্ত বিবরণ বাদীর সাক্ষী দর্শনদাসের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু একটী কথা পাওয়া যাইতেছে না। দর্শনদাস বলিয়াছেন যে তাঁহার গুরু লুধিয়ানা জেলার বিলু নামক স্থানের এক গৌর ব্রাহ্মণ। লোকটী দর্শনদাস ওরফে গোপালদাসকে চেনা বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, দিলুকে গ্রহণ করিতেছে কিন্তু সে জানেনা যে সে একজন গৌর ব্রাহ্মণ। সে বলিতেছে যে ধরমদাস ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে সুন্দরদাসকে তাহার চেলা করিয়াছিল এবং সে নিজে ধরমদাসকে ২০ বৎসর পূর্ব্বে দীক্ষা দিয়াছিল। সে যখন বলিয়াছেন যে সে বাকী দলের সঙ্গে আসে নাই, পরন্তু ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে প্রায় তিনদিন কলিকাতায় ছিল তখন সে ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা বলিয়াছিল। গুর্জ্জর সিং ও চন্দন সিং তাহাকে লুকাইতে ছিল কিন্তু ভগত স্বীকার করিতেছিল যে এই লোকটী সমেত সমস্ত দল কোথাও না থামিয়া একসঙ্গে ঢাকায় আসিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে খালসা দেওয়ানের লোক অর্জ্জুন সিং এই জাল ধরমদাস নাগাকে সংগ্রহ করিয়াছিল, যাহাতে সে আসিয়া বলিতে পারে যে যে ব্যক্তি ১৯২১ সালে রঘুবর সিংহের সমক্ষে বিবৃতি দিয়াছিল সে সেই লোক। সে আসিল এবং তারপর এই বিবৃতি যাহাতে বাদীর বিপক্ষে যায় ফটো বদলাইয়া সেই চেষ্টা আরম্ভ হইল। এবং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভান করিবার জন্য যে ইনসপেকটার মমতাজ উদ্দিন পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন এবং যে সাক্ষী দিতে আসিবার পূর্ব্বে কখনও তাহাকে দেখে নাই—তাঁহাকেই আসিতে হইল এবং তিনি ১৯২১ সালে যে সাধুকে দেখিয়াছিলেন সেই সাধু বলিয়া এই লোকটীকে সনাক্ত করিতে হইল এবং কৌশুলীকে ফটোটী উপবিষ্ট ফটো পরামর্শ দেওয়ার পর বলিতে হইল যে তাহাকে খাড়া ফটো দেখান হইয়াছিল। ইহাকে ভুল হইয়াছিল বলা চলে না, পরন্তু রঘুবর সিং যে ফটোটীতে একজিবিট পি (১) চিহ্ন দিয়াছিলেন সেইটীর পরিবর্ত্তে বাদীর একটী ফটো স্থাপন করার নীচ ষড়যন্ত্রের অংশ বলা চলে।

দেবীর নিকট লিখা দেখাইয়া মি চাটার্জ্জি বলেন) দেখুন এই চিঠিখানাও আপনার হাতের লিখা কিনা? উ—হাঁ এই চিঠি দার্জ্জিলংএর পরে লেখা। প্র—আপনার হাতের লেখা কি এখন একরকমই? উ—কতকটা এইরকমই। (এই সময় মি চাটার্জ্জি বিবাদিনীকে দুছত্র লিখে দিতে বলিলেন—পূর্ব্বের লেখা চিঠি হইতে—উকীল সুরেন্দ্র বাবু পড়িয়া বলেন এবং বিবাদিনী লেখেন ও নাম সই করেন।) প্র—প্রথমবার যখন বৃদ্ধ বাদীকে নিয়ে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীর নিকট দিয়া যায় এবং বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ইত্যাদি এই সমস্ত সত্যবাবুকে বলিয়াছিলেন? এবং এই রকম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যে বাদীকে দেখেছেন প্রত্যেক বারেই তা কি সত্যবাবুকে বলেছিলেন? উ—প্রথমবার বলেছি। অন্যান্য বারও বলেছি তবে কোনবার বলেছি না বলেছি তা মনে নাই। প্র—মনে করুন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার আপনার ভাইয়ের নামে আপনার নিকট কোন একটা অভিযোগ করিলেন, আপনি অনুমানের পর জানিলেন যে আপনার ভাই নির্দ্দোষ—তখন আপনি ম্যানেজারকে লিখলেন, "আপনার অভিযোগ মিথ্যা" আপনি খোলা তদন্ত করুন। উ—আমি বলব আমার দাদা নির্দ্দোষ। প্র—কেউ যদি পুলিশকে খবর দেয় যে আপনার বাড়ীতে এনাকিষ্ট আছে কিন্তু আপনি জানেন উহা মিথ্যা এবং পুলিশকে আপনি খোলা তদন্তের জন্য লেখেন, তখন আপনি এই বিশ্বাসের উপর লিখবেন না যে আপনার বাড়ীতে আনার্কিষ্ট নাই। (কোর্ট বলেন—এই প্রশ্নে কোন পয়েণ্ট আছে বলে মনে হয় না)। উ—আমি শুধু পুলিশকে বলব তদন্ত করতে, পুলিশ তার কর্ত্তব্য করবে। প্র—আপনি কি জানেন বাদীকে আত্মপরিচয় দেবার পর নিডহ্যাম সাহেব কলেক্টরের নিকট একটা যথাযথ তদন্তের জন্য লিখেছিলেন?—হাঁ। প্র—এই তদন্ত চাওয়ার ভিতর কোন বদমতলব ছিল কি? উ—না বদ মতলব থাকবে কেন, নিডহাম সাহেব সত্য নির্দ্ধারণের জন্যই তদন্ত চেয়েছিলেন। প্র—আপনি কি জানেন যে সত্যভামা দেবী কালেক্টর সাহেবের নিকট এই বলিয়া এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন "আমি এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গ রমেন্দ্র বলিয়া চিন্‌তে পেরেছি—আপনি একটা তদন্ত করুন।" উ—অপর পক্ষ একটা দরখাস্ত করেছিল আমি জানি। রাণী সত্যভামা দেবীর সই ছিল কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়া সই করিয়াছিলেন কিনা জানি না। আপনি কি বলতে চান সত্যভামা দেবী যে অনুসন্ধানের জন্য কালেক্টর সাহেবকে লিখিয়াছিলেন

জানাইয়া ছিলেন বাদীই আমার দ্বিতীয় পৌত্র রমেন্দ্র এ কথা জানেন ?" উ—দরখাস্তের কথা শুনেছি—চিঠির কথা শুনি নাই। প্র—সত্যভামা দেবী যে ড্রামণ্ড সাহেবের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়াচেন, আমি আজ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে আছি, এই আমার দ্বিতীয় পৌত্র কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ"—একথা শুনেছেন কি ? উ—শুনেছি বলে মনে হয় না। কোর্টের প্রশ্নের উত্তরে বলেন—প্রকাশ্যে তদন্ত করার জন্য যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন সেই দরখাস্তের কথা জানি, চিঠির কথা জানি না। প্র—আপনি যদি সত্যভামা দেবীর অবস্থায় থাকিতেন এবং সত্য সত্যই আপনার দৃষ্টিশক্তি থাকত তাহলে আপনি কি কালেক্টারের স্ত্রীকে দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করিতে আহ্বান করিতেন ? উ—আমি যদি সত্যভামা দেবী হইতাম তাহলে আগে কুমারের স্ত্রীর নিকট জানিয়া লইতাম। প্র—আপনার কি উচিত ছিলনা সত্যভামা দেবীর নিকট আসা ? না। প্র—তাঁর উচিত ছিল আপনার নিকট যাওয়া ? উ—সত্যভামা দেবীর যদি জ্ঞান বুদ্ধি থাকত তাহলে তাঁর উচিত ছিল আমাকে লেখা যে এই জনরব শুনছি তুমি এসে দেখ।" প্র—আপনি এই চিঠি পাইলে যাইতেন কি ? উ—নিজে যাইতাম না, তাঁর সন্দেহ চিঠি লিখেই হউক কি অন্য যে ভাবেই হউক সন্দেহ ভঞ্জন করতাম। যদি দরকার হত ঢাকায় আসতাম কিন্তু বাদীকে দেখতে যেতাম না। প্র—সত্যভামা দেবী যদি বলতেন, এস তুমি-আমি দেখি তাতেও আপনি রাজি হতেন না ? উ—নিশ্চয়ই না। আমি বুঝিয়ে দিতুম যে তাঁর ভুল হচ্ছে। প্র—সত্যভামা দেবীর দৃষ্টিশক্তি আছে বলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যে লিখেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী এসে পরীক্ষা করুন এটা অসঙ্গত কাজ করেছিলেন ? উ—আমি তা জানিনা। সত্যভামা দেবী সম্বন্ধে এই উক্তি যদি সত্য হয় তাহলে মিথ্যাটা যাতে নষ্ট হয় তার জন্য কিছু করা দরকার হত এটাত বুঝিতে পাচ্ছেন ? যদি কেউ বলে আপনার দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে সেই জন্য বাদীকে চিনতে পাচ্ছেন না, এই গুজব না রটে তার জন্য কিছু করতেন নাকি ? উ—আমি বলতাম দৃষ্টিশক্তি আছে।

প্র—আপনি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কোন কর্ম্মচারীকে একথা বলতেন নাকি ? উ—যদি এই রকম মিথ্যা উক্তি উঠত তা হলে আমি বলতাম আমার চক্ষু ভাল আছে। প্র-যদি কলেক্টর সাহেব বলতেন মেজরাণীর চক্ষু ভাল না, আপনি এই কথা লিখিলে অসঙ্গত হইত যে আপনার স্ত্রী এসে চক্ষু পরীক্ষা করে যাক ? উ—তিনি লিখলে হয়ত লিখতাম। প্র—আপনি

বলতে চান সত্যভামা দেবী যদি এরূপ লিখে থাকেন যাঁরা তার পেছনে আছেন তারাই তো করিয়েছেন? উ—হঁা। প্র—আপনি কি এই কথা বলিতে চান যে সত্যভামা দেবী যদি বাদীকে কুমার বলিয়া চিনে থাকেন তবে তা অসাধু মতলবে করিয়াছিলেন? উ—আমি তো বলিতে চাইনা তবে তখন তার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তিনি কখন কখন সন্দেহ প্রকাশ করতেন কিন্তু ঐসব লোক তাঁকে অন্যরূপ বোঝাত। প্র—তাহলে আপনার কথা এই যদি সত্যভামাদেবীর বুদ্ধিশুদ্ধি থাকত ও দৃষ্টিশক্তি থাকত তাহলে তিনি বাদীকে কুমার বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতেন না। উ—যদি তার জ্ঞানশক্তি থাকত তাহলে কিছুতেই বাদীকে কুমার বলে স্বীকার করতেন না। প্র—তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বলছেন না যে সত্যভামা দেবী মিথ্যা শঠতা করে বাদীকে কুমার বলে নিয়েছেন? না।

প্র—আপনি বলেছেন বৃদ্ধ বাদীকে নিয়ে ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে গিয়েছিল—আচ্ছা, আপনি প্রথম দিন কি করে জানলেন যে এই বাদী উ—আমি মাথায় লম্বা চুল দেখে চিনে নিলাম। প্র—যদি বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ সঙ্গে থাকত তাহলে কি বাদী বলে চিনতে পারতেন? না। যদি বৃদ্ধ না থাকত তাহলে বাদী বলে চিনতে পারতাম না। তখন বুঝতাম একজন লম্বা চুলওয়ালা লোক। প্র—আপনি কি এই কথা বলতে চান বৃদ্ধ নিয়া গিয়া আপনার বাড়ীর কাছে আপনাকে দেখাল তখন বৃদ্ধর মনোভাব ছিল কি যে বাদী কুমার নয়? উ—বৃদ্ধ নিশ্চয়ই জানত যে বাদী কুমার নয়। প্র—আপনি আজ পর্যন্ত এই কথা জানেন বাদীর আত্ম পরিচয় দেবার কয়েকদিন পরে গোবিন্দবাবু জ্যোতির্ময়ী দেবী—তড়িন্ময়ী দেবী কালেক্টর সাহেবের কাছে এক দরখাস্ত করেছিলেন আমরা বাদীকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি আপনারা গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে একটা খোলা তদন্ত করুন। উ—বাদী আসার কিছুদিন পরে কালেক্টরের নিকট এক দরখাস্ত হইয়াছিল—কিন্তু কে কে দরখাস্ত করিছিলে জানিনা। প্র—আপনি কি বলতে চান যখন তারা এই দরখাস্ত করলেন তখন তাঁরা পূর্ণভাবে জানতেন যে বাদী কুমার নয়?—আমার তো তাই বিশ্বাস। প্র—আপনার স্বামীর মাথায় অনেক চুল ছিল কি? উ—দস্তুর মত চুল ছিল। প্র—আপনি কি বলিতে চান আপনার স্বামীর মাথায় চুলের ভিতর হাত দিয়ে দেখেছেন যে তাঁর মাথার কোনও উচু আছে না নীচু আছে? উ—আমি খুঁজে কখনও দেখিনি,

প্র—কি রকম ব্লু বলবেন ফিকা—না গাঢ় ? উ—চোখের রং খুব গাঢ় ব্লু ছিল। প্র—তড়িন্ময়ী দেবীর চোখের রং কি রকম ছিল ? উ—ফিকে ব্লু ছিল। প্র—তড়িন্ময়ী দেবীর চোখের রং কি রকম ? উ—তাড়ন্ময়ী দেবীর চোখ একবারে কালো লালচে-হলদে। প্র—আপনি কি বলেছেন যে চোখের রংএর যে বর্ণনা আপনি দিলেন তা ভুল হইতে পারে না ?—না। প্র—মেজকুমারকে খালি গায়ে বেশী দেখেছেন কি ? উ—দেখেছি বৈ কি ! প্র—তিনি যখন কামাতেন আপনার সাম্‌নে কামাতেন ? উ—নীচে কামাতেন আমি সাম্‌নে থাকতাম না। প্র—নীচেই তিনি সময়টা বেশী কাটাতেন ? উ—বৈঠকখানা নীচে ছিল কাজেই বেশীর ভাগ সময় বৈঠকখানাতেই কাটাইতেন, তবে তিনি বাড়ীর সর্ব্বত্রই যাওয়া আসা করতেন। প্র—আপনার বোন আপনাকে এক রকম চিঠি লিখেছিলেম কিনা মনে পড়ে 'তোমার স্বামী যদি নীচেই শোয় তুমিও নীচেই শুইও'। হাঁ। প্র—মায়ার সাহেবকে কখনও দেখেছেন ? উ—হাঁ, শাশুড়ীর কাছে অন্দর মহলে এসেছেন তাই দেখেছি। আপনার শাশুড়ীর মায়ার সাহেবের সঙ্গে কি রকম বনিবনা হইত ? উ—তা আমি কেমন করে বল্‌ব, আমি জানি না। প্র—আপনি কি এই সম্বন্ধে কিছুই জানেন না ? উ—আমার তো কিছুই মনে পড়ে না। প্র—র‍্যাঙ্কিন সাহেব রাজবাড়া যখন দখল নিয়াছিলেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন ? উ—জয়দেবপুর। প্র—সেই দিনের ঘটনা কিছু মনে আছে ? উ—কোন্ ব্যাপার বলুন ! সেই দিন সোনার জিনিষ পত্র সরিয়ে রাখা হয়েছিল। প্র—শাশুড়ীর সেদিনের অবস্থা মনে আছে ? উ—শাশুড়ী কাগজ পত্র পুড়িয়ে ছিলেন। তার মেজাজ খারাপ ছিল—তিনি কান্নাকাটী করেছিলেন। প্র—শাশুড়ী আর কিছু অন্যায় কাজ করেছেন মনে পড়ে ? উ—কি অন্যায় কাজ বুঝতে পাচ্ছি না। প্র—শাশুড়ীর যে কাগজ পোড়ানর কথা বল্‌ছেন, সেটা কি তাঁর ভাল কাজ না মন্দ কাজ বলছেন ? উ—আমি কি করে বল্‌ব ভাল কি মন্দ ? প্র—দরকার পড়লে আপনিও কাগজ পোড়াতেন ? হাঁ। শাশুড়ী অজ্ঞান হন্‌নি কান্নাকাটি করছেন। প্র—কখন কান্নাকাটী করলেন ? উ—আমার মনে হয় যেদিন সাহেব এসেছিলেন, সেদিন বিকালবেলা শাশুড়ী কান্নাকাটী করেছিলেন—অনেক দিনের কথা, ভাল মনে নেই। প্র—কোন্ সময় ম্যাজিষ্ট্রেট দখল নিয়েছিলেন মনে আছে ? উ—না। প্র—যেদিন মায়ায় সাহেব এসে'ছলেন মনে পড়ে ? উ—না। মায়ার সাহেব আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন জানেন ?

বঙ্গের লোকের সাধারণ ধারণাই এই রকম !) প্র—বিয়ের সময় যে রকম রং ছিল এখন কি সেইরকম রং আছে ? উ—আমি লক্ষ্য করে দেখি নি। (A 50 চিহ্নিত ফটোটি আবার দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলেন)—উপরের ঠোঁটের মধ্য দিয়া নীচের ঠোঁটের দিকে যদি একটা লাইন টানা যায় তবে এটা বাহিরের দিকে থাকে ? উ—আমি বলতে পারি না। প্র—আপনি শুনেছেন আপনার স্বামীর নীচের ঠোঁট ডান দিকে একটু বাঁকা ছিল ? উ—আমি দেখিও নি, শুনিও নি। প্র—আপনার শ্বশুরের পরিবারের আর কারও ঐরকম ছিল ? উ—হাঁ আমার ভাসুরের ছিল তবে তার বাঁদিকে বাঁকা ছিল। ডান দিকে বাঁকা কারও ছিল না। প্র—আপনি আজ পর্য্যন্ত শুনেছেন বাদীর ঠোঁট ডান দিকে বাঁকা ? উ—না। প্র—আপনার স্বামীর কানের লতিটা আল্‌গা ছিল কিনা ? উ—একথা ঠিক নয়, তবে একটু ফাঁক ছিল। (কুমারের ফটো দেখাইলেও বিবাদিনী বলেন) ঐ রকমই ফাঁক ছিল। প্র—আপনার স্বামীর এই ফটো কত বয়সের তোলা বলতে পারেন ? উ—১৮।২০ বৎসর বয়সের আমার মনে হয়। প্র—আপনি কি পরীক্ষা করে কখনও দেখেছেন ২০ বৎসর পরে যেমন ছিল ৩০ বৎসর পরেও সেই রকম আছে ? উ—হাঁ আমার ভাইয়ের আমি তাই দেখছি। প্র—আপনি আপনার ভাইয়ের কান দেখে আসছেন কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেন নি ? উ—আমি লক্ষ্য করিনি, তবে রোজই দেখছি একভাবেই আছে। প্র—আপনার ভাইয়ের মুখ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যা দেখেছেন, এখনও সেই রকম দেখেছেন ? উ—মুখের আদল বদলায়নি। একেবারে চিরযৌবন থাকা অসম্ভব। মুখের চামড়া একটু ঢিলা হয়েছে, বয়সের সঙ্গে সাধারণ যে রকম পরিবর্ত্তন হয় সেই রকমই হয়েছে। প্র—আপনি আগের চাইতে মোটা হয়েছেন কি ? উ—হাঁ। বাদীর শরীরে কতকগুলি চিহ্ন আছে বলিয়া বাদীপক্ষ বলিয়াছেন। মিঃ চৌধুরী কোর্টে সিভিল সার্জ্জন দিয়া এই চিহ্নগুলি পরীক্ষা করাইতে চান। তাহাতে মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলেন যে বাদী বর্ত্তমানে অসুস্থ। ১৫ দিনের পূর্ব্বে তাঁহাকে পরীক্ষা করান সম্ভব হইবে না। চিহ্নগুলি নীচে দেওয়া গেল—১। মাথায় ফোড়ার দাগ, ২। জিহ্বার নীচে মাংসপিণ্ড, ৩। সিফিলসের দাগ, ৪। পিঠে ফোড়ার দাগ, ৫। ভাঙ্গা দাঁত, ৬। হাতে বাঘের থাবার চিহ্ন, ৭। পায়ে গাড়ীর চাকার দাগ, ৮। পুরুষাঙ্গে তিল, ৯। বাঘী অস্ত্র করার দাগ, ১০। জীবনবীমার কাগজে লিখিত চিহ্ন।

প্র—আপনি জানেন বাদী পক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও বিল্লুবাবু সাক্ষ্য দিয়েছেন? উ—হাঁ কাগজে পড়েছি। প্র—মিঃ চৌধুরী যখন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও বিল্লুবাবুকে জেরা করেছেন তখন খোঁজ খবর না নিয়েই জেরা করেন নি? উ—না, সেকথা বলতে চাই না। প্র—জয়দেবপুরে কুমারগণ বিলাতী কায়দায় থাকতেন বলতে চান? উ—একেবারে বিলাতী কায়দায় নয় তবে কতক পরিমাণে। প্র—মেজকুমার কাপড় জামা কোথায় পরতেন? উ—নীচে। প্র—যখন নীচে কাপড় জামা পরতেন তখন আপনি সেখানে কখনও থাকতেন কি? উ—হাঁ। প্র—কাপড় জামার জন্য বেয়ারা ছিল? উ—বেয়ারা কাপড় চোপড় নিয়ে আসত, উনি পরতেন, তবে বেয়ারা জুতোর ফিতে টিতে পরিয়ে দিত। প্র—মেজকুমার ট্রাউজার আপনার উপস্থিতিতে পরেছেন? উ—হাঁ। প্র—প্রর্ব্বদাই কি আপনার উপস্থিতে পরতেন? উ—সব সময়েই থাকতাম না। প্র—উত্তরপাড়ার উপেন মুখার্জ্জীর নাম করেছেন, তিনি কি আপনার মোকদ্দমার সাক্ষী? উ—দরকার হলে দিবেন। প্র—আমি বলছি আপনি আপনার স্বামীর মুখই শুধু ভুলেননি, তাঁর ধরণ ধারণ ভুলে গেছেন? উ—এ কখনও সম্ভবপর হয়! প্র—রাজবাড়ীতে বাড়াত বাথ রুম ছিল কি, যা সচারাচর ব্যবহার হতনা, অতিথি অভ্যাগত আসিলে ব্যবহার হত? উ—সে রকম বাথ রুম ছিল বলে মনে পড়েনা। প্র—মেজকুমার মঝে মাঝে যে বারান্দায় যেতেন আপনি বলেছেন সে বারান্দার উত্তর দিকে বাথ রুম ছিল? উ—হাঁ। প্র—আমি বলছি সেই বাথরুমই মেজকুমার ব্যবহার করতেন? উ—পায়খানা হিসাবে ব্যবহার করতেন। প্র—বড়কুমারের বাথরুমের নীচে মেজকুমারের বাথরুম ছিল, আপনি বলছেন, তাহাতে সর্ব্বদা তালা চাবি দেওয়া থাকত? উ—না। প্র—আপনি কোন অপরিচিত লোক, ষ্টেটের অফিসার কিম্বা বড়কুমারের সাম্‌নে বেরোতেন? উ—বড়কুমারের সঙ্গে কথা বলতাম না। বাড়ীর ভিতরে তাঁর সামনে বেরোতাম। শাশুড়ীর নিকট কর্ম্মচারীরা এলে, সেখানে আমরা যেতাম না। প্র—বিল্লুবাবুর কোন্ বছরে বিয়ে হয়েছিল মনে পড়ে? উ—১৮শে বৈশাখ ১৩১৫ সনে, তখন আমি উত্তরপাড়ায় ছিলাম। ১৯শে বৈশাখ সত্যবাবুর বিয়ে হয়েছিল। প্র—বিল্লুবাবুর যখন বিয়ের জন্য স্থলে যায় তখন তিন কুমারই জয়দেবপুর ছিলেন। একথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন? উ—মেজকুমার ছিলেন না জয়দেবপুরে এ আমি হলপ করে বলতে পারি। প্র—

দেখেছেন? উ—হাঁ, চিঠিপত্র দেখেছি, যেগুলি বড়রাণীর কাছে লিখতেন। প্র—মেজকুমারের বাংলা হাতের লেখা আপনার চেয়ে খারাপ ছিল না ভাল ছিল এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি? উ—আমার চেয়ে খুব ভালও ছিল না মন্দও ছিল না। প্র—আপনি বিয়ের পর যা বাংলা জানতেন তাতে সাহিত্যিক ভাষায় কি বাংলা লিখতে পারতেন, দাজ্জিলিংএ যাওয়ার আগ পর্য্যন্ত? উ—সাধারণ ভাষায় লিখতে পারতুম। প্র—বড়কুমারের চিঠি কি সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় লেখা দেখেছেন? উ—না, সাহিত্যিক ভাষায় দেখিনি। প্র—যে চিঠিগুলি দাখিল করেছেন যদি তা সত্য হয় তাহলে আপনার অনুপস্থিতিতে লেখা হয়েছে? উ—হাঁ। প্র—সেই চিঠিগুলি কার সামনে লিখিয়াছিলেন বলতে পারেন? উ—স্ত্রীর নিকট লিখিত চিঠি অন্যের উপস্থিতিতে না লিখাই সম্ভব। (এই সময় প্রভাবতীর নিকট মেজকুমারের লিখিত চিঠি দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জী প্রশ্ন করেন) বলুন তো এই লেখা আপনার লেখার চেয়ে ভাল কিনা? উ—আমার চেয়ে বেশী যে ভাল তা আমার মনে হয় না। প্র—আপনি কি বলছেন আপনার জাতীয় লেখা না অন্য জাতীয় লেখা? উ—এক জাতীয় লেখা বলে মনে হয়। এই সময় মেজরাণীর হাতের লেখা চিঠি দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জী প্রশ্ন করেন—ভালকরে বিচার করে দেখুন আপনার চেয়ে এই লেখা ভাল কিনা? উ— আমার তো মনে হয় এক জাতীয়ই।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি বিবাদিনীকে একখানা চিঠির ফটো দেখাইয়া প্রশ্ন করেন—রমেন্দ্র নামটার 'দ্র' এর শেষ টানটা কিছুদূর এসে তারপর সেটাকে লম্বা করে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন? উ—'দ' এর শেষ টানটা একটু লম্বা। প্র—আপনি দেখতে পাচ্ছেন "দ" এর শেষ টানটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানটায় তার মাঝখানে একটু সরু হয়েছে? উ—আমি বুঝতে পাচ্চি না। এই সময় মিঃ চাটার্জ্জী কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন—এখানে 'রমেন্দ্রের' 'দ' এর শেষ টানের মাঝখানে যেখানে ভাঙ্গা রহিয়াছে সেইখানে কালি দিয়া নষ্ট (temper) করা হইয়াছে, অথবা ইহা জাল হইতে পারে কিম্বা অন্যভাবে এই দাগ পড়িতে পারে। কেননা কোর্টে দাখিল হওয়ার পর এই চিঠির ফটো নেওয়া হয়েছিল, পূর্ব্বে এইরূপ দাগ থাকিলে ফটোতেও ঐরূপ উঠিত। ইহাতে মিঃ চৌধুরী বলেন—"আপনি কি এই বুঝাইতে চান যে ইহা আমাদের দ্বারা করা হইয়াছে?" মিঃ চাটার্জ্জী হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—নিতান্তই ছেলে

প্র—কেউ যদি বলে ৮ই মে ভোর বেলা তীব্র ব্যথার দরুণ মেজকুমারের অবস্থা খারাপ হয়েছিল এবং তিনি বিছানায় গড়াগড়ি যাইতেছিলেন—একথা সত্যি হবে? উ—ব্যথা সকালবেলা ছিল না। প্র—আপনি আজ পর্য্যন্ত জানেন কি যে আশু ডাক্তার হলপ করে এই কথাও কোর্টে বলেছেন? উ—জানি না। প্র—কেউ যদি বলে কুমার যেই ঘরে মারা গেছেন, সেই ঘরে আপনি রাত্রি ৯টার পর গেলেন, ইহার পূর্ব্বে আপনি তার পাশের ঘরে ছিলেন একথা কি সত্য হবে? উ—এ একটা ভুল কথা হবে। প্র—দার্জ্জিলিং যাওয়ার পূর্ব্বে আপনারা কুমারের চিকিৎসার জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন· সেই সময় আশু ডাক্তার সঙ্গে ছিলেন? উ—হঁা, আশু ডাক্তার কুমারের অসুখের কথা জানত। প্র—কেউ যদি বলে ডাঃ সর্ব্বাধিকারীকে আশু ডাঃ কুমারের কলিক পেনএর বিষয় কিছু বলেননি, একথা মানতে রাজি আছেন? উ—না। প্র—যদি আশু ডাক্তার মশায় বলেন ডাঃ সর্ব্বাধিকারীকে আমি বলি নাই কুমারের কলিক পেন্-এর কথা, একথা ঠিক হবে? উ—আমি বল্‌ব তিনি ভুলে গেছেন। প্র—আপনি আজ পর্য্যন্ত জানেন মানহানি মোকদ্দমায় আশু ডাক্তার হলপ করে এই কথা বলে গেছেন? উ—জানিনা। প্র—কেউ যদি বলেন, শুক্রবার দিন নিবারণ বাবু ষ্টেপ-এসাইডে যান্‌নি—একথা সত্য হবে?—উ—না। প্র—আপনি জানেন কি আশু ডাক্তার হলপ করে একথা বলে গেছেন? উ—জানিনা। প্র—আপনার কি এখন এই পজিশন যে এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি যা বলছেন তার সঙ্গে অন্য সাক্ষীর মিল হচ্ছেনা—তাহলে কি বুঝব আপনিই অভ্রান্ত আর সকলেই ভুল বলছেন? উ—অন্যে কে কি বল্‌ছেন জানিনা, তবে আমার স্বামীর ব্যারাম সম্বন্ধে আমি যা বলতে পারব অন্যে তা পারবেনা।

প্র—আপনি কি শাশুড়ীর আচার ব্যবহার অনুসরণ করতেন? উ—তিনি যা বলতেন তাই করতাম। প্র—আপনি কি সব সময়ই তাঁর দৈনিক আচার ব্যবহার অনুসরণ করতেন? উ—তখন তাঁর বয়স হয়েছিল, বিধবা হয়েছিলেন, সব আচরণ অনুসরণ করতাম না। প্র—৮ই মে রাত্রিতে আপনি শোকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, একথা ঠিক কি? উ—কুমার মারা যাওয়ার পরে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। প্র—মারা যাওয়ার আগে চিন্তায় অভিভূত হন নি? উ—না। প্র—বড়কুমারের মৃত্যুর কিছু আগে ব্রজলাল বাবু একখানা চিঠি নিয়ে এসেছিলেন, যা দেখে

এইরূপ গৃহানুরাগী লোক বলা যায় কিনা ? উ—গৃহানুরাগী বলা যায় না। প্র—আপনি যে চিঠিগুলি কোর্টে দাখিল করেছেন তা দেখে কি মনে হয় না আপনার স্বামীর জীবনের প্রধান চিন্তা ছিল 'স্ত্রী' ? এইরূপ মনে হয় কি ? উ—না ! প্র—আপনার স্বামী যে পত্নীবৎসল ছিল তাই কি আপনি জবানবন্দীতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়ে ছিলেন ? উ—না, সেই কথাতো আমি একবারও বলিনি। মিঃ চাটার্জ্জী তখন বলেন—যে চিঠিগুলো দাখিল করেছেন সেগুলি কোথা থেকে লেখা হয়েছিল এবং আপনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন। প্রথম চিঠিখানা দেখাইলে পরে বিবাদিনী বলেন—এই চিঠিখানা ঢাকা থেকে জয়দেবপুর পাঠিয়েছিলেন, তারপর পর পর ৫ খানা চিঠি দেখাইলে বিবাদিনী বলেন, "কুমার ঢাকা থেকে লিখেছিলেন আমি জয়দেবপুর ছিলাম।" তারপর একখানা চিঠি দেখাইলে বিবাদিনী বলেন, জয়দেবপুর থেকে কলিকাতা আমার নিকট লিখেছিলেন। চিঠি ডাকে গিয়েছিল। তৎপরবর্ত্তী চিঠি কুমার জয়দেবপুর থেকে আমার নিকট উত্তরপাড়া পাঠিয়েছিলেন, এন্টনি সাহেবের মারফতে তার হাত দিয়া। প্র—প্রভাবতী দেবীর চিঠিখানা ডাকে না হাতে পাঠানো হয়েছিল জানেন ?—উ—ডাকেই পাঠানো হয়েছিল। প্র—মেজ কুমার কি হামেশাই জয়দেবপুর থেকে ঢাকায় আসতেন ? উ—দরকার হলে মাঝে মাঝে আসতেন। প্র—ঢাকা আসলে সচরাচর ক'দিন থাকতেন ? উত্তর—কোনবার যেইদিন আসতেন সেইদিনই চলে যেতেন, আবার কোনবার ২।৩।৪ দিনও থাকতেন। প্র—যখনই কুমার এখানে থাকতেন তখনই আপনিও চিঠি লিখতেন, মেজকুমারও চিঠি লিখতেন ? উ—হাঁ। প্র—চিঠিগুলি পেয়েই কি এন্‌ভেলাপ ফেলে দিতেন ? পঙ্কজ বাবুকে যখন চিঠিগুলি দিলেন তখন কি লেপাফা ছিল ? উ—না। প্র—পঙ্কজ বাবুকে কোন বছর ঐ চিঠিগুলি দিয়েছিলেন ? উ—বছর চারি হবে। প্র—আপনার বর্ণনা লিখবার আগে না পরে ? উ—সেটা আমার ঠিক মনে নাই। প্র—আপনি এই মোকদ্দমার সমন পেয়েছিলেন ? উ—মনে নাই। প্র—এই মোকদ্দমা রুজুর কত পরে পঙ্কজ বাবুকে চিঠিগুলি দিয়েছিলেন বলতে পারেন ? উ—কিছুদিন পর। প্র—ঢাকা থেকে জয়দেবপুর চিঠিখানা পেয়েই এন্‌ভেলাপ্‌খানা ছিঁড়ে ফেলেছেন ?—হাঁ। প্র—প্রভাবতী দেবীর চিঠি এন্‌ভেলাপ ছাড়া পেয়েছিলেন ? উ—আমার কাছে যখন দিল, এন্‌ভেলাপ ছাড়াই ছিল। আমি বছর দেড়েক আগে ঐ চিঠি পঙ্কজ বাবুকে দিয়াছিলাম। প্র—আপনি তাকে

যে প্রতিবাদ হয়নি এমন কথা নয়—তবে হলেও হতে পারে। প্র—আপনি কি বলেন, বাদী যদি প্রকৃত কুমার হত তাহলে ১৯ বৎসর পরে দেখলে তাকে চিনতে পারতেন? উ—যদি প্রকৃতই ফিরে আসা সম্ভব হত তা হলে বয়সেব দরুণ মোটা হতে পারতেন রং ময়লা হত, কিন্তু তাহার মুখের কাট বদলাতো না।

প্র—৪০ বৎসর বয়সে মুখের চামড়া কি ঢিলা হয় না? উ—৫০।৫৫ বৎসরে হয় ৪০ বৎসর বয়সে বিশেষ কিছু হয় না। প্র—অনেক সময় বয়সের দরুণ গালের ও পরিবর্ত্তন হয়? উ—দাঁত পড়ে গেলে গাল বসে যায়। প্র—মাংস হলে মোটাও হয়! উ—হাঁ। প্র—১৫ বৎসর পরে গালের পরিবর্ত্তন অনেক কারণে হতে পারে? উ—হাঁ তবে গঠনের পরিবর্ত্তন হয় না (এই সময়ে বাদীপক্ষ হইতে দাখিল করা কুমারের আর একজনের সঙ্গে তোলা একখানা গ্রুপ ফটো এবং অপর একটি ফটো দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি প্রশ্ন করেন—দুটো মুখ কি বিভিন্ন রকম দেখছেন না একরকমই দেখছেন? উ—নাক টাক একরকম কিন্তু মুখ একরকম নয়। প্র—দুটো দেখেই বুঝতে পারছেন এক রকম ফটো? উ—তা আমি বলতে পারব না। প্র—আপনাকে বলছি, আপান ও আপনার ভাই নিশ্চিত জানতেন যে বাদী মেজকুমার কিন্তু আপনাদের যদি কিছু মাত্র সন্দেহ থাকত যে বাদী মেজকুমার নন তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বোর্ডকে লিখতেন খোলা তদন্তের জন্য। উ—আমি এবং আমার ভাই জানতুম এ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বোর্ডকে আমি আমার ভাই লিখেছে, আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি। প্র—আপনি বোর্ডকে কখনও বলেছেন, একটা খোলা তদন্ত করতে? উ—না। প্র—আপনি কি বলবেন আপনার ভাই বোর্ডকে বলেছে একটা খোলা তদন্ত করতে? উ—ভাই কি করেছে জানিনা। প্র—আপনি এবং আমার মক্কেল পাশাপাশি জজ সাহেবের নিকট বসবেন, বসে আপনি বিবাহিত জীবনের যে কোন ঘটনার প্রশ্ন করবেন, তিনি উত্তর দিবেন—আপনি রাজি আছেন? উ—আমি এর কোন আবশ্যকতা বোধ করি না, তবে যদি জজ সাহেব বলেন করিতে পারি। [এই সময় মিঃ চাটার্জ্জি কোর্টকে অনুরোধ করেন আপনি এই বিষয়ে একটা তারিখ নির্দ্দিষ্ট করে দিন। কোর্ট বলেন আপনি এ বিষয়ে একটা লিখিত দরখাস্ত দাখিল করুন, তাহার উপর আমি আমার মন্তব্য প্রকাশ করিব]।

প্র—এটা সত্য কিনা বাদী আসার পর দার্জ্জিলিং এর লুইস জুবিলী স্যানি-

দাঁড়াইয়া তাঁহার আপত্তির সমর্থনে ব্যস্ততার সহিত কাগজপত্র ঘাটিতে ছিলেন, তাহাতে মিঃ চৌধুরী বলেন—"আপনি লাফিয়ে উঠলেন কেন?' মিঃ চাটার্জ্জী—"আপনার ভদ্র ভাষা ব্যবহার করা উচিত। "লাফিয়ে ওঠা" বলছেন কেন?" মিঃ চৌধুরী—"আপনি আগাগোড়াই ধমকাচ্ছেন কেন?" মিঃ চাটার্জ্জী—"আপনি একজন মহিলার সামনে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলছেন।" You are making a fool of yourself before a lady.)

প্র—আপনি যে বলেচেন আপনার স্বামী আপনার বোনের কাছে চিঠি লিখতেন,—"বোনের বলতে আপনি কি বোঝাতে চান? (মিঃ চাটার্জ্জী এই প্রশ্নে আপত্তি করেন) উ—প্রভা ও আমার মেজ মামার দুই মেয়ে। (মিঃ চ্যাটার্জ্জির আপত্তিতে কোর্ট তাঁহাকে বলেন—এই সম্বন্ধে আপনি পুনরায় জেরা করিতে পারেন। সাক্ষী "বোন" বল্‌তে সহোদরা বোনই বলেছেন এবং কোর্ট ও সিষ্টার (sister) বলে লিখেছেন।) রায় বাহাদুর—না, সে রকম লেখা হয় নি বা সে রকম অর্থে বলাও হয়নি। মিঃ চাটার্জ্জি—রায় বাহাদুর ভুল কচ্ছেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জি এ কি! যখনই আমি রায় বাহাদুরকে কিছু বলি তখনই তার ছেলে আমাকে আক্রমণ করে! মিঃ পঙ্কজ ঘোষ—আমি কেবল রায় বাহাদুরের পুত্র হিসাবেই আপত্তি কচ্ছি না,—মিঃ চ্যাটার্জ্জির এরূপ বলা অন্যায়। তিনি বার বার এমনিই করে আসছেন, এখন আর সহ্য করতে পারি না। তিনি কৌঁসুলী বলেই কি যা তা বলবেন? তিনি কে? তিনি কেউ না। (He is nobody) মিঃ চাটার্জ্জি—এমনিই করেই আমাকে আক্রমণ করা হয়। আমি দেখেছি রায় বাহাদুর ও তাঁর পরিবারবর্গ আমাকে আক্রমণ করবার জন্য বদ্ধপরিকর। এ অবস্থায় আমি জেরা করতে রাজী নই। আর আমি এখানে আসতেও ইচ্ছা করি না। কারণ, রায়বাহাদুরকে কিছু বললেই তাঁর দুই ছেলে আমাকে অপমান করে—এ সহ্য আর করা যায় না। আমি এক মুহূর্ত্তে ওকে ছিঁড়ে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলতে পারি। (break him into pieces) মিঃ পঙ্কজ ঘোষ—আমিও আপনাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারি। মিঃ চাটার্জ্জি—বেশ বেশ, এস চল বাইরে যাই (come along, let us go outside) বাইরে চলুন—এখানকার যে কেউ একজন একজন করে বাইরে আসুন, আমি সকলকে ছিড়ে ফেলবো। দেখুন পারি কিনা।

আলতার বয়স কত। উ—আমার ছোট বোনের বছর দুই ছোট—আমার থেকে বছর পাঁচের ছোট।

কোর্ট প্রশ্ন করেন—আলতা সাবিত্রী আপনার মেজমামার মেয়ে? উ—হাঁ। প্র—আলতা সাবিত্রী হতে ক'বছর ছোট। উ—প্রভার থেকে আলতা দু'বছরের ছোট। প্র—আলতার বিয়ে হল কবে? উ—১৩১৩ সনে। প্র—প্রভা কবে মারা গেছেন? উ—বছর ছয় হবে। প্র—আপনার দার্জ্জিলিং-এর বাসায় বারান্দার ভিতরের সিঁড়িটা কি কাঠের ছিল? উ—হাঁ। প্র—আর ঢালু রাস্তায় কোন সিমেণ্ট করা নাই? উ—ঢালু রাস্তা ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে কোন সিঁড়ি নাই। প্র—যে ঘরে মেজকুমার মেজেতে বিছান করেছিলেন সেই ঘরে আর বসবার ঘরের ভিতর কোন দরজা ছিল কি? উ—দরজা ছিল খোলা হত না। কুমার যখন ওঘরে ছিলেন তখন দরজা বন্ধ থাকত ডাক্তার বারান্দা দিয়ে ঘুরে আসত। অতঃপর রাণী বিভাবতী দেবীর জেরা শেষ হয়।

স্থানাভাবে আমরা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে বাধ্য হইলাম।

জেরার উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন যে মেজকুমার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কথা কহিয়াছিলেন। সাক্ষী মেজকুমারকে ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধাও করিতেন। মেজকুমারের শেষ কথা সাক্ষীর মনে নাই। এই মামলার শুনানি আরম্ভ হওয়ার পরে সাক্ষী শুনিয়াছেন যে, সত্যবাবুর ডাকনাম আল্লাপদ। সাক্ষী পূর্ব্বে ইহা জানিতেন না। ৭ই রাত্রিতে কুমারের যখন বাথা হইয়াছিল তখন মেজরাণী অথবা সত্যবাবু অথবা সাক্ষী অথবা অন্য কেহ কুমারের ঘরে ছিলেন কি না সাক্ষীর মনে নাই। ৭ই প্রাতঃকালের ঘটনার কথা সাক্ষীর মনে নাই। কিন্তু দুপুর বেলায় যে মেজকুমারের জ্বর হইয়াছিল, তাহা সাক্ষীর মনে আছে। তখন মেজরাণী বা অন্য কোন লোক ক্যালভার্টকে ডাকিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিনা সাক্ষীর তাহা মনে নাই। তখন মেজরাণী পতিপরায়ণা ছিলেন। প্র—আমি বলিতেছি মানহানির মামলায় আপনি বলিয়াছিলেন যে, কুমারের মৃত্যু আসন্ন, এই কারণে কুমারের লোকেরা বাহিরের লোকজন ডাকিতে গিয়াছিল, সুতরাং সন্ধ্যার সময় বহু লোক ষ্টেপ-এসাইডে সমবেত হইয়াছিল? উ—না।

প্র—ডাঃ ক্যালভার্ট বিলিয়ারী কলিকের জন্য ঔষধ দেন। "তিনি নিজে প্রেসক্রিপ্‌শন লেখেন, তাঁহার নির্দ্দেশ মত আমি ২।১ খানা প্রেসক্রিপ্‌শন লিখেছিলাম" এই কথা আপনি বলেছিলেন? উ—হাঁ। প্র—বীরেনবাবুর কাছে বলেছিলেন কিনা সেদিন ১২।১ টার সময় নিবারণ সেন কুমারকে দেখিতে আসিয়াছিলেন? ক্যালভার্ট যখন ২টার সময় আসিলেন তখন নিবারণ সেন সেখানে ছিলেন? উ—হাঁ। প্র—এস, সি, ঘোষের কাছে বলেছেন—৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি বিলিয়ারী কলিকে ভুগিতেছিলেন ইহাতে অসহ্য যন্ত্রণা ও পাতলা বাহ্য হইত। একবার বাহ্যের সঙ্গে রক্ত পড়িয়াছিল? উ—হাঁ।

প্র—বিলিয়ারী কলিকে কি করে রক্ত দাস্ত হয় তাহা আজ বলিতে পারিবেন কি? উ—না। প্র—৪।৫ বৎসর আগে যে বল্লেন তাহা তো লিউকিসের চিকিৎসার সময়ের কথা? উ—হাঁ, তবে আমি জানি না। প্র—টিপটেনের বোতলে যে লেখা আছে এমেলিশাস ডিস্‌পেপিসিয়া ইহা কি বিলিয়ারী কলিক? উ—না। প্র—বিলিয়ারী কলিকের রক্তদাস্ত হওয়ার উদাহরণ যখন দিতে বলেছিলাম তখন কি মেজকুমারের কথা ভুলে গিয়াছিলেন? উ—হাঁ। প্র—আপনি কখনো রক্তদাস্তের জন্য মেজকুমারের চিকিৎসা করেছেন? উ—না। প্র—দার্জ্জিলিংএ যাইবার পূর্ব্বে কুমারের যখন রক্তদাস্ত হয় তখন আমি

জয়দেবপুরে ছিলাম।" প্র—দার্জ্জিলিং যাওয়ার কত বৎসর পূর্ব্বে উহা হয়েছিল? উ—মনে নাই। আমি তখন কুমারের চিকিৎসা করি নাই, বা তাহার আলোচনা করিতাম না।

প্র—যদি রক্ত অন্ত্রে পড়িয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বের হয়ে যায় তবে তাহা অবশ্য 'কাল রং' হবে, তাহা জানেন কি? উ—আমি জানি না। আমি জানি না ঐরূপে রক্ত আসিলে তাহার সঙ্গে অন্য কিছু মিশে কি না। জেরার উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন—কুমারের ঐ অসুখের সময় রাণী বিলাসমণি জীবিত ছিলেন। একবার না বেশীবার রক্ত পড়েছিল মনে নাই। তখন শীতকাল কি গ্রীষ্মকাল ছিল তাহা মনে পড়ে না। আমার পিতা আমাকে ডাকিয়া রক্ত দেখাইলেন না 'আশু আমার রক্ত পড়েছে' বলে কুমারই আমাকে ডেকে দেখাইলেন মনে নাই। প্র—চোখ বুজলে আপনি কি দেখেন—খালি রক্ত? উ—হাঁ, রক্ত দেখি, মনে পড়ে তাঁর রক্ত পড়ছে আমি দাঁড়িয়ে আছি। প্র—(একটা পোষ্টকার্ডে সই দেখাইয়া) এটা কি আপনার সই? উ—হাঁ। "প্রণত; আশুতোষ দাসগুপ্ত" লেখা আমার হাতের।

প্র—৪ঠা মে (আত্ম পরিচয়ের দিন) আপনি বাড়ী ছিলেন? উ—ছিলাম। জেরার উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন—সেদিন আত্ম পরিচয়ের কথা শুনিয়াছি কিনা মনে নাই, পরদিন শুনিয়াছি। তখন বাদী "অলকা ঝির" নাম করিয়াছেন ইহা শুনিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। প্র—আপনার কানে ইহা গিয়াছিল কি না যে আত্ম-পরিচয়ের দিন তিনি বলেছিলেন—"আমি মধ্যমকুমার, নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায়।" উ—মনে নাই। "প্রত্যহ ৪।৫ হাজার করিয়া লোক সাধুকে আসিয়া দেখিতেছে" ইহা শুনিয়াছিলাম কি না—মনে নাই। কেহ কেহ আসিয়া নজর দিতেছে একথা ৫ তারিখে শুনেছিলান কি না মনে নাই। প্র—৪।৫ তারিখে আপানার অভিমত ছিল কি না "প্রত্যেক নরনারীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে মধ্যমকুমারই আসিয়াছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই?" উ—মনে নাই। প্র—প্রজারা দুই লাখ টাকা চাঁদা তুলিয়া দিবে একথা ৫ই তারিখে জানিতেন কি? উ—মনে নাই। প্র—৫ই তারিখে এবিষয়ে হৈ চৈ হইয়াছিল তাহা মনে আছে? উ—মনে নাই। প্র—এই কথা সত্য হইবে কি না? উ–বলিতে পারিব না। প্র—আত্মপরিচয়ের পর এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাদীকে দেখিতে যাওয়ার আগে বলেছিলেন কি না যে ইনি "মধ্যমকুমার নয়"? উ—আগে বলি নাই। আত্মপরিচয়ের পর বলিয়াছিলাম যে, তিনি মধ্যমকুমার

প্র—আপনি কি জানেন যে বাদী বলিয়াছেন বিভাবতীর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সংলগ্ন আঙ্গুলটা অস্বাভাবিক বড় এবং আরও অন্যান্য নানাস্থানে চিহ্নও আছে? উ—হাঁ। প্র—আপনি কি জানেন যে মিঃ এ, এন, চৌধুরী আমার মক্কেলকে বলিয়াছেন যে বিভাবতী দেবীর শরীরে ঐ সব চিহ্ন নাই? উ—চিহ্ন সবগুলি নাই, আমি একটা চিহ্নের কথা শুনিয়াছি।

প্র—আপনি কি জানেন যে উকিলদের এই বিষয়ে বলিবার জন্য তিনি আপনাকে খবর দিয়াছেন? উ—আমি এ বিষয় পড়িয়াছি। প্র—আপনি এ বিষয়ে কাহাকেও কোন উপদেশ দিয়াছেন? উ—দিয়াছি। হয় আমি লিখিয়াছিলাম অথবা এ বিষয়ে মুখে বলিয়াছিলাম। প্র—আমি বলছি যে আপনাদের আশা ছিল যে আপনার বা বিভাবতী দেবীর সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিতে হইবে না। উ—না। প্র—আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন যে যদি তিনি সাক্ষ্য দিতে না আসিতেন তবে তাহার চক্ষুর নীচের পাতা যে বসা আর পায়ের আঙ্গুল যে বড় তাহা জজ সাহেব দেখিতে পাইতেন না? উ—ঐ গুলি কোন চিহ্ন নয়। প্র—আপনি কি জানেন যে বিভাবতী দেবীর যে সন্তান সম্ভাবনা হইয়াছিল সে বিষয়ে মিঃ চৌধুরী বিল্লুবাবুকে পুনরায় ডাকাইয়া জেরা করিয়াছিলেন? উ—আমি জানিতাম। প্র—আপনি কি জানেন কেন মিঃ চৌধুরী ঐ বিষয়ে বিল্লুবাবুকে জেরা করিয়াছিলেন? উ—আমি জানিনা। এ বিষয়ে আমি কোন পরামর্শ দেই নাই। সম্ভবতঃ বিভাবতীই ঐ বিষয় পরামর্শ দিয়াছিল। প্র—ইহা কি সত্য নয় যে আপনি এবং আপনার পক্ষের অন্য লোকে বাদীর বড় পায়ের কথা বলিয়াছেন? উ—আমি বলি নাই। বাদীর পা দেখিবার সুযোগ পর্য্যন্ত আমার হয় নাই।

প্র—এস পি, ঘোষালকে মিঃ চৌধুরী উপদেশ ছাড়া জেরা করিয়াছেন, এ কথা বলিবেন কি? উ—না। যখন ঘোষালের জেরা হয় তখন আমি কলিকাতায় ছিলাম। প্র—আপনি কি জানেন যে মিঃ চৌধুরী ঘোষালকে জেরা করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে মেজকুমারের পা মেয়েদের মত ছোট ছিল এবং তিনি ৬নং জুতা পরিতেন? উ—জানিতে পারি। মেজকুমারের পা যে ছোট ছিল ইহা সত্য কথা। মেজকুমার ৬নং জুতা পরিতেন তাহা আমি জানি না। প্র—মেজকুমার ৬নং জুতা পরিতেন তাহা আজই কি প্রথম শুনিলেন? উ—এ বিষয়ে কোনও আলোচনা পূর্ব্বেও শুনিয়া থাকিতে পারি। ঐ সময়েই অথবা পরেও শুনিতে পারি। প্র—ঐ সময়ে মানে কি? উ—ঘোষালের

বৎসর পর্য্যন্ত তাহার ৭০০০ টাকা মাসিক ভাতা ছিল। ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেটের মোট আয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা হইবে। ১৯১৪ সালে সাক্ষীর নামে ৬০ হাজার টাকা মূল্যে ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী ক্রয় করা হয়। সাক্ষী ২০ হাজার টাকা দেন এবং অবশিষ্ট ৪০ হাজার টাকা বিভাবতী দেয়।

প্র—আপনি কি অবগত আছেন যে, আপনি এখানে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাতে আপনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ৭ই সন্ধ্যাকালে কুমারের প্রথম আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের লক্ষণ দেখা যায়। উ ইহা আদালতের বিচার্য্য বিষয়।

প্র—আপনি কি অবগত আছেন আপনি এখানে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে আপনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে আপনি ক্যালভার্টের নিকট এমন সব বিষয় গোপন করিয়াছেন, যাহা গোপন রাখা না হইলে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ হইয়াছে এইরূপ সন্দেহ তিনি করিতে পারিতেন? উ—কোর্ট তাহা বিচার করিবেন। দার্জ্জিলিং-এর ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষী যাহা বর্ণনা দিয়াছেন, সাক্ষীর রোজনামচার দ্বারা উহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে সাক্ষী তাহা মনে করেন না। প্র—রিক্সা ভিন্ন বেলা ২টার সময় শ্মশান ক্ষেত্র হইতে ষ্টেপ এসাইডে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব ছিল? উ—রিক্সা করিয়া যাই নাই। প্র—আপনি যদি দিনে ২টার সময় ষ্টেপ এসাইডে পৌছিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখন শবদাহ শেষ হইয়াছিল? উ—তাহার ১ঘণ্টা পূর্ব্বে। প্র—আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন যে, আপনার জবানবন্দীতে শব সংকারের যে সময়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এখন তাহা অনেক আগে হইয়াছিল বলিয়া বলিতেছেন? উ—আমার ধারণা ছিল যে, অপরাহ্নে শবদাহ শেষ হইয়া থাকিবে।

প্র—বেলা ১টার মধ্যে যদি শবদাহ শেষ হইয়া থাকে তাহা হইলে শবদাহ সম্পর্কে নিশ্চয়ই কোন অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। উ-শবদাহ ১টার মধ্যে শেষ হইয়াছিল, একথা আমি কখনও বলি নাই। শব সংকারের সময় পৌরোহিত্য কে করেছিল তাহা আমার স্মরণ নাই। স্থানীয় কয়েক জন লোক মন্ত্র পাঠ করে।

সাক্ষী বলেন, বিভার কখনও ফিট হইয়াছিল কিনা তাহা এখন তাঁর স্মরণ নাই। সাক্ষী জানেন যে বিভাবতী তাঁহার ফিট হইবার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। প্র—আপনি কি বুঝিতে পারেন যে, যদি বিভাবতী দেবীর ফিট হইয়া থাকে, তবে আপনার বক্তব্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়? উ—আমার মনে

ছিল, রাজহাঁস ছিল, উটপাখী একজোড়া, ধনেশ পাখী ছিল, একজোড়া তিতির পাখী ছিল, কেনারী পাখী ছিল !

আমাদের Estateএর ও আমার নিজের হাতী ছিল। আমার নিজের চারিটা হাতী ছিল। আমার প্রধান মাহুত দিলবর ছিল। Estate-এর ১৪।১৫টা হাতী ছিল, ৪০।৫০টা ঘোড়া ছিল। অনেক গাড়ী ছিল, একটা রূপার গাড়ী ছিল। ব্রুহাম, টম্‌টম্ ছিল। আমি হাতী চড়িতে পারিতাম, কানে ধরিয়া শুঁড় দিয়া উঠিতাম, আমি ঘোড়া চড়িতে পারিতাম : আমি গাড়ী চালাইতে পারিতাম, আমি সর্বদা নীচ লোকের সাথে—যথা সহিস, কোচয়ান ইত্যাদির সাথে শীকার করিতে যাইতাম। বাঘ, ভল্লুক, হরিণ শিকার করিয়াছি ; অনুকূল ঘোষ মাষ্টার ছিল আর একজন ছিল নাম মনে নাই। তার বাড়ী পশ্চিমবঙ্গে। Westen সাহেব মাষ্টার ছিল। তাহার কাছে কিছু শিখি নাই। তারপরে সে ঘোড়া হাতীর ম্যানেজার ছিল। সে আমাদের চেয়ে ঘোড়া হাতী ভাল manage করিতে পারিত। আমি Collegiate school-এ ১০।১৫ দিন পড়িয়াছিলাম। নিজেদের Camp ছিল। সেখানে চা বিস্কুট খাইতাম। জয়দেবপুরে Polo ground ছিল। সেই জায়গা পরিষ্কার করার সময় সেখানে বড় বড় গাছ ছিল, তালগাছ প্রভৃতি ছিল, আমি ও ছোট ভাই Polo খেলিতাম। বড় ভাই খেলে নাই। আমি ভোরে চা খাইয়া হাতী, ঘোড়া দেখিতাম। ঘোড়ার দানাটানা দলামলা ইত্যাদি দেখিতাম। হাতীকে স্নান করাইতাম ও খাওয়াইতাম। তারপর চিড়িয়াখানায় বাঘ, ভল্লুক, হরিণ ইত্যাদিকে খাওয়া দিতাম। এই সমস্ত ব্যাপারে ২।৩টা বাজিত, তারপর স্নান করিয়া খাইতাম। তারপর কখনও শিকারে যাইতাম, কখনও হাতীতে ঘুরে বেড়াইতাম। এই রকম করিয়া সন্ধ্যা ৬টায় বাড়ী ফিরিতাম। বাড়ী ফিরিয়া তাস পাশা খেলিতাম, তারপর খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। আমি একবার লর্ড কিচেনার সাহেবের সাথে শীকারে গিয়েছিলাম, দার্জ্জিলিং যাওয়ার দেড়মাস আগে। Lord Kitchner এক হাতীতে যান, আমি ভিন্ন হাতীতে গিয়াছিলাম। দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগে তিন ভাই কলিকাতায় গিয়াছি। বাবার মৃত্যুর পর আমরা কলিকাতায় বড় দিনের সময় যাইতাম। আমার শরীর অনুযায়ী আমার পা ছোট, আমার পা চিরকালই ছোট আছে।

আমার মার হাত পা ছোট ছিল। আমাদের রাজপরিবারের মধ্যে মেজ বোনের, ছোট ভাইর, বদ্ধুর হাত পা ছোট ছিল। বুদ্ধু জ্যোতির্ম্ময়ীর ছেলে।

দাগ আছে। (Shown to the Court) আমার সিফিলিস্ হইয়াছিল, দার্জ্জিলিং যাওয়ার ৪।৫ বৎসর আগে হয়। মেয়ে মানুষ হইতে এই রোগ হয়। এই অসুখ আমার লিঙ্গে হয়। ত্রৈলক্য ডাক্তার এই অসুখ চিকিৎসা করে। বাড়ীর লোকেরা এই অসুখ জানিত, ঐ স্থানে ঔষধ লাগাইত দুইজন, বোচা ও নৈসা চাকর। আমার লিঙ্গে একটা তিল আছে। লিঙ্গের চামড়ায় তিল আছে, লিঙ্গের অসুখ সারিতে ২।১ মাস লাগে। তারপর আমার বাগী হয়, বাম দিকে। লিঙ্গের অসুখের ১ মাস পরে বাগী হয়। ডাক্তার দেখে, তাহা কাটান হয়। এলাহী ডাক্তার বাঘিটা অস্ত্র করে। বাগীর অস্ত্রের চিহ্ন আছে। ঘা শুকাইয়া ছিল, তারপর পা ও হাতে সিফিলিসের ঘা হইয়াছিল। সিফিলিসের দাগ হাতে পায়ে আছে, (Shown to the Court).

আমাব পিতার মৃত্যুর পর আমার মা Estateএর charge নিয়াছিলেন, আমার বাবা মাকে trustee করিয়া গিয়াছে, তখন আমাদের Estateএ রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ ম্যানেজার ছিল। মায়ের আমলে তিনি dismissed হন। মা তাহাকে ডিসমিস্ কবিয়াছিলেন। অনেক টাকা ভাঙ্গিয়াছিল। এই জন্য dismissed (ডিসমিস্) হন।

তিনি কাগজ-পত্র পুষ্করিণীর মধ্যে ও কিছুটা কূয়া-পায়খানায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যান। পুষ্করিণী ও কূয়া-পায়খানার কাগজপত্র সম্বন্ধে আমি জানি। আমার হুকুমে উঠান হয়। জালওয়ালা আনিয়া জাল খেও দিয়া ৭।৮ বস্তা কাগজ পুকুর হইতে উঠান হয়। যখন কূয়া-পায়খানা হইতে কাগজ উঠান হইয়াছিল তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কূয়া-পায়খানার উপরে খের ছিল। খের তোলা হইলে দেখা যায় খাতাপত্র। তারপরে টেটা মারিয়া কাগজের বস্তা তোলা হয়। পায়খানায় ময়লা ছিল বলিয়া টেটা দিয়া তোলা হয়। আমরা টাকা ভাঙ্গতির জন্য কালীপ্রসন্নের নামে ১০।১১ লক্ষ টাকার নালিশ করি। এই মোকদ্দমা ডিক্রি হইয়াছিল। ডিক্রি হওয়ার আগে কালীপ্রসন্ন ঘোষের সাথে ঢাকা নলগোলা আমার বাসায় দেখা হয়। তখন সেখানে আমার বড় ভাই ও ছোট উপস্থিত ছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ আমাদের বলিল, "আমি পুরাণ কর্ম্মচারী, মাকে বলয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও।" আমাদের কাছ থেকে কালীপ্রসন্ন ঘোষ একটা চিঠি নিয়া আসে। তাহাতে আমরা দস্তখত করিয়া সেই চিঠি জয়দেবপুর মার নিকট পাঠাইয়া দিই। ৫০০০০৲ টাকায় আপোষ ডিক্রি হয়।

দার্জ্জিলিং বাওয়ার জন্য আনাই। তিনি দার্জ্জিলিং যান নাই। কারণ সত্যবাবু বলিল যে মুকুন্দইত আছে, তাহার যাইবার কোন কাজ নাই। দার্জ্জিলিং যাইয়া শরীর ভালই ছিল। ১৪।১৫ দিন পর আমার অসুখ হয়। রাত্রে পেট ফাঁপা ছিল। তার পরদিন আশু ডাক্তারকে কইলাম (বলিয়াছিলাম)। আশু ডাক্তার ভোরে একজন সাহেব ডাক্তার আনে। সাহেব ডাক্তার আমাকে ঔষধ দিয়াছিল। সেই ঔষধ আমি খাইয়াছিলাম। তার পরের দিনও সাহেব ডাক্তারের ঔষধ খাই। তাহাতে কোনও উপকার হয় নাই। তার পরে আশু ডাক্তার রাত্রে ঔষধ দিয়াছিল, ঔষধটা কাচের গ্লাসে করিয়া দিল। এই ঔষধ খাইয়া আমার কোন উপকার হয় নাই। বুক জ্বালা করিয়াছিল, বমি হইয়াছিল। শরীর ছট ফট করিয়াছিল। এই সব আশু ডাক্তার আমাকে ঔষধ খাওরাইবার ৩।৪ ঘণ্টা পরে হয়। চিৎকার (চীৎকার, পাড়তে লাগলাম। সেই রাত্রে আর কোন ডাক্তার আসে নাই। তার পরদিন আমার রক্ত বাহ্যি হইতে লাগিল। শরীর খুব দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তারপর আমি অজ্ঞান হইয়া গেলাম। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়া পর্য্যন্ত কোন ডাক্তার আসিয়াছিল কিনা জানি না। তার পরে জ্ঞান হইয়াছিল। তখন আমি পাহাড়ে জঙ্গলে। তখন আমি খাটিয়ার মধ্যে শুইয়া আছি। খাটিয়া মাটীর উপর ছিল, উপরে টীনের ছাপরা, সেখানে ৪ জন সন্ন্যাসী ছিল। আমার জ্ঞান হইলে আমি বলিলাম, "কোথায় আসিলাম আমি?" সন্ন্যাসীরা বলিল, "তোমার শরীর দুর্ব্বল, কথা কইও না" এই কথা তাহারা হিন্দিতে বলিয়াছিল। তখন আমি হিন্দি বুঝিতাম। আমার বাড়ীর সহিস, কোচোয়ান, দারওয়ান, মাহুতের কাছে হিন্দি শিখিয়াছি। তারপরে আমি কোন কথা কই নাই।

আমি ছাপরায় ১৫।১৬ দিন ছিলাম। তখন সন্ন্যাসীদের সাথে আমার কোন কথা হয় নাই। ১৫।১৬ দিন পরে আমি সেখান হইতে চলিয়া যাই। ঐ ৪টী সন্ন্যাসীদের সাথে যাই, হাটিয়া গেছি ও Train এ গেছি ; তার পরের কথা আমার মনে আছে যে আমি কাশীতে গেছি। কাশী অশীঘাটে ছিলাম। তখনও ঐ ৪টী সন্ন্যাসী সাথে ছিল। অশীঘাটে সাধুর আশ্রমে ছিলাম। সেখানে আরও লোকের সঙ্গে দেখা হয়। বাঙ্গালী ও পশ্চিমা সাধুর সাথে দেখা হইয়াছিল। বাঙ্গালী সাধু দুই জনের সাথে কথা হইয়াছিল। তাহাদের সাথে বাঙ্গালা, হিন্দি সাধুর সাথে হিন্দিতেই কথা হইয়াছিল। ঐ সাধু ৪ জনের সাথে আমার কথাবার্ত্তা হিন্দিতে হইয়াছিল।

সাথে আমার ২।৩ দিন কথা হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলিতেন "মেজ কুমার।" তিনি আমাকে ২।৩ বার কাশীমপুর লইতে চাহিয়াছিলেন।

তিনি আমাকে মেজ কুমার বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। আমাকে বলিলে আমি কাশীমপুর trainএ গিয়াছিলাম। সঙ্গে ভুলু ছিল। ভুলুই অতুলপ্রসাদ রায়। Trainএ জয়দেবপুর গেলাম, সেখান হইতে হাতীতে কাশীমপুর গেলাম। দার্জ্জিলিং যাওয়ার পূর্ব্বে সারদা বাবু ও ভুলুর সাথে বহু চিনা ছিল। সেখানে ৫।৬ দিন ছিলাম। সেখানে খাওয়া দাওয়া করিয়াছি। তখন সেখানে সারদা, তার বড় ও ছোট ভাইয়ের ছেলেরা ছিল। অতুল সারদা বাবুর বড় ভাইয়ের ছেলে। যখন খাওয়া করি তখন অতুলও ছিল। অতুলের পিতার নাম অন্নদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী। আমার জিহ্বা ভার থাকায় মাঝে মাঝে কথা বাহির হয় না। আমার খাওয়ার সময় খাওয়ার ঢং দেখিয়া সারদাবাবু বলিয়াছিলেন এ মধ্যম কুমার, মধ্যম কুমারও এইভাবে খাইত। তর্জ্জনী উঠাইয়া সাক্ষী বলেন—আমি বরাবরই এইভাবে খাইয়াছি। দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগে আমি অনেকবার সারদা ও অতুলের সাথে খাইয়াছি, আমার খাওয়া দেখিয়া সারদাবাবু বলিয়াছে যে, "এই রকমে মেজকুমার খাইত। আমার সন্দেহ হয় এই মেজকুমার।"

কাশীমপুর হইতে জয়দেবপুর আসি। যোগেন্দ্র বানার্জ্জির ছেলে রাম আমাকে হাতীতে জয়দেবপুর লইয়া যায়। তখন রাম কাশীমপুর Estate-এ সারদাবাবুর কর্ম্মচারী ছিল। যোগেন্দ্রবাবু তখন রাজ বাড়ীতে কাজ করে। রাম এখন কোথায় কাজ করে জানি না। ঐ হাতী রাজবাড়ীর। জয়দেবপুরে সন্ধ্যা ৬টা ৬।৷টায় পৌঁছি। রামের সাথে ২।৩ জন লোক আসিয়াছিল। জয়দেবপুরে আসিয়া সেদিন মাধববাড়ীতে থাকি। রাজবাড়ীর মধ্যে নামি।

সেখান হইতে মাধববাড়ী যাই। তখন আমার এই সব জায়গা চিনা মনে হইত। মাধব বিগ্রহ আছে। আমাদের জয়দেবপুরের রাজার ঐ বিগ্রহ। আমি সেই রাত্রে মাধব বাড়ীতে যে কামিনী ফুলের গাছ আছে সেই গাছের নীচে থাকি। কাশীমপুরের লোকেরা আমার সাথে হিন্দিতে কথা বলিত। আমিও হিন্দিতে কথা বলিতাম। আমি তাহাদের হিন্দিতে বলিয়াছি কারণ আমার গুরু আমাকে আত্মপরিচয় দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে কামিনী ফুল গাছের নীচে বহু লোকজন আসিয়াছিল। সেই রাত্রে সেখানেই বসিয়াছিলাম। তারপর দিন মাধববাড়ীর উত্তর দিকে একটা গলি আছে,

বাড়ীর মধ্যে যাওয়ার সেই গলি দিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলাম। সেই রাস্তা মেয়েদের যাওয়ার রাস্তা। ঐ গলি দিয়া গিয়া খাজাঞ্চিখানার পায়খানা, আমি নিজেই চিনিয়া গেলাম। পায়খানা হইতে আসিয়া স্নান করিলাম। পায়খানার মধ্যে কল আছে, সেই কলে স্নান করিলাম। সেই পায়খানাটা Under drain এর। সেই drain চিলাই নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। স্নান করিয়া মাধববাড়ীতে আসিলাম। তার পরে একটা গোল বারান্দা আছে সেইখানে আমার ছোট ভাই থাকিত, সেখানে গেলাম ও বসিলাম। সেদিন দুপুর পর্য্যন্ত ওখানেই ছিলাম। তারপর সেখানে জয়দেবপুরের মেয়ে ছেলে স্ত্রীলোক বুড়া বহুলোক আমাকে দেখিতে আসে। তারপর বুদ্ধু সেখানে আসে। তারপর বৈকালে ৬॥ টার সময় আমাকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে নিয়া যান। সেখানে যাইয়া আমার ঠাকুরমা রাণী সত্যভামা, বোন জ্যোতির্ম্ময়ী, ভাগিনা, (বোনের ছেলে) বড় বোনের ছেলে সেখানে ছিল।

তাহাদের চিনিলাম। সেখানে একটা ঘরে ছিলাম। রাজবাড়ীর অন্যান্য জায়গা দেখিয়া সমস্ত চিনিলাম, করণ ২৫ বৎসর ছিলাম। আমার আত্মীয় স্বজনকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। সেখানে আমার বোন ও ঠাকুরমার সঙ্গে অনেক কথা হয়। আমি তখন তাদের সহিত হিন্দিতে কথা বলিয়াছি। আমার বোন হিন্দিতে কথা বলিতে পারে। তিনি আমার সহিত কথা বলিয়াছেন। ঠাকুরমা দাঁড়াইয়াছিল। আমি সেদিন আত্মপরিচয় দিই নাই। আত্মীয় কুটুম্ব দেখিয়া মায়া হয় না? আমারও মায়া হইয়াছিল। এক ঘরে থাকিয়া তারপরে আবার রাজবাড়ীতে ঐ গোল বারান্দায় গেলাম। সেই রাত্রে সেই গোল বারান্দায় রহিলাম। তারপর দিন বুদ্ধু আমাকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। আমি গোটা ১২টার সময় নিমন্ত্রণ খাইতে যাই। আমি সমস্ত আত্মপরিচয় দেই নাই।

পরিশিষ্ট—৭

[১৯২১ সালে মধ্যম কুমার ফিরিবার পূর্ব হইতেই বহু কবিতা পুস্তক বাহির হইতেছিল। ইহার অধিকাংশ ঢাকা হইতে প্রকাশিত। আমরা এস্থলে ঢাকা ও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত অনেকগুলি পুস্তক হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে জজ রায় দিবার পূর্বেও কতকগুলি স্বার্থান্ধ লোক ছাড়া সকলেই সন্ন্যাসীকে কুমার বলিয়া স্বীকার করিত।]

অতি ছোট রাজ্য এক ভাওয়াল নাম,
ঢাকা জেলা মাঝে তাহা ছিল পুণ্যধাম।
যতদিন রাজা বাঁচে প্রজার আনন্দ,
অমরার সুখভোগ সুরভির গন্ধ।
একে একে রাজা মরে কুমার সকল,
তিন পুত্রবধূ রাজ্য করিল দখল।
তিন রাণী ভাওয়ালে তিন অংশীদার,
কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ শুনি কর্ণধার
পতিহীনা পুত্রহীনা তিন রাণী হয়,
রাজবংশে বাতি দিতে কেহ নাহি রয়।
বড়রাণী মেজরাণী ভবে বংশ নাশ,
ছোটরাণী পুষ্যি নিয়ে করে সুখে বাস।

* * * *

ভাওয়ালে আজ আগুন জ্বলেছে কপাল পুড়েছে কার ?
মামলা বেঁধেছে রাণী সন্ন্যাসীর রহস্য চমৎকার।
বহুদিন আগে মৃতদেহ যার পুড়ে হয়ে গেল ছাই,
কোথাকার এক সাধু এসে বলে সেই আমি মরি নাই।
ভাওয়াল রাজ্যে আমি পরিচিত মধ্যমকুমার হই,
মিথ্যা আমার মৃত্যু রটনা—জাল প্রতারক নই।
যাবে দার্জ্জিলিং ষ্টেপ-এসাইড রোগের কারণে যাই,
সে রোগে এমন মরণ হইবে কভু তাহা ভাবি নাই।

বাঙ্গালী মেয়ের সাহস দেখে চম্‌কে ওঠে পিলে,
হাসি মুখে দিচ্ছে বিষ স্বামীর মুখে ঢেলে।

*　　　*　　　*

ভাওয়ালেতে ছুটল হাসি সাত সাগরের বান,
হাজার হাজার প্রজার মুখে হাসির কত গান।
চাপা হাসি মুচকি হাসি বিকট অট্টহাসি,
গোম্‌ড়া মুখে পোড়ার হাসি দেখতে ভালবাসি।
কপট হাসি উদ্ভট হাসি হাসির কত ঢেউ,
এমন হাসি ভাওয়ালেতে দেখেনি কভু কেউ।

*　　　*　　　*

'ঘোম্‌টা দেওয়া খেম্‌টা নাচের খেইড় টপ্পা চলে,
রাজ পথেতে মাতাল নাচে বেতাল পড়ে ঢলে'।
চায়ের দোকানে টেবিল ফাটে মজলিসেতে ধুম,
ভাওয়ালবাসী ভুলেই গেছে রাত দুপুরের ঘুম।
শুন্‌ছি নাকি ও ঠাকুরঝি! বল্‌ছে ঘরের বৌ,
কার হাঁড়িতে লুকিয়ে নাকি কে খেয়েছে মৌ।
কোন্‌ সাধু এক জুট্‌লো এসে বলছে হেসে হেসে,
রাজার বাড়ীর মজার কথা—দেশ গিয়েছে ভেসে।
বউ কথা কও পাখীর ডাকে শিউরে ওঠে প্রাণ,
কপালপোড়া বিধবার কে ঘোম্‌টায় দেবে টান।
রাত্তিরেতে চাঁদের হাসি সুধার ধারা ঢালে,
ঘুম পাড়ায় না চুম্‌ দিয়ে কেউ আমার দুটী গালে।

*　　　*　　　*

দম্ভভরে রাণী বলে ওই সাধু জুয়াচোর জটাধারী,
জয় হ'লে মোর একটী লাথিতে পাঠাব যমের বাড়ী।
আমার নামেতে কলঙ্ক আরোপ উহু জ্বলে যায় প্রাণ,
চাপ দাড়ী ধরে দেব ঘুর্‌ পাক ছিঁড়ে নেব দুটী কান।
দেশটা জুড়ে কেচ্ছা বেরোয় ভাওয়াল রাণীর কীর্ত্তি বটে
কুলবধুরা লজ্জায় মরে—ঘৃণায় তাদের ন্যাকার ওঠে।

* * * *

মরণের পরে লভিয়া জীবন চিনিলাম আজি তারে,
সে আমার প্রাণে বড় দাগা দেছে কেমনে বুঝাব কারে।
সে আমার বুকে ভীম পদাঘাত করিয়াছে স্থকৌশলে,
অতুল কীর্ত্তি রেখেছে জগতে কুটীল বুদ্ধির বলে।
সন্ন্যাসী বলে, অশ্চর্য্য ব্যাপার সকলে চিনিছে যারে,
কি লজ্জার কথা! আপন বনিতা চিনিতে পারে না তারে?
মরিলেও স্বামী জীবনে ভোলেনা পতির মুরতি সতী,
হিন্দু-নারী আজ একি কথা কয়, কেন হেন মতি গতি?
সন্ন্যাসী বলে, মরি নাই আমি বেঁচেছি পুণ্যের বলে,
আমার মৃত্যুর গোপন রহস্য প্রকাশিতে ধরাতলে।
গুরুজী যখন কহিল কুমারে পরিচয় তব দাও,
কাহার সন্তান কোথায় নিবাস ঘরে ফিরে আজি যাও।
হলাহল পান করেছিলেতুমি কিসের কারণে শুনি,
পাহাড়ের নীচে মৃতের সমান পড়েছিল দেহখানি।
সেদিন আকাশে প্রলয় গর্জ্জন লয় হবে যেন সৃষ্টি,
ভীষণ দুর্য্যোগ প্রকৃতির খেলা মুসলধারায় বৃষ্টি।
বিষে জর জর ছিলে মর মর আহত বিক্ষত দেহ,
সেচ্ছায় তোমার এ দুর্দ্দশা কিংবা অপরে করিল কেহ।

* * * *

ললাটে তোমার রাজার চিহ্ন চেহারা রাজার মত,
সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমি দেশে দেশে বহুদিন হ'ল গত।
যাও ফিরে এবে ঘরের সন্তান আত্মীয় স্বজন বুকে,
বনিতা সংসার যদি থাকে হেথা কাটাও কিসের দুঃখে?
কহিল কুমার গুরুজী আমার পরিচয় তবে শোন,
ভাওয়ালে মোর জনম হইল রাজার সন্তান কোন:

* * *

মধ্যমকুমার আমি—হায়! ভাগ্যদোষে,
গৃহহীন দীনহীন বিধাতার রোষে।

পরীক্ষা করিতে চাও চিহ্ন আছে তার,
বন্দুকের গুলী বিদ্ধ উরুতে আমার।
শীকার সন্ধানে গিয়ে এ বিপদ ঘটে,
এ কথাটা দেশময় রটেছিল বটে !
প্রজারা চিনিয়া রাজা আনন্দে উতল,
জয় জয় নাদে তব কাঁপে দিঙমণ্ডল।
ঢাক ঢোল বাজে শাঁক উলু উলু ধ্বনি,
চারিদিকে ভারি গোল রহস্যের খনি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত "ভাওয়ালে রাণী সন্ন্যাসী লড়াই সিরিজের পুস্তকাবলী হইতে কোন কোন কবিতার অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়াছি। এজন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ।

প্রকাশক

"মা তোর লীলাক্ষেত্র ভারত ভূমে কাল ক্রমে
কত লীলা হয়।
মা তোর পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গ স্থল, অমঙ্গলে সুমঙ্গল
হতেছে কত লীলার অভিনয়।
(মাগো) শুনলেম অতি প্রিয় পুত্র তোমার
জয়দেবপুরের মধ্যম কুমার, মরেছিল দার্জ্জিলিং পাহাড়ে,
সৎলোকেরা শ্মশান ঘাটে এলো সৎকার করে।
শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেল, আবার মরা মানুষ ফিরে এল
বার বৎসর পরে।
দেশের রাজা প্রজা জমিদার সব কি উৎসাহে ছুটল,
ভাওয়ালের আকাশে উঠল অমাবস্যার পূর্ণ শশী,
রাজার স্বার্থের বন্ধু যারা যারা, স্বার্থ সাধন কর্ত্তে তারা
রাজ কুমারকে বিষ খাওয়াইয়েছিল,
শ্মশান বন্ধু হয়ে তারাই শব শ্মশানে নিল।
বিষম শিলা বৃষ্টি ঝড় তাড়সে, শব ফেলে সব পালায় ত্রাসে,
নাগা বাবা ধর্ম্ম দাসে, এসে পুনর্জ্জীবন দিল।

২। ভালই হলো, ভরসা হলো
আস্‌ল ভাওয়াল রবি,
কাঁপায়ে পাপী, দাপায়ে তাপী
ভাস্‌লো সোণার ছবি।

তাই ভাওয়ালে, দলে দলে
কু-চক্রী কাক শৃগাল
শকুন কুকুর জুট্‌ছে প্রচুর
কোত্থেকে এক পাল।

মাথা তুলি কুকুর গুলি
রাজার পানে চায়,
নাক দে' শোঁষে, মাটী ঘ'সে
খত দিতেছে পায়।

(লয়ে) বোচ্‌কা বগলে, কুকুর দলে
ইষ্টিশনে যায়।
পাপের বোঝা, নয়ত সোজা
পেছন পানে চায়।

খেংড়া খেয়ে, নেংড়া হ'য়ে
চেংড়া ছোট জাত
বাপের ভিটে, কেউবা ছুটে
কেউবা কুপোকাৎ।

এই বেলা, সুযোগ মেলা,
আশু সত্য.........লা
থাকতে কাণ, বাঁচা প্রাণ
জল্‌দি করে পালা।"—(কু—চ—ভ)

আরও বেশী পরিচয় পেতে যদি চাও,
খোলা আছে ট্রাম বাস, সেইখানে যাও।
লাট নামে পথ ধরে করিও নজর
কুড়ি উন দেখেনিও বাড়ীর নম্বর
কড়া নেড়ে সাড়া দিও সাধু না তস্কর
দেখা পাবে পায় সবে যথা পূর্ব্বাপর।—(কু—চ+ভ)